দুর্গাপূজা সংখ্যা ১৪২৭ (২০২০)

# কমলবার্তা

## সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ৩

### মাতৃ আরাধনায় আগমনীর আহ্বানে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী **মা দুর্গার সংসার: এক কৃষক পরিবার** ৪

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ **মাতৃপূজনে আজি শুভদিনে** ৮

### বিশেষ কলম

লালকৃষ্ণ আদবানী **ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** ১০

নরেন্দ্র মোদী **এক কালোত্তীর্ণ নেতা যিনি নিজের সময়ের থেকে ছিলেন অনেক এগিয়ে** ১৩

### বিচার পরিবার দর্শন

তথাগত রায় **হিন্দু মহাসভা থেকে বিজেপি- এক দীর্ঘ যাত্রাপথ ও শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন** ১৬

দিলীপ ঘোষ **সূর্যোদয়ের পথে পশ্চিমবঙ্গ** ১৯

সুব্রত চট্টোপাধ্যায় আত্মনির্ভর ভারত ২০

অমিতাভ চক্রবর্তী **নতুন শিক্ষা নীতি- একটি সদর্থক পরিকল্পনা** ২২

সুব্রত ভৌমিক **"একাত্ম মানব দর্শন" ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ একটি ভাবনা** ২৩

মৃণাল কাঞ্জিলাল **সঙ্ঘ বিচার পরিবার ও ভারতীয় পরম্পরা** ২৬

### কেন্দ্র সরকার- বিশ্বাসের সাথে সবার সঙ্গে

বিমল শঙ্কর নন্দ **মোদী সরকারের বিদেশ নীতি: বাস্তবের প্রেক্ষাপটে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন** ২৮

সুভাষ চন্দ্র গুহ **আত্মনির্ভর ভারত ও ভারতনির্ভর বিশ্ব** ৩২

আদিত্য দাস **ভারতের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও বিরোধীদের ভিত্তিহীন অভিযোগ...** ৩৫

অম্লানকুসুম ঘোষ **নতুন কৃষি বিল: যুক্তি ও বিশ্লেষণে** ৩৯

সোমনাথ গোস্বামী **কৃষিবিল ২০২০** ৪২

দেবযানী হালদার **ক্ষমতার অলিন্দে রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু যখন রাম মন্দির** ৪৪

পবিত্র চৌধুরী **নতুন পথের দিশারী নবভারতের স্থপতি** ৪৭

সুন্দর মৌলিক **কথায় কথায় মোদি ম্যাজিক** ৫৩
অগ্রণী আচার্য **আয়ুর্বেদ- কেন্দ্রসরকারের নীতি ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতা** ৫৫

## পশ্চিমবঙ্গ- অতীতের পটে বর্তমান

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় **পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** ৫৮
ইন্দ্র উপাধ্যায় **বিজেপি-র হিন্দুত্বের "আইকন" কি তবে রবীন্দ্র-নজরুল?** ৬১
বিনয়ভূষণ দাশ **বিজেপি কি বাঙ্গলা বিরোধী** ৬৪
মোহিত রায় **পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস: ২০শে সেপ্টেম্বর** ৬৬
সমু দেব **ভাষা কি শুধুই ভাষা, না এক সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি?** ৬৮
মনোজ দাশ **বাংলা ভাষার ইসলামীকরণের রাজনীতি** ৭০
ড. রাজলক্ষ্মী বসু **বেকারত্বের ভারে নিমজ্জিত বঙ্গ** ৭৩
সৌমক পোদ্দার **বাংলার ছাত্র রাজনীতি: বামপন্থার অপ্রাসঙ্গিকতা—কিছু কথা** ৭৪
রামানুজ গোস্বামী **ইসলামিক জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ** ৭৮
সুজিত রায় **বাঙলায় সংবাদ মাধ্যমে 'মড়ক' লেগেছে** ৮১

## পাঠকের কলম / জনমত

রাহুল আদক **সোশাল মিডিয়া-মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমের কাছে আয়না** ৮২
সুলতা মন্ডল **নারী কল্যাণ: নারীবাদ নয়, নারীবোধ এর জাগরণ** ৮৪

## সাহিত্যের পাতা

দেবাশিস আইয়ার **(ছোটোগল্প) নিত্যদার আড্ডা চা'র** ৮৬

## সাম্প্রতিকী- খবর এক নজর

অচীন চক্রবর্তী **বিজেপি যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান: আশার আলো পশ্চিমবঙ্গবাসীর** ৮৯

রুদ্রপ্রসন্ন ব্যানার্জি **হে রাজর্ষি তোমারে প্রণাম** ৯০
প্রণয় রায় **সেবাই সংগঠন** ৯১

---

**দিলীপ ঘোষ** কর্তৃক ৬ নং মুরলী ধর সেন লেন, কলকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত
সম্পাদক: **দিলীপ ঘোষ** । কার্যনির্বাহী সম্পাদক: **প্রণয় রায়** (মো ৯৪৩৩২ ৪৭০৯৪)
সম্পাদনা সহযোগিতায়: **ডি. আইয়ার** । ব্যাবস্থা সহযোগিতায়: **অচিন চক্রবর্তী**
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেট সংস্করণ: **সব্যসাচী পাঠক, অরবিন্দ দত্ত, সৌরভ চক্রবর্তী**
প্রচ্ছদ: **শীর্ষ আচার্য** । অক্ষর বিন্যাস: **অরূপ ঘটক**
Phone 22410281, Fax 2241 7460 E-mail kamalbartabangra@gmail.com
Website www.bjpbengal.org

# সম্পাদকীয়

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবী বলছেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মামপরা, পশ্যৈতা দুষ্টমধ্যেব বিশ্বন্ত্যোমদ্বিভূতয়ঃ"। অর্থাৎ একা আমিই এ জগতে বিরাজিত, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে। শ্রী শ্রী চণ্ডী ই হোক বা শ্রীমদ্ভগবত গীতা, সর্বত্র একই বাণী। সনাতনী ভারতাত্মার সেই শাশ্বত বাণী- একমসদবিপ্রা বহুধা বদন্তি। দেব-দেবীর এই বিভিন্ন রূপে অবতরণের মূল কারণই হল দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। কখনো ভগবান নিজেই অবতার রূপে আসেন, কখনো তার প্রিয় শিষ্যদের পাঠান। যুগে যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষদের আগমন, সেই বার্তাই বহন করে। কাউকে আমরা পূর্ণ অবতার বলি কাউকে বা অংশ অবতার। এই যুগে বাঙ্গলার মাটিতে সেই ভাবেই আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখদের পেয়েছি। যাঁরা তৎকালীন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের নতুন জীবন দান করেছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবানের সেই শক্তির প্রভাব যেন প্রকাশ পাচ্ছে দেশের কেন্দ্রে থাকা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে। আর তাই অতি অল্প সময়েই ঘটে যাচ্ছে একের পর এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। সে ভারতমায়ের মুকুট কাশ্মীরের রক্ষাই হোক বা দেশের স্থানে স্থানে ছুতোয় নাতায় মাথা তোলা বিজাতীয় বিভিন্ন আসুরিক শক্তির উৎখাত।

নবরাত্রি হল ঋতুর সন্ধিকাল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গও এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে আসুরী শক্তির দাপাদাপি। প্রায় অর্ধ-শতক ধরে এই বাঙ্গলার বুকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ভাবনা কোণঠাসা হয়ে আছে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের শক্তিকে পুনরায় জাগরিত করার জন্যই হয়তো এই সময় আরও বেশি করে দরকার দৈত্যদলনী মা দুর্গার আরাধনার। করোনার আবহে তাই থিমের ঢক্কানিনাদ নয়, অন্তরের ভক্তি দিয়ে এবার মা'র কাছে প্রার্থনা হোক, "সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে। ভয়েভস্ত্রাহিনো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে।।"

# মা দুর্গার সংসার: এক কৃষক পরিবার

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

## শাকম্ভরী দুর্গা কৃষি দেবী

আদিম মানুষ একটি জিনিস খুব নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বুঝেছিল যে, সন্তান আর শস্য দুই-ই উৎপাদন; সন্তান ধারণ করেন মা আর শস্যের জন্মস্থান মাটি। মাটির গর্ভে ফসলের জন্ম। সুতরাং মাটিও মা; ফসল নিয়ে আবির্ভূত পৃথিবী মাতৃদেবী।

মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত মাতৃদেবী মূর্তি ভারতবর্ষের মাতৃমূর্তির প্রাকরূপ; তা ছিল পৃথিবী মূর্তি—সেখানে একটি মূর্তির ক্রোড়দেশ থেকে একটি গাছকে বের হতে দেখা যাচ্ছে। মাটি বা পৃথিবী প্রাণশক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীকরূপে আদিম কৌম সমাজের আরাধ্যা। পৃথিবীপুজোর এই "মিসিং লিঙ্ক" আজও সবদেশে সবজাতি গোষ্ঠীতে চলছে। নল সংক্রান্তির সময় বাংলায় যে নলপূজা অনুষ্ঠিত হয়, গর্ভিণী ধানের সাধভক্ষণ উৎসব হয়, তাও প্রকারান্তরে পৃথিবী-পুজো।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণে দেবী দুর্গাকে "শাকম্ভরী" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনাবৃষ্টিকালে দেবী ফসল-শাকসব্জি দ্বারা লোকপালন করেছিলেন। যদি দেবী দুর্গা "দুর্গতিনাশিনী" হবেন এবং "অন্নচিন্তা চমৎকারা"-ই হবে, তবে দেবী অন্নপূর্ণা কৃষকের গোলায় অধিষ্ঠান করে জীবনের সার্বিক দুর্গতিও নাশ করবেন—এটাই কাঙ্ক্ষিত। আর তিনি যদি মাটি বা পৃথিবীর দেবী না হবেন তবে বিশ্বের দুর্গতি দূর করবেন কীভাবে?

দেবী দুর্গার শাকম্ভরী রূপটি পরিস্ফুট হয় দেবী-আরাধনার "নবপত্রিকা" বরণে। নয়টি উদ্ভিদের সপত্র শাখারূপ হচ্ছে "শস্যবধূ" নবপত্রিকা। নিঃসন্দেহে দেবীপূজার এই উপকরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেবীর অন্নদাত্রী সত্তা।

'রম্ভা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিল্ব দাড়িমৌ।

অশোক মানকাশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।।’

কলাগাছ—ব্রাহ্মণী; কালো কচুগাছ—কালিকা; হলুদ গাছ—দুর্গা; জয়ন্তী—কার্তিকী; বেলশাখা—শিবা; দাড়িমশাখা— রক্তদন্তিকা; অশোকশাখা— শোকরহিতা; মানকচুর গাছ—চামুণ্ডা; ধানগাছ—লক্ষ্মী। এরা নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী। এই নয়টি গাছকে অপরাজিতা লতা দিয়ে একসঙ্গে বাধা হয়। স্ত্রী-রূপ দান করার জন্য যুগ্মবেল দিয়ে রচনা করা হয় স্তনযুগল; পরিয়ে দেওয়া হয় লালপেড়ে শাড়ি। সপত্র কলাগাছ সর্ববৃহৎ হওয়ায় তার মাথা জুড়ে ঘোমটা টানা হয়—যেন এক অবগুণ্ঠনবতী নারী, দৈব-বধূ। এর মধ্যে প্রাচীন বৃক্ষপুজোর অবশেষটি সুস্পষ্ট। এই নয়টি উদ্ভিদের কারও রয়েছে খাদ্যগুণ আবার কারও ভেষজগুণ।

ধানচাষকে কেন্দ্র করেই বাংলার প্রায় সকল লোকানুষ্ঠান। আগমনী গান গাওয়ার কাল হচ্ছে শ্রাবণী ধান পাকার পরবর্তী সময়, যখন গোলায় ভরে উঠেছে আউশধান। শালী ধানেরও ফুলেল দশা, থোড় বের হবার সময়। একদিকে আউশ ধান ঘরে তোলার আনন্দ, অন্যদিকে আমনধান ঘরে তোলার প্রার্থনা। এই দুয়ের মিলনানন্দ শারদীয়া দুর্গাপূজাকে করে তুলেছে কৃষিনির্ভর এক শ্রেষ্ঠ মঞ্চ। শস্যকামনা আর শস্যনির্ভর অর্থসম্পদের কামনা নিয়েই তো দেবীপুজোর পরিকল্পনা।

শস্যঋতুর শুরুতে (আউশধানকে কেন্দ্র করে) শরৎকালে দেবীপুজোর যে সূত্রপাত, বসন্তকালে চৈত্রের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে তারই পরিণতি অন্নপূর্ণা পুজোয়। অন্নের ভান্ডার তখন পূর্ণ, নিরন্নের অন্নস্বপ্ন তখন পেয়েছে বাস্তবতা, আর তখনই তিনি অন্নদাত্রী আরাধ্যা দেবী—অন্নপূর্ণা বসুন্ধরার দয়াময়ী মাতৃরূপ।

## ধানের দেবী লক্ষ্মী

কৃষি নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে—পেঁচা লক্ষ্মী এবং ইঁদুর অলক্ষ্মী। সে “পাকা ধানে মই” দেয়। ইঁদুরকে খাদ্য তালিকায় রেখে অনেককাল ধরে পেঁচা কৃষিজীবী মানুষের মন জয় করেছে। শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু—এই নীতিতে পেঁচা একসময় Zoo-morphic থেকে Anthero-morphic হল। পেঁচা নৈশপ্রহরী, পরিবেশ-বন্ধু, উপাস্য দেবতা, ক্ষেত্রলক্ষ্মী।

কার্তিক সংক্রান্তিতে “আউড়ি-বাউড়ি” উৎযাপিত হয়। মুঠ লক্ষ্মীর ধানের খড় পাকিয়ে দড়িতে বাঁধা হয় প্রতিটি জিনিস। আড়াই মুঠো কাটা ধানে লক্ষ্মীপুজো হয়।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে মেয়েরা উৎযাপন করে ইতুলক্ষ্মীর ব্রত। রবিশস্য কামনা এই ব্রতের উদ্দেশ্য। যেখানে রবিশস্যের প্রসার নেই সেখানে হৈমন্তি ধান মাড়াই-ঝাড়াই করাী শুভারম্ভে খামারেই করা হয় ইতুলক্ষ্মীর ব্রত। আলপনা দিয়ে লক্ষ্মীকে ভোগ দেওয়া হয়।

পৌষসংক্রান্তির আগের দিন বাড়ির উঠোনে “পৌষ তোলা”-র ধানের আঁটি রেখে লক্ষ্মীপুজো করা হয়। লক্ষ্মীর

আসন পেতে, ধান-কড়ি সাজিয়ে, দু-পাশে কাঠের পেঁচা রেখে লক্ষ্মীপুজো করা হয়।

সেকালে ধানই ছিল ধন। ধানের দেবী আর ধনের দেবী ছিল অভিন্ন; ধান্যলক্ষ্মীই ছিল ধনলক্ষ্মী।

## সালোকসংশ্লেষের দেবী সরস্বতী

“সরস” শব্দের অর্থ জল। শুরুতে সরস্বতী ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিতা। শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর প্রধান ভূমিকা ছিল। বিদ্যার দেবীর ধারণা অনেক পরে। উর্বর নদী উপত্যকায় কৃষির ফলন ছিল পর্যাপ্ত। তাই সরস্বতী নদীতীরে আর্য-ঋষিরা রূপদান করেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির। সেইসূত্রে জলের প্রত্যক্ষ দেবী কৃষি ও উর্বরতাকে ছাপিয়ে হয়ে গেলেন জ্ঞান ও বিদ্যার পরোক্ষ দেবী। সভ্যতার অভ্যুত্থান ও তার ক্রমবিকাশে নদী সবসময় সহায়ক ও সঙ্গত ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই কল্পনা করা যেতেই পারে সরস্বতী নদীর দু’কূলে সৃজিত পলল মৃত্তিকার উর্বর শস্যক্ষেত্র ছিল আর্য ঋষিদের “শস্যাগার”।

আবার “সরস” শব্দের অপর অর্থ “জ্যোতি”। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে পাওয়া যায় অগ্নিরূপ, জ্যোতির্ময়ী এক দেবী রূপে। সরস্বতীর মধ্যে সূর্যকিরণের সপ্তবর্ণের ধারণা VIBGYOR এখানে পরিষ্কার। যেহেতু উদ্ভিদ দেহে বৃদ্ধি ও পরিস্ফূরণের অপরিহার্য শর্ত আলোক ও জল, সরস্বতী তাই সালোকসংশ্লেষ বা Photosynthesis প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে জলের আবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, জলের সরবরাহকারিণী দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তাই কৃষি উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

“শ্রী” অর্থে লক্ষ্মী। মাঘ মাসের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে একসময় হয়তো লক্ষ্মীপুজোই হত, এখনও অনেক পরিবারে দেবী সরস্বতীর সঙ্গে দেবী লক্ষ্মীকেও ভক্তি সহকারে ফুল নৈবেদ্য দেন। আর এই দিনটি থেকেই যেন শুরু হয় মুকুল-বিকাশের পর্ব, বসন্তের সৌকর্য, সুপ্তির অবসান, মনের মুক্তির মরশুম। দেবী সরস্বতী উপাসনায় লাগে পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব; ধান, যব, গম, মুগ, তিল

দিয়ে এই পঞ্চশস্যের অর্ঘ্য রচিত হয় আর আম, অশোক, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুরের বিটপ দিয়ে সাজানো হয় পঞ্চপল্লব।

পলাশপ্রিয়া হলেন দেবী সরস্বতী। পলাশের রক্ত রঙ উর্বরতার প্রতীক, আর ঋতুমতী নারীর রজোদর্শনই প্রাণীজন্মের প্রথম শর্ত। দেবী সরস্বতী তাই উর্বরতার অধিষ্ঠাত্রী রূপে পূজিতা; জলের দেবী, আলোর দেবী উর্বরতার দেবী।

## কার্তিক নবান্নের দেবতা

রাঢ়বঙ্গের কোনো কোনো স্থানে (কাটোয়া মহকুমা) নবান্ন উৎসবে কার্তিক পুজো হয়। এই কার্তিক "নবান্নে কার্তিক" নামে অভিহিত। "নবান্ন" একটি কৃষি কেন্দ্রিক লোকানুষ্ঠান। "নবীন ধান্যে নবান্ন পালিত হয়। শস্যরক্ষাকর্তা দেবতাকে তুষ্ট করে শস্য ঘরে তোলার জন্য "নবান্নে কার্তিক" পূজিত হয় বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলার শস্য উৎসবে যখন শস্যদেবতারূপে কার্তিক পূজিত হন ("নবান্নে কার্তিক"), তখন মধ্যরাত্রে ফসল চুরির অভিনয় করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসমাজে কার্তিক শস্য দেবতাদের অন্যতম। কার্তিক সংক্রান্তির দিন ও তার আগে এই কৃষি দেবতার ব্রত উৎযাপিত হয়। ব্রতিনীরা একটি ঘটের চারিদিকে আলপনা দিয়ে নানা আচার পালন করেন। সারা রাত গাওয়া হয় কৃষি-সংগীত; ফসলের কীটশত্রু, জীবজন্তু তাড়িয়ে ফসল সুরক্ষার কাহিনীই গানের বিষয়বস্তু। পুজো বা ব্রতানুষ্ঠানের পর কার্তিকের মূর্তি জলে বিসর্জন দেওয়া হয়না, তাকে শস্যক্ষেত্রে রেখে দেওয়া হয় ফসলের রক্ষাকর্তা হিসাবে।

লোকসমাজে দেখা যায়, সন্তান কামনায় বন্ধ্যানারী কার্তিক পুজো করেন। সন্তান উৎপাদনের দেব-দেবী কার্তিক-ষষ্ঠী যুগ্মদেবতা ভ্রূণ সৃষ্টকারী দেবতা রূপেই পূজিত। আবার লোকসমাজে কার্তিক বৃত্তি পাল্টিয়ে মানব-প্রজনন থেকে উদ্ভিদ প্রজননের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। বারবণিতারা কার্তিকের পুজো করেন আকস্মিক ভ্রূণ উৎপাদন বন্ধ করতে।

বাহন সমেত কার্তিক উর্বরতাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুক্কুট বা ময়ূর—কার্তিকের যে বাহনই হোক না কেন, পাখি দুটি উর্বরতা-কেন্দ্রিক। ময়ূরের মিলনানন্দ তখনই যখন বর্ষায় সজল মেঘের আনাগোনা, আর তখনই কিশলয়ের নবসৃষ্টির মরশুম। ময়ূর অগ্নির প্রতীকরূপে অভিহিত ও ব্যাখাত, আবার পুরাণে কার্তিক সূর্যসম্ভব দেবতা। "কুক্কুট" শব্দের অর্থও অগ্নিপিণ্ড। বৌদ্ধ শিল্পদর্শনে কুক্কুট সূর্যের দ্যোতক হিসাবে প্রতিভাত। মোরগের কাছেই সৌরালোক প্রথম স্বাগত-সম্ভাষণ পায়।

একটি লোককথায় দেখা যায়, দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ও দেবকন্যা ঊষার প্রপম বিবাহের কাহিনীর মধ্যে তাদের কৃষি-সম্পৃক্তি জড়িয়ে আছে। কার্তিক ঊষাকে বিয়ে করেছেন, কিন্তু তাঁর খেয়াল হল মায়ের অনুমতি নেওয়া হয়নি। অনুমতি নিয়ে নিয়ম করেই নববধূকে গৃহে আনতে চান। কাজেই এক শস্যক্ষেত্রে ঊষাকে রেখে দ্রুত মায়ের কাছে গেলেন। সেদিন মায়ের অদ্ভুত আচরণে কার্তিক যারপরনাই বিস্মিত, আতঙ্কিত হয়ে শপথ নিলেন চিরকুমার থাকার। অন্যদিকে কার্তিকের জন্য অপেক্ষায় থেকে প্রহরের পর প্রহর গুণে লজ্জায়, অপমানে ঊষা শস্যক্ষেত্রে চিরজীবনের জন্য অদৃশ্য হলেন। এই যে শস্যক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মোটিফ, তার মধ্যেই কৃষি-সম্পৃক্ততা নিহিত রয়েছে। বেদ ওও পুরাণানুসারে ঊষা সূর্যের স্ত্রী আর কার্তিক সূর্যসম্ভূত দেবতা। ঊষা হলেন সৌরশক্তি; আমরা জানি সৌরশক্তি শস্যের ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ সবুজ কলায় শোষিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য উৎপাদিত হয়, এরই নাম সালোকসংশ্লেষ। এই কিংবদন্তীর জাগতিক তাৎপর্য এখানেই। সৌরদেবতা কার্তিক

এভাবেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কার্তিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় সৌরতিথি অনুসরণে— রবির তুলো রাশি থেকে বৃশ্চিক রাশিতে সংক্রমণের দিন, যাকে বলা হয় কার্তিক সংক্রান্তি।

উর্বরতাবাদের সঙ্গে কার্তিকের সংযুক্তির আর একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হল—কার্তিক সরা যা অ্যাডোনিস গার্ডেনের অনুরূপ। এটি লোকাচারের অঙ্গীভূত নকল শস্যক্ষেত্রের আদলে গড়া একটি শস্য-সরা। পূজাবেদিতে পঞ্চশস্য অথবা ধান ছড়িয়ে তার প্রতিমা স্থাপিত হয়, কোথাও আবার কার্তিক মূর্তির পাশে রাখা হয় ইতুসরার মধ্যে ইতুর ঘট। বঙ্গদেশে ইতুপুজো হচ্ছে সূর্যপূজার নির্দেশক এবং তা কার্তিক সংক্রান্তিতে সূচনা, শেষ হয় অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে। সরায় গঙ্গামাটি রেখে তাতে বোনা হয় ধান, ছোলা, মটর আর রোয়া হয় কচু আর সুশনি শাক। শস্যক্ষেত্রের একটি প্রতিরূপ বা অ্যাডোনিস গার্ডেন এভাবেই গড়ে ওঠে। বরিশাল অঞ্চলে ধানের চারাকে কার্তিকের প্রতীকরূপে পুজো করা হয়। মাটিতে সমকেন্দ্রিক কয়েকটি বৃত্তাকার চওড়া দাগ কেটে, মাটি তুলে, সেইস্থানে বোনা হয় ধানের বীজ, সেই তোলা মাটি গুঁড়ো করে বীজ আচ্ছাদিত করা হয়। এই বীজ বোনার সূত্রপাত হয় কার্তিক মাসের প্রথমার্ধে এবং সংক্রান্তিতে চারা বেশ কিছুটা লম্বা হয়। মনে করা যেতে পারে আদিকালে মূর্তির বদলে ধানের চারাই কার্তিকরূপে পূজিত হত; হয়তো মানবরূপী কার্তিক প্রতিমা পরে চালু হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বোরোধানের জন্য ধানের বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষাও বলা যেতে পারে; সেখানে বোঝা যায় বীজের গুণমান অনুযায়ী কত হারে জমিতে বপন করা হবে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া এবং রংপুরের রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় সমাজের গ্রামীণ নারীরা কার্তিকের জন্য পাতা ঘটের পশ্চাতে ফলন্ত মোচাসহ কলাগাছ আর ফলন্ত ময়নাগাছের শাখা রাখে। এই কৃত্যও কার্তিকের সঙ্গে উর্বরতাবাদকে মিলিয়ে দিয়েছে। যে মায়েরা সন্তান চান তারা কার্তিক ব্রত করেন আর সন্তানবতী মায়েরা নৃত্যের তালে তালে সেই কলাগাছ প্রদক্ষিণ করে কলা ও ময়না ফল ছিঁড়ে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে সন্তান মানতকারী মায়েদের আঁচলে নিক্ষেপ করেন। এই পুজোর শেষে গাওয়া হয় গীদালী গান আর তাতে কৃষিকাজের প্রসঙ্গ আবশ্যিক।

কোচবিহারের মাঘপালা গ্রামে কার্তিক পুজোর দিন বর্ষণদেবতা হুদমদেওর আশির্বাদ প্রার্থনায় গোপনে কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশিত হয় নারীর নগ্ননৃত্য। কার্তিক শস্যরক্ষক দেবতা হবার জন্য তা করে লোকসমাজ, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এটি হয়তো উর্বরতাবাদের চরম দর্শন।

## গণেশ কল্পনায় অরণ্য-কৃষির যুগলবন্দী

কৃষিজীবী মানুষ মাত্রেই জানেন হাতি অরণ্য সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রে কতটা বিঘ্নকারী পশু। এই পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে যখন দলমা পাহাড় থেকে দলে দলে হাতির পাল নেমে এসে ফসলের জমি তছনছ করে যায়, তখন তাকে কী বলা যাবে, দেবতা? হাতি নিজেই বিঘ্নকারী আর বিঘ্নের প্রতীক; তার বাহনটিও তো তাই—ইঁদুর পাকা ফসল কাটে, যত না খায় তার চাইতে ঢের সংগ্রহ করে তার গর্তে। সুতরাং একদিকে হাতি, আর একদিকে ইঁদুর; 'একা রামে রক্ষা নেই, লক্ষ্মণ তার দোসর'। হাতিমুখো গণেশ সওয়ার হয়েছেন কিনা অলক্ষ্মীরূপী ইঁদুরের পিঠে! কৃষিজীবনের পরতে পরতে এরা সর্বনাশের প্রতিভূ। অন্তত হাতিমুণ্ডধারী, ইঁদুর বাহন ফসল-বন্ধু হতে পারেন না। আর এখানে রয়েছে এক মনস্তাত্ত্বিক লোক-দর্শন; চিন্তার বৈপরীত্য। ভয়ে-ভক্তিতে এক বিঘ্নকারী শক্তি হয়ে ওঠে বিঘ্ননাশক দেবতা। বিঘ্নকারীকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত না করে বিঘ্ননাশকের দরকার লোকসমাজের। মানুষ কল্পনা করলো—যিনি দুর্গতির হেতু, তিনিই আবার কল্যাণময়; তাই ইঁদুর বাহন হস্তিদেবতা যেন ছেড়ে দিয়েছেন তার চিরাচরিত বিঘ্নকারী স্বভাব। চিন্তার এই বৈপ্যরীত্যে ভয়ঙ্কর-শক্তি হয়ে যায় শুভঙ্কর-শক্তি। আর সেকারণেই ফসল ভক্ষণকারী হাতির পাল হয়ে দাঁড়ায় কৃষি সহায়ক দেবতা।

নৃতত্ত্বের ভাষায় গণেশ হচ্ছেন থেরিওমর্ফিক দেবতা বা অর্ধ-মানুষ দেবতা; তার মুণ্ডটি প্রাণীর আর বাকি অংশটি মানুষেরই মতো। অরণ্যের প্রান্তবাসী লোকসমাজের কাছে গণেশ কেবল হস্তীদেবতাই নন, তিনি হাতিদেরও দেবতা। গণেশ তার হাতি রূপে বন্যপ্রাণী আর অরণ্য-সংস্কৃতির প্রতীক। সভ্যতার বিবর্তনে দেখি আদিতে ছিল অরণ্য-কেন্দ্রিক মানব সভ্যতা—বনের ফল-মূল সংগ্রহ আর পশুশিকার করেই করেই মানুষের খাদ্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল; কৃষি-সভ্যতা এসেছে অনেক অনেক পরে।

বন ছেড়ে মানুষ যখন বন-সংলগ্ন জমি হাসিল করে মানুষ চাষাবাদ শুরু করলো, তার লোভে দলে দলে আবির্ভূত হল বনের শাকাহারি, তৃণভোজী পশুর পাল। তাদের থেকে ফসলকে বাঁচাতে আদিম মানুষ সর্তক হল আর তাদের প্রাচীন রীতিতে বনের পশুকে সন্তুষ্টকরণ করতে উদ্ভূত হল হস্তী দেবতা, তিনিই আজকের সিদ্ধিদাতা গণেশ।

**লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক**

# মাতৃ পূজনে আজি শুভদিনে

## ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

আজ মধ্য বয়সে এসে দুর্গা পূজা বললেই বাড়ীর দুর্গা পূজার কথা মনে পড়ে যায়। নিজেদের বাড়ীর পূজা প্রায় পাঁচশ বছরের পুরানো। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা নরপতি ঘোষ প্রতিষ্ঠিত পুরাতন বাটীর এই পূজায়। বৈষ্ণব রস ও শাক্ত ভাবের মিলনক্ষেত্র আমাদের বাড়ীর পূজাটি। আমরা পারিবারিক পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ী কুলীন কায়স্থ ঘোষ, তাই পূজায় আমাদের কায়স্থ রীতিনীতিরও যোগ রয়েছে। শাক্ত মতে পূজা হয় আজও। পঞ্চস্তূপ বা বর্তমানকালে পাঁচথুপীতে এককালে বৌদ্ধ প্রভাবও ছিল। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের সীমান্তে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি যদিও বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলারই অংশ। সুদীর্ঘ সময় জজান ও পাঁচথুপীর বিস্তীর্ণ অংশে আমাদের জমিদারি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন পূজার জৌলুসও ছিল তেমনই। আজও আমাদের পুরাতন বাড়ীর পূজা সমগ্র এলাকা জুড়ে প্রসিদ্ধ। ঘোষ বাড়ী, ঘোষ রায় বাড়ী, ঘোষ মৌলিক বাড়ী ও ঘোষ হাজরা বাড়ী এই চতুরাংশের আদি রাজা নরপতি ঘোষের বাড়ী বিভক্ত। আমরা কায়স্থরা বিশ্বাস করি, আমাদের আদি সূচনা চিত্রগুপ্তজি থেকে। চিত্রগুপ্তজির আদি মন্দির ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে। উক্ত মন্দিরগুলিতে রয়েছে দুর্গা ও সূর্যের চিত্রও। আমাদের বংশে মা দুর্গা হলেন কুলদেবী ও শ্রীরঘুবীর কুলদেবতা।

ছোটবেলার সেই বনেদি পূজার সঙ্গে এখন আমরা যে পূজা দেখি তার অমিল অনেক। তবুও দুইটিই সুন্দর। দুইভাব থেকে। দুর্গাপূজা যেমন সত্য, তেমনই বাস্তব হল দুর্গোৎসব। তাই তার সার্বজনীন রূপটিও মধুর। সবার স্পর্শে সবার সহযোগিতায় সাধারণের হৃদয়ে মায়ের এই আবাহন আনন্দময়। মহামারির এই

করাল গ্রাসের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেও আমাদের বাঙ্গালী প্রাণের পূজা তার বৈভব ও বিভূতি নিয়ে আমাদের দ্বারে আগত। ব্রহ্মময়ী মা দুর্গা হলেন ব্রহ্মগুণের প্রতীক, পশুরাজ সিংহ রজগুণের প্রতীক ও অসুররাজ হলেন তমোগুণের প্রতীক। ব্রহ্মময়ী মা রজগুণের সাহায্যে তমোগুণকে নাশ করেছেন। আমাদের সকলের মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে। ব্রহ্মগুণ, রজগুণ ও তমোগুণ। প্রার্থনা মায়ের নিকট ভক্তের এই যে সারা বৎসর যেন তাঁর মধ্যে বহ্মগুণ জাগরিত থাকে, সে যেন রজগুণকে ব্রহ্মগুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর নিজের মধ্যে স্থিত তমোগুণকে যেন নাশ করতে পারে। তবেই একজন মানুষ মানের সঙ্গে হুঁশকে যুক্ত করে নিজের ছোট আমিকে অতিক্রম করে বড় আমিতে স্থিত হতে পারবে যখন যে ব্রহ্মগুণী হবে আর, সেটি সম্ভব হলেই সে ধর্ম ও মোক্ষের ডোরে অর্থ ও কামকে বাঁধতে শিখবে। তখনই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রকৃত অর্থ স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে স্থিত হবে। এইরূপ মনের অবস্থা হলেই জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের উপলব্ধি আসবে তাঁর। শ্রীরামকৃত দুর্গাপূজা হয় এই শরৎকালে। এ পূজোর সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্ক অপরিসীম।

শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানযোগের সাধনার পথপ্রদর্শক, শ্রীলক্ষ্মণ ভক্তিযোগের, রাজা ভরত কর্মযোগের ও কণিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্ন রাজযোগের প্রতীক। এঁরা চারে এক ও একে চার। এই চারটি যোগের সাধনা সাধককে চারটি বেদের নিকট নিয়ে আসে। ঋকবেদ সামবেদ, যজুরবেদ ও অথর্ব বেদ। তাই দুর্গাপূজা হল মাতৃ আধারনা ও সাধনা। শুধুই উৎসবে সীমাবদ্ধ নয়। চির আনন্দ লোকের যাত্রী আমাদের সকলের আনন্দময়ী মা। অনুময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়ে আনন্দময় কোষের দিকে যাত্রা। পূজোই প্রধান, তাকে ঘিরে উৎসবের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েও বলা প্রয়োজন শারদ উৎসব বলতে গেলে দুর্গা পূজাই তার প্রাণ ও দুর্গোৎসবই হল তার মূল অংশ। কেন্দ্র বিন্দুই হল শাস্ত্রীয় রীতি মনে নিষ্ঠা সহকারে মায়ের পুজো।

সেজন্যই আমরা দেখতে পাই শত শত সার্বজনীন পুজোর প্রচুর আয়োজন ও আভিজাত্যের সঙ্গে পালিত হলেও তাদের পুজোর থেকেও আমাদের কাছে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার গুরুত্ব অসীম। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে দুর্গা পুজোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে দিয়ে রঘুনন্দন প্রণীত 'অষ্টবিংশতিতত্ত্ব' বইটি আনিয়ে মন দিয়ে পড়েছিলেন। সন্ন্যাসীর নামে সংকল্প হবে না বলে বেলুড় মঠে পুজোর সংকল্প হয় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নামে। 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমাকে তো সেভাবেই আমরা চিনি, জানি ও মানিও। স্বামীজীর সঙ্গে দুর্গাপূজার পক্ষে ছিলেন শ্রীমা, তবে বিধান দিয়েছিলেন প্রাণি হত্যা করা যাবে না কারণ সন্ন্যাসীর ধর্ম হল সর্বভূতে অভয় দান। ফলে ফল ও শস্য বলি হয় আজও বেলুড় মঠের দুর্গাপূজোয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, আমাদের সকলের প্রিয় রাজা মহারাজ মা দুর্গাকে সচক্ষে দর্শন করেন। তিনি দেখলেন মা দক্ষিণেশ্বরের দিক হয়ে গঙ্গা বক্ষ দিয়ে বেলুড় মঠের বেলতলায় এসে বসেছেন। রাজা মহারাজের দর্শন, স্বামীজীর ইচ্ছা ও স্বয়ং শ্রীমায়ের অনুমতির পর ভক্তরা আর অপেক্ষা করেননি। পুজোর আয়োজনে সকলে নেমে পড়েন মন প্রাণ দিয়ে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতেও দুর্গাপূজা হত। ১৯০৭ সালে তাঁর প্রাসাদোপম ঘোষ বাড়ীতে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন গিরিশচন্দ্র। মনে তাঁর বড় সাধ যে শ্রীমা এই পূজায় উপস্থিত থাকুন। শ্রীমায়ের তখন শরীর খারাপ। মালেরিয়ায় ভুগছিলেন। বড়ই অসুস্থ। কিন্তু ভক্তের টানে ভগবতী এলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তি বলে কথা। তিনি তো নিজেই ভক্ত ভৈরব। সন্ধিপূজোর সময় শ্রীমা এসেছিলেন। গিরিশবাবুর অনুপ্রেরণায় ভক্তরা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে কৃতার্থ হলেন। ঘোষ বাড়ী ধন্য হল। গিরিশবাবু হলেন পরিতৃপ্ত। সনাতন ভারতবর্ষের সমস্ত শুভের সাক্ষাৎরূপ হলেন শ্রীশ্রীমা। বৈদিক ধর্মকে শ্রীমা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উপলব্ধি করেছিলেন ও ভালোবাসার মাধ্যমে সেই ভাবকে ভক্তের মধ্যে স্থাপন করে তাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন আপন ক্ষমতাবলে।

শ্রীমায়ের জীবনই তাঁর ভক্তের কাছে বাণীস্বরূপ। দুর্গাপূজার মর্মার্থ সেখানেই নিমজ্জিত শ্বাশ্বতরূপে। তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম এই ভুবনমাঝারে আমাদের মধ্যে, গ্রন্থে পেলাম তাঁর উপদেশ কিন্তু অন্তরে সেগুলো প্রবেশ করল কি? অহংকার ও লোভ আমাদের পিছু নিয়েছে সংসারের মধ্যে সন্ন্যাসীর মতন থাকতে শেখার কথা, সেখানে আমরা সংসারের মধ্যেই সংসারের শেষ দেখতে চাইছি। ফলে সংসারাশ্রমই অশেষ হয়ে যাচ্ছে। বানপ্রস্থ আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রমের সঙ্গে এ জীবনে পরিচয় হচ্ছে কী? মানা ও মেনে তাঁর শ্রীপদে যুক্ত হওয়া সুদূরেই থেকে যাচ্ছে। পদ নিয়ে সক্রিয় আমরা শ্রীপদের আনন্দ কী জানলামই না এ জীবনে। দুর্গাপূজা শুধুই বাইরে মাকে খোঁজা নয়, হৃদয় মন্দিরে মাকে স্থাপন করা, ভক্তি দিয়ে তাঁকে পূজন সারা, শক্তি দিয়ে তাঁর আরাধনা সেরে, অশ্রুতে তাকে হৃদ্‌মন্দিরেই বিসর্জন দেওয়া। সে বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে আমাদের আবার সনাতনীকে আবাহনের সূচনা। মা চিরন্তন। মাকে নিয়েই মায়ের সংসারে থাকা। শেষে তাঁরই সৃষ্টি এই মায়াকে উপেক্ষা করে ব্রহ্মলোক গমন করা। মা আবার আসছেন যেমন আসেন, ভজন, পূজন, সাধন, দর্শনের মধ্যেই হবে চির পুরাতন পুজোর নতুন অভিষেক ও বোধন। প্রার্থনা থাকবে এবার তাঁকে যেন মন মন্দিরে চিরদিনের জন্য স্থাপন করতে পারি। তবেই পূজা সার্থক। মনের বাইরে দালানে মায়ের পূজা নয়, মনের মধ্যে স্থিত গভীরতম স্থলে প্রাণের স্পর্শে, সত্যের সাধনে, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় মাকে আমন্ত্রণ। 'পবিত্রং চরিত্রং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা। পবিত্রতাস্বরূপিণ্যে তস্যৈ কর্মো নমোনমঃ'।

**লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক**

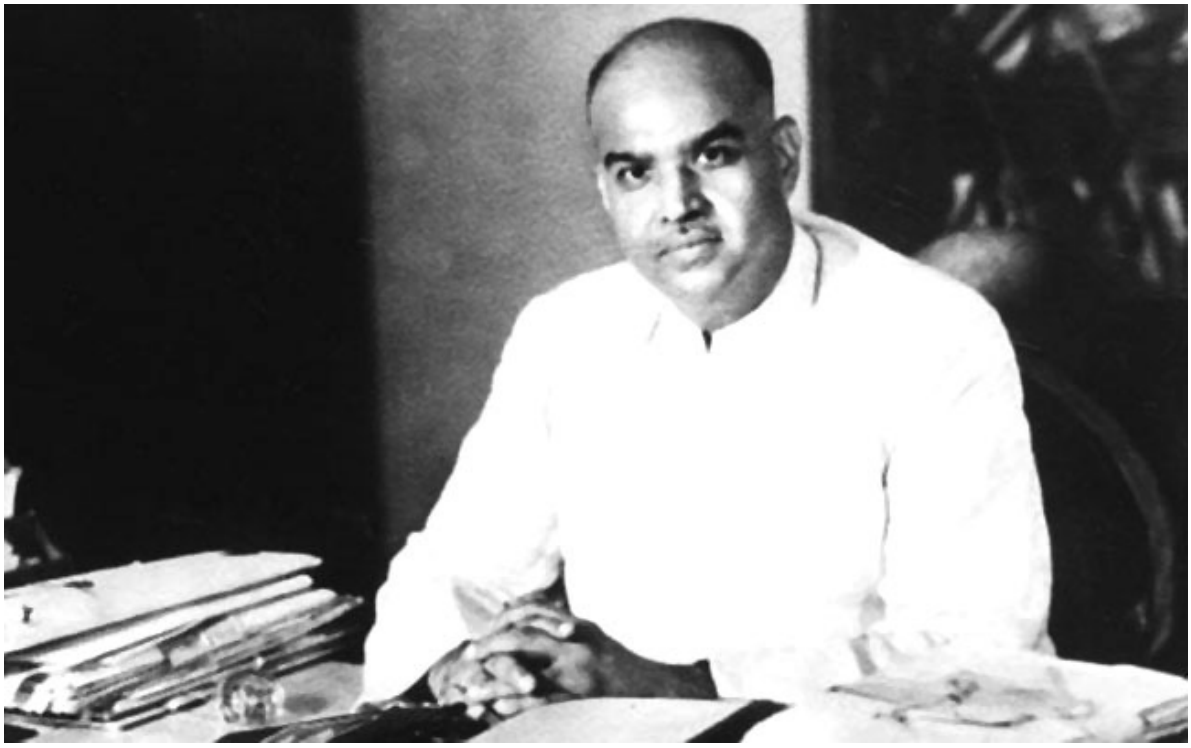

# ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানী

আমি যখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম সেটা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ। বারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ এবং ঐ বছরেই সেটা ঘটেছিল। আমি সেই সময় রাজস্থানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে কাজ করছিলাম।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গুরুজী এম. এস. গোলওয়ালকরজীর সাক্ষাৎকার হয় ও গুরুজী আমাকে বলেন যে ডঃ মুখোপাধ্যায় একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সংকল্প করেছেন। এই বিষয়ে স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাহায্য করার কথাও বলেছেন। আমার যতদূর জানা আছে,গুরুজী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বলেন যে যদিও তিনি এই প্রচেষ্টার শুভকামনা করছেন, তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে অপারগ। স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কাজ করতে চায়। তবে স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে সংযুক্ত কোনও কর্মী যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে সঙ্ঘ তাতে আপত্তি করবে না।

এর ফলস্বরূপ কিছু স্বয়ংসেবক কর্মী ডঃ মুখোপাধ্যায়ের নতুন রাজনৈতিক দল, ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগদান করে। এদের সংখ্যা কোথাও এক, দুই জন, আবার কোথাও সামান্য বেশী। এইভাবেই ভারতীয় জনসংঘের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের কর্মীদের সম্পর্ক স্থাপন হয়। যাঁরা জনসংঘে এইভাবে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্রীঅটলবিহারী বাজপাই, শ্রীকুশভাহু থাক্‌রে, শ্রীনানাজী দেশমুখ ও শ্রীজগন্নাথরাও যোশী। আমিও রাজস্থানে ভারতীয় জনসংঘে যোগদান করি। আমার দিল্লীতে যাবার বিশেষ প্রয়োজন হত না বলে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের

সঙ্গে আমার পরিচয় সেইরকম গভীর হবার সুযোগ পায়নি। সাধারণত দলের কাজের মাধ্যমে তাঁকে জানবার সুযোগ হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘের সীমিত সাফল্যলাভ হয়েছিল। সারাদেশে ভারতীয় জনসঙ্ঘ লোকসভায় তিনটি আসন জিতেছিল — দুটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে — যার একটি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের ও তৃতীয়টি ছিল মধ্যপ্রদেশে যেখানে শ্রী উমাশঙ্কর ত্রিবেদী জয়ী হন। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির মধ্যে জনসঙ্ঘ আটটি আসন জিতেছিল পশ্চিমবঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যচায়ের ব্যক্তিগত প্রভাবে। রাজস্থান বিধানসভায় আরও আটটি আসনে জনসঙ্ঘ জয়ী হয়। রাজস্থানে জনসঙ্ঘের আটজন বিধায়কই ছিলেন জগীরদার। রাজস্থান বিধানসভায় প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেসী বিধায়করা জাগীরদারী প্রথার উচ্ছেদ করার জন্য বিল আনলেন। আমাদের দলের দু'জন সদস্য ছাড়া অন্যরা এই বিলের বিরোধিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা দলের বিধায়কদের একটি সবা ডেকে বললাম যে আমরা দলের ঘোষিত কর্মসূচীতে জাগীরদারী প্রথার উচ্ছেদ করার দাবী জানিয়েছিলাম। সুতরাং আমাদের দলীয় বিধায়করা প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিরস্ত থাকুন। তাঁরা যদি বিলের কিছু পরিবর্তন অথবা ত্রুটির সংশোধনী প্রস্তাব আনেন তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে — কিন্তু বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া উচিত হবে না।

এই কথা শুনে বিধায়করা বললেন, তাঁরা জনসঙ্ঘে যোগদান করেছেন জনসঙ্ঘের ঘোষিত কর্মসূচী পড়ে নয় — তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করার জন্যই জনসঙ্ঘে এসেছেন তাঁদের এই প্রস্তাবিত বিলের পক্ষে ভোট দিতে হলে তাঁরা তো কংগ্রেস দলেই থাকতেন।

আমাদের দলের নীতি অনুসারে বিধায়কদের ভোট দেবার দাবী জানালেও তাঁরা রাজি হলেন না। বাধ্য হয়ে জঃ মুখোপাধ্যায়কে টেলিফোনে এই অবস্থা জানালাম। তাঁকে বললাম বিধায়করা দলীয় সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নয়। সেই সময় আমাদের দল ছিল একেবারে নতুন ও আমাদের অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল। বিধায়করা নিজেদের প্রাধান্য রাখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আমাদের দলীয় নেতৃত্বকে গ্রাহ্য করছিলেন না।

ডঃ মুখোপাধ্যায় সব শুনে স্থির করলেন এই ব্যাপারে কোনোভাবেই দলীয় নীতির অবমাননা করা যাবে না। তিনি বললেন যে তিনি নিজে জয়পুরে এসে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে সভা করবেন।

তিনি জয়পুরে এসে দলীয় বিধায়কদের যে সভা ডাকলেন তাতে মাত্র দু'জন বিধায়ক উপস্থিত হলেন। তাঁরা হলেন শ্রীভাইরোন সিং শেখাওয়াৎ এবং শ্রীজগৎ সিং ঝালা। শ্রীঝালার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে —কিন্তু দলের সঙ্গে সংযোগ রেখে ছেন। সাধারণ জনসভার পরে ডঃ মুখোপাধ্যায় প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন ও একটি সাধারণ জনসভায় ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, ''ভারতীয় জনসঙ্ঘ একটি নতুন দল এবং ছোট দল। কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও দলীয় নীতি বিসর্জন দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তিনি দলীয় অরাজকতা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। তিনি বললেন, আমি এখানে নিজে উপস্থিত হয়েছি বটে কিন্তু আমাদের দলের বিধায়করা প্রস্থান করেছেন। আমাকে স্থানীয় দলনেতারা বলছেন যে হয় দলীয় বিধায়করা দলের ঘোষিত কর্মসূচী মেনে নিয়ে জাগীরদারী প্রথার উচ্ছেদ বিল সমর্থন করুন নচেৎ দল থেকে বহিষ্কৃত হবেন।" ডঃ মুখোপাধ্যায় এইভাবেই স্থানীয় দলনেতাদের ক্ষমতা দিয়ে গেলেন — বিশৃঙ্খলতা দমনে দলীয় বিধায়কদেরও দরকার হলে দল থেকে বিতাড়িত করার অধিকারও দিলেন। আমরা তারপর ছ'জন বিধায়ককে তাঁদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দিই। সারা ভারতে যখন আমাদের বিধায়ক সংখ্যা মাত্র ষোল জন — তা সত্ত্বেও আমরা ছ'জনকে দল থেকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ বিতাড়িত করতে ইতঃস্তত করিনি। যে দু'জন বিধায়ক দলে রইলেন তাঁদের অন্যতম ভাইরোন সিং শেখাওয়াৎ। বর্তমানে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও দলের এক অতি বিশিষ্ট নেতা।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় কানপুরে। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় পণ্ডিত

দীনদয়াল উপাধ্যায় দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। জনসঙ্ঘ দল গঠনের সময় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশের জনসংঘের সম্পাদক ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের জনসঙ্ঘের সম্পাদক হিসাবে তিনি কানপুর মহাসম্মেলনের দায়িত্বে ছিলেন। এই মহাসম্মেলনে জঃ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ স্থাপন হয়। আমি তার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি এখনও মনে রেখেছি — ''আমাদের যদি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মত দু'তিন জন সহযোগী পাওয়া যেত, তা হলে অবিলম্বে সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে দিতাম।''

কানপুরের মাহসম্মেলনেই কাশ্মীরের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ডঃ মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিঠি লিখেছেন। জনসংঘের কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রস্তাব এই সভাতেই অনুমোদিত হয়। ঠিক হয় যে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রচলিত অনুমতি পত্র তুলে দিতে হবে, এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে দলীয় কর্মীদের ঘৃণ্য অনুমতি প্রথা অগ্রাহ্য করে কাশ্মীরে যেতে হবে।

সেই সময় কাশ্মীরে ভারতের পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ ছিল। শ্যামাপ্রসাদ আহ্বান করলেন। একই দেশে, দুইরকম সংবিধান, দুই রাজ্য প্রধান, দুইরকম রাষ্ট্রীয় পতাকা — চলবে না — চলবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এইরকম অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক অবস্থা হতে দিয়েছিলেন। তিনি সেখ আবদুল্লার আব্দার — কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকবে — মেনে নিয়ে বিদেশে গেলেন। ভারতের গণপরিষদে বিষয়টি আলোচনার জন্যে উত্থাপিত হল। নেহেরু শ্রীগোপালকৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারকে আদেশ দিলেন যেন গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা পাশ করানো হয়। সৌভাগ্যবশতঃ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল এই ধারা পাশ করানোর বিপক্ষে ছিলেন। গোপালস্বামী আয়েঙ্গার তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের শরণাপন্ন হলেন ও তাঁর সাহায্য চাইলেন। সর্দার প্যাটেল বললেন যে তিনিও এই ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে। তবে যেহেতু নেহেরু ইতিমধ্যে এই বিচিত্র ৩৭০ ধারার পাশ করানোর জন্যে দায়বদ্ধ হয়েছেন, সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির অনুমোদনের ব্যবস্থা করলেন। এই ধারাটি একটি অতি সাময়িক ধারা বলে পাশ করানো হলেও আজও ঐ ধারাকে অপরিবর্তিত রেখে দেওয়ার পক্ষে। সেইজন্য কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। যখনই আমরা প্রাদেশিক সমতার কথা তুলি আমাদের সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার করা হয়। বলা হয় এটা জওহরলাল নেহেরুর শপথ ছিল। কিন্তু যাঁরা এই কথা বলেন তারা কোন প্রামাণ্য কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

শ্যামাপ্রসাদ এই বিচিত্র পরিস্থিতির শিকার হলেন। হয়তো শ্রীঅটলবিহারী বাজপায়ী এই বিষয়ে আরও আলোকপাত করতে পারেন। ২৩ শে জুন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আমি জয়পুরে ছিলাম। ভোর ৪-৩০ মিনিটে একজন পরিচিত সাংবাদিক কাঁদতে কাঁদতে আমার বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হয়ে বললেন, ''আপনি খি শুনেছেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ আর জীবিত নেই?''

আমি হতভম্ভ হয়ে বলি, ''কি বলছেন আপনি?''

তিনি উত্তর দিলেন, ''এইমাত্র টেলিপ্রিন্টারে এই দুঃসংবাদ প্রেরিত হয়েছে। সারা ভারত আজ শোকে আচ্ছন্ন।''

অকস্মাৎ শ্যামাপ্রসাদের এই আত্মত্যাগ — দেশের জন্য তাঁকে বলিদান করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের পক্ষে এই ঘটনা এক বিরাট ভূ-কম্পনের মত।

শ্যামাপ্রসাদের বলিদানের ফলস্বরূপ আজ ভারতের জাতীয় পতাকা কাশ্মীরে উড্ডীয়মান। ঘৃণ্য ''পারমিট'' প্রথা সরকার তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতির আধিপত্য কাশ্মীরে স্থাপিত হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন কাশ্মীরেও নির্বাচন প্রথা চালিত করতে পেরেছে। ভারতের অডিট ও কম্পট্রোলার জেনারেল কাশ্মীর রাজ্যের হিসাব-নিকাশ দেখার অধিকার পেয়েছেন। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কাশ্মীরে ভারতীয় আইনের শাসন দেখার ক্ষমতা পেয়েছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদের অমর শহীদত্ব বরণের ফলে। বর্তমান সময়ে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারার যে বাধা এখনও রয়েছে তার ফলে ভারতের অন্য কোন অংশ থেকে কোনও ব্যক্তি কাশ্মীরবাসী হতে পারবে না। আমি ভারত বিভাগের পর করাচী থেকে এখানে আসি ও ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের মত সকল অধিকারই লাভ করেছি। কিন্তু সেদিন শিয়ালকোট থেকে যাঁরা জম্মুতে এসেছিলেন আজও তাঁদের পুত্রকন্যারা সেখানের কোনও টেকনিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হতে পারবেন না অথবা কাশ্মীর সরকারের চাকুরী পাবার অধিকারী নন।

শ্যামাপ্রসাদ বিরাট ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মী ও অতুলনীয় সাংসদ হিসাবে তাঁর স্থান লোকে স্মরণ করবে। তাঁর মত প্রকৃত শিক্ষাব্রতী ভারতে বিরল। অতি অল্প সময়ে তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বিরাট সংগঠক ও গঠন ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর মৃত্যুতে দেশ প্রকৃত জাতীয় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল চিরকালের জন্য। তাঁর আদর্শ এবং পূণ্য স্মৃতিই আমাদের এখন পাথেয় হয়ে রয়েছে।

# এক কালোত্তীর্ণ নেতা যিনি নিজের সময়ের থেকে ছিলেন অনেক এগিয়ে

## শ্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী

জাতির জীবনের এক বিক্ষুব্ধ ও টালমাটাল সময়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এসেছিলেন এক নেতা। হয়ে উঠেছিলেন নৈতিক পথ নির্দেশের মানদন্ড। জুগিয়েছিলেন সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনা, দূরদৃষ্টি, দেশবাসীকে দিয়েছিলেন একত্রিত হয়ে থাকার মন্ত্র। একটি শতাব্দী শেষের এমনই এক সন্ধিক্ষণে ভারত পেয়েছিল তার অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। যিনি কর্মশক্তি, হৃদয়বানতা ও মানসিকতায় ছিলেন সহজাত গুণসম্পন্ন।

আমাদের মতো যারা তাকে জানতাম তাদের কাছে তিনি প্রথমত ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির মানসিক গুণে সমৃদ্ধ যে যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল—তিনি তাদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিলেন। তারা অনুপ্রাণিত বোধ করেছিল। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত সমব্যথী, মানসিকতায় উজার ও অপরিমেয় উষ্ণতার এক দয়ালু মানুষ। তিনি অন্যের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে সশ্রদ্ধ। আর সহজাত এক আশ্চর্য কৌতুকবোধ ছিল তাঁর সঙ্গী যা তিনি সময় সময় নিজের ওপরই প্রয়োগ করতেন।

কত বলা যায়! তিনি এমন এক অতুলনীয় বক্তা ছিলেন যে বক্তৃতার সময় তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে অবলীলায়বিশাল দুরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন বিষয়ে চলে যেতে পারতেন। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানোর সঙ্গে শুভ কাজে

তাদের অনায়াসে উদ্বুদ্ধ করার কমতা ছিলতাঁর কেননা জনতার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল সরাসরি। যে কোন জটিলতম বিষয় ও সেই সংক্রান্ত বিশদ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি একটি মাত্র বাক্যে বা প্রশ্নে তার কেন্দ্রবিন্দুতে দ্রুত পৌঁছে যেতেন। চিন্তা স্তরের বিরল স্বচ্ছতাই যে ছিল এর ভিত্তি তা নিশ্চিত।

মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট শহরে এক উচ্চ আদর্শের সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপর্ব যেমন উত্তাল হয়ে ওঠার মুখে তখনই তাঁর যৌবন ও শিক্ষা জীবনের সময়। পড়াশোনার সাফল্যের সঙ্গে এই সময়ই তাঁর মধ্যে জনহিতকর কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে।

জনসঙ্ঘের এক জন সাধারণ কার্যকর্তা থেকে শুরু করে তিনি এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে সর্বাসেই এক জাতীয় দল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ,দলটির নাম বিজেপি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পর তিনিই হল দলের কর্ণধার (জনসঙ্ঘ)। তিনিই ছিলেন বিজেপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

সংসদে চার দশক ধরে নেতৃত্ব দেওয়ায়, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে কেই বা ভুলতে পারবে, দিল্লীর রামলীলা ময়দানে স্মরণীয় সমাবেশে দেওয়া সেই ভাষণ? সেই বিক্ষুব্ধ সময়ে তাঁর ভাষণই হয়ে ওঠে জাতির সংগ্রাম-মন্ত্র। একটা জিনিষ সব সময়ে চোখেপড়েছে যে তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলিতে দলের অবস্থান গভীর অনুরাগের সঙ্গে উপস্থাপন করলেও তিনি কিন্তু শেষমেশ বলেছেন দেশেরই জন্য। তিনিই দেশে গণতন্ত্রের মূলকথাকে বুঝতে শিখি য়েছেন। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসে সর্বদা দৃঢ় থেকেও তিনি কিন্তু অন্যদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। বিকল্প ভাবনাকে তিনি আজীবন সম্মানে পরিসর দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে হলে—সংসদীয় বক্তৃতা—বিতর্কের মান ঠিক কি হওয়া উচিত তা তিনিই নির্ধারণ করে যান। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি তরুণ জাতির প্রেরণার আধার।

১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি তিনি অর্থনীতির ছন্নছাড়া অবস্থা থেকে তার পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন। সেই সময় দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতির পরিস্থিতি ছিল অস্থির। ৯০-এর প্রারম্ভে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার বিশ্বব্যাপী এক অনিশ্চিত বাতাবরণের প্রভাবে সেই নাবালক অবস্থাতেই মুখ থুবড়েপড়ার উপক্রম হয়েছিল। বিগত দুটি দশক ধরে আমরা যে অর্থনৈতিক সাফল্য চাক্ষুস করছি তাঁর বীজ বপন হয়েছিঢ় তাঁরই হাত দিয়ে। তাঁরকাছে বৃদ্ধি বা উন্নতির অর্থ ছিল দুর্বলতাকে ক্ষমতাবান করে তোলা। দূর্বল মানুষটিকে সমাজের মূলস্রোতে অংশীদার করা। বলা দরকার যে আমাদের চলতি সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেই তাঁরই নির্দেশিত পন্থা আমরা অনুসরণ করে চলেছি।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে ভারত যাতে উপযুক্ত হয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে তার বুনিয়াদ তৈরী করার কমিটি করেছিলেন অটলজী। তাঁর সরকারের ভবিষ্যৎতেরমুখ্য অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি ও সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপই আজ বহু ভারতীয় সমৃদ্ধির পথে চলেছে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রয়োজন-নির্ভর -পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন রাস্তা তৈরী ও টেলিকম শিল্পের উন্নয়নে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরিনতিতেই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে। হ্যাঁ, অটলজী বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের স্থান চির-অপরিবর্তনীয়ভাবেই বদলে দিয়ে গেছেন। জাতির সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দকে তিনি অনায়াসে কাটাতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন দেশকে পরমানু শক্তিধর করে তোলার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের বাধা ও হুমকিকে জয় করতে। জয় করতে পেরেছিলেন দেশেরবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কাকে। এমন একটা সিদ্ধান্ত তিনি লঘুভাবে নেননি। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন দেশের নিরাপত্তার অসীম গুরুত্ব যা প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছিল।

ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর কোনদিনই ঠুনকো থাকবে না। জাতির সেই তীব্র অগ্রগতি ও সর্বো মুহূর্তে তাঁর অবস্থান কিন্তু ছিল এক আত্মনিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্ববান নেতার। সেই সময় সারা বিশ্ব কান পেতে শুনছিল এই শান্তি পথিকের প্রজ্ঞা-খচিত বার্তা।

ঠিক এই সময় সময়েই তিনি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-চর্চিত পররাষ্ট্র সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও অতুলনীয় কূটনৈতিক দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে যারা বিশ্বকে নতুন পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার যৌক্তিকতা বোঝাতে পেরেছিলেন।

আর সত্যিই তাঁরই প্রদর্শিত পথে একধারে কৌশলগতভাবে সক্ষম হয়ে ওঠার সঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী কূটনীতির পথ অনুসরণ ও প্রবাসী ভারতীয়দের ক্ষমতাকে দেশের উন্নতিতে কাজে লাগানোর যে চমকপ্রদ উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন তারই ভিত্তিতে বিশ্বের চোখে আজ ভারতের এত সম্মান।

তাঁর শেষ পাঁচ বছরের কার্যকালেই ৫০বছর ধরেচলা ভারত-মার্কিন মনকষাকষি এক দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ পায়। অন্যদিকে ২০০০ সালে সোভিয়েত পতন পরবর্তী নতুন রাশিয়ার সঙ্গেও তিনি সেই কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এক গভীর বন্ধুত্বের চেহারা দেন।

দীর্ঘদিনের তিক্ত অতীতের বোঝাকে অতিক্রম করে তিনি চিনের ক্ষেত্রে চরম সাহসিক এক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সীমানা সংক্রান্ত আলোচনা চালাতে তিনি দু'দেশের তরফে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগেরনতুন কৌশল তৈরী করেছিলেন। এই সূত্রে অটলজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বের এই দুই প্রাচীন সভ্যতার দেশ আজ অগ্রসরমান শক্তি। এরা পরস্পর হয়ত মিলিয়ে চললে ভবিষ্যতে বিশ্ব নির্মাণ এদেরই হাতেথাকবে। অটলজীর এই ভাবনাই আমার নীতিকেও পরিচালিত করে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে নেতা হয়েছিলেন বলে তিনি ভারতের পড়শি দেশগুলিকে সদা গুরুত্ব দিতেন। প্রকৃতপক্ষে অনেকদিক থেকেই তিনিই ছিলেন

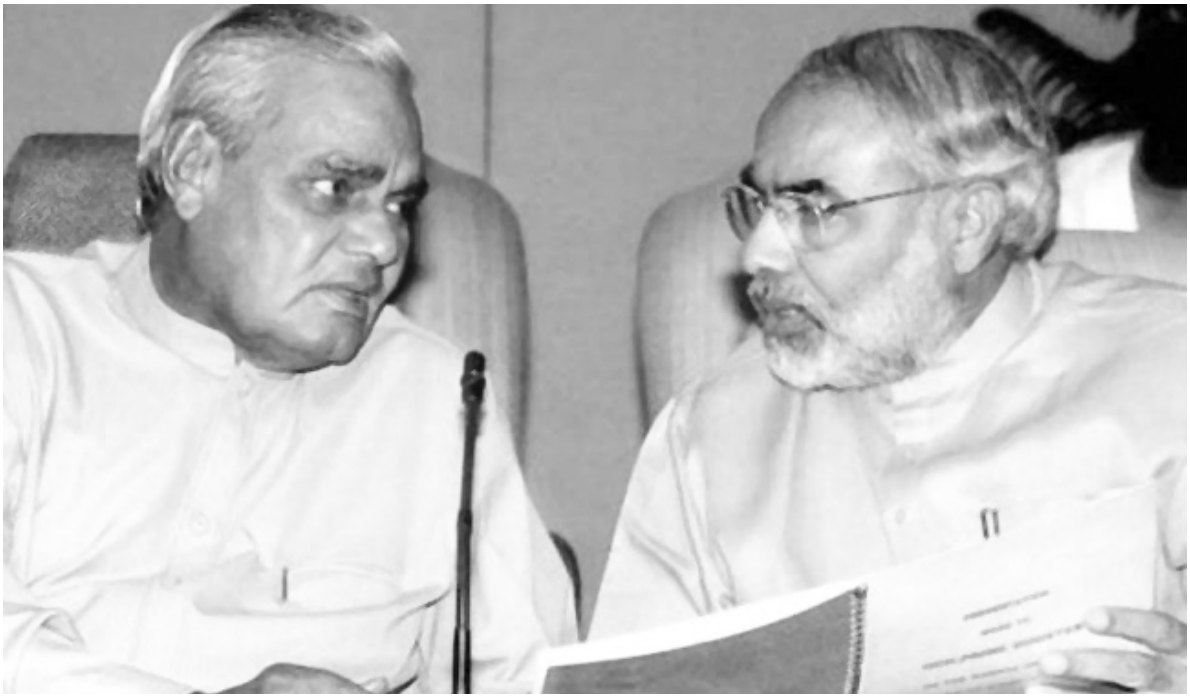

আজকের অনুসূত। 'প্রতিবেশী প্রথম' এই ভাবনার অনুপ্রেরণা তো বটেই এমনকি পথিকৃৎ। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধী নেতা হিসেবে তিনি ভারত সরকারের নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গেছেন। দু'দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে লাহোব-বাস যাত্রার সূচনা করেছিলেন। গিয়েছিলেন পাকিস্থানে। একনিষ্ঠতা ও চির-আশাবাদী-মানসিকতার মানুষ হিসাবে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত ক্ষতে শান্তি প্রলেব দেওয়ার-নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কার্গিল যুদ্ধ জয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যখন আমাদের সংসদের ওপরই সন্ত্রাসী আক্রমণ হল তখনই তিনি সারা বিশ্বকে উপলব্ধি করতে বাধ্য করলেন যে ভারতের বিরুদ্ধে 'সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাসের' আসল চেহারাটা কেমন আর উৎসই বা কোথায়।

ব্যক্তিগতভাবে অটলজী আমার আদর্শ পুরুষ ও গুরু। তিনিই সেই Role model যিনি আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। হ্যাঁ, কি গুজরাটের ক্ষেত্রে কি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রতিটিতেই তিনিই আমাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ন্যস্ত করেছিলেন আস্থা। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন 'এক্ষুনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হতে সেখানে যাও।' আমি যখন প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম যে আমি তো আজীবন সংগঠনের কাজেই অভ্যস্ত তার উত্তরে অটলজী বলেছিলেন 'আমার বিশ্বাস আছে, তুমি সেখানে গিয়ে জনগনের আশা আকাঙ্খার পূরণ করতে পারবে।' আমার প্রতি তাঁর এই বিশ্বাসের প্রকাশ দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

আজকে আমরা একটা আত্নবিশ্বাসী জাতি। আমাদের যুবক যুবতীরা কর্মোদ্দীপনায় ভরপুর। দেশের মানুষ ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে দৃঢ় সঙ্কল্প ও উৎসুক। তারা এটাও জানে যে কাজটা সফল করতে তারা সক্ষম। তারা উন্মুখ পরিচ্ছন্ন ও সজাগ একটি প্রশাসন পেতে যে ভবিষ্যতে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে পারবে যাতে সব ভারতীয় সমান সুযোগ পেতে পারে।

বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে আমরা একাত্ম মনে করি। আমাদের মধ্যে তফাতবোধ নেই। আমরা শান্তিকামী। আমরা নীতিনিষ্ঠতার মাধ্যমে সকলের আকাঙ্খাকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত। আমরা ঠিক সেই পথেরই যাত্রী যে পথ আমাদের জন্য চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন অটলজী। এক গভীর ইতিহাস চেতনার অধিকারী হওয়ায় তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে।

একটি জীবনদীপ যেমন নির্বাপিত হয়ে যায় তখন তাকে ঘিরে কতটা শোক প্রকাশিত হল শুধু তার নিরিখে সেইব্যক্তির জীবনচর্যাকে বিচার করা উচিত নয়। সেই জীবনের পরিমাপ পেতে হলে বুঝতে হবে তিনি মানুষের উপর কি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেলেন? একইসঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের ওপর রেখে গেলেন কি অভিঘাত? এই পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে বলতে হবে অটলজী ছিলেন এক নিখাদ 'ভারত রত্ন'। আগামী দিনে তাঁর স্বপ্নের নতুন ভারত নির্মাণে তাঁর প্রেরণাই হবে আমাদের ধ্রুবতারা।

**অনুবাদ—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

# হিন্দু মহাসভা থেকে বিজেপি - এক দীর্ঘ যাত্রাপথ ও শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন

## তথাগত রায়

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন মা সরস্বতীর প্রাঙ্গন ছেড়ে রাজনীতির ক্লেদাক্ত ময়দানে নামতে বাধ্য হলেন শ্যামাপ্রসাদ তখন কি তাঁর চোখে কোনো স্বপ্ন ছিল? না থাকাই সম্ভব। বয়স মাত্র আটত্রিশ, এর মধ্যেই জীবনের মধু ও গরল দুয়েরই স্বাদ পেয়ে গেছেন তিনি। একদিকে যেমনি ভারতের সর্বাগ্রগণ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে, তেমনি প্রিয়তমা পত্নী সুধা দেবীকে হারিয়েছেন মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে। কিন্তু এর মধ্যে কখনো রাজনীতিতে মন দেবার সময় পান নি, পুরো সময়টা কাটিয়েছেন তাঁর ও তাঁর পিতৃদেব স্যার আশুতোষের পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও উন্নতিকল্পে। পিতাপুত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম তখন তুঙ্গে—যা আজ ভাবাই যায় না। যাক সে কথা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার প্রাঙ্গন ছেড়ে তাহলে শ্যামাপ্রাসাদ রাজনীতিতে এলেন কেন? এর উত্তর দিতে হলে একটু ইতিহাসচর্চা করতে হবে, কারণ এই ইতিহাসটা স্বাধীনতার পর থেকে চাপা পড়ে আছে।

১৯৩৫ সালে বিলাতের পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হয় যার নাম ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ (Government of India Act 1935)। এই আইনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হয়, যদিও কর্তৃত্ব ধরা ছিল ইংরেজ গভর্নরের হাতে। এই আইন অনুযায়ী বাংলায় নির্বাচন হয় ১৯৩৭ সালে, তাতে বিবদমান পক্ষ ছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। এই তৃতীয় পার্টিটির নেতা ও সদস্যরা প্রায় সবাই মুসলমান হলেও, এরা মূলত সাম্প্রদায়িক ছিল না, এদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের কল্যাণ, ঋণ মকুব, ইত্যাদি। মুসলিম লীগ অবশ্য খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক পার্টি ছিল, আর কংগ্রেস বলত তারা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত পার্টি, বাস্তব যতই অন্যরকম হোক না কেন। যখন নির্বাচনের ফল বেরুলো তখন দেখা গেল কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের উচিত ছিল ফজলুল হকের সঙ্গে জোট বাঁধা এবং হক সাহেবও তাই সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস এক অসাধারণ রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে তা করল না, এবং ফলে হক সাহেব মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে বাধ্য হলেন।

হক সাহেব মূলত সাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন না, কিন্তু দুর্বলচিত্ত

ছিলেন। এবার এই লীগ-কৃষক প্রজাপার্টির মিলিজুলি সরকার লীগের প্রভাবে ভয়ঙ্কর ভাবে হিন্দুদের বঞ্চনা আরম্ভ করল, এবং কংগ্রেস তাদের মুসলমানপ্রেমের বশবর্তী হয়ে এই বিষয়ে কিছুই করল না। ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজের অগ্রগণ্য মানুষেরা—যাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী—শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের নেতৃত্ব দিতে। শ্যামাপ্রসাদ সম্মত হলেন, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভায়

যোগ দিলেন এবং এক বছরের মধ্যে দলের সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি মনোনীত হলেন, কারণ সভাপতি সাভারকারের শরীর ভাল যাচ্ছিল না।

দায়িত্ব নিয়েই শ্যামাপ্রসাদ এক ভোজবাজি দেখালেন। তিনি ফজলুল হককে লীগের খপ্পর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এলেন এবং একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন যার পোশাকি নাম হল Progressive Democratic Coalition। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে যে নাম ফিরত তা হল "শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা"। এই মন্ত্রিসভা পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের দৃষ্টান্ত রাখল এবং স্বল্প সময়ের জন্য বাঙালি হিন্দুরা ন্যায়বিচার পেলেন। কিন্তু এই সময়কার বাংলার ইংরেজ গভর্নর হারবার্ট ছিল এক মূর্তিমান শয়তান। হক সাহেবের দুর্বলচিত্ততার সুযোগ নিয়ে সে এই সরকারকে উল্টে দিল এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে এক মুসলিম লীগ সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিল।

এর পর আমরা শ্যামাপ্রাসাদকে পাই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা হিসাবে। ক্ষমতায় মুসলিম লীগ থাকার ফলে ও তাদের পিছনে ইংরেজ গভর্নরের পক্ষপাত থাকার ফলে বিরোধী দলনেতার একমাত্র কর্তব্য ছিল আইনসভায় সরকারকে সমালোচনা করা। বাংলার আইনসভায় তখন প্রধান বিরোধী দল ছিল কংগ্রেস। কিন্তু বাগ্মিতায় শ্যামাপ্রসাদের ধারেকাছে কোনো কংগ্রেস নেতা ছিলেন না, এবং বিদ্রূপের কশাঘাতে মুসলিম লীগ সরকারকে পর্যুদস্ত করতেন শ্যামাপ্রসাদ। তারপর অবশ্য লীগ সরকার যা ইচ্ছা তাই করত। এই ঘটনা ঘটেছে ১৯৪৩ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে, যাতে আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যান; ঘটেছে মুসলিম লীগ-কৃত কলকাতার দাঙ্গায়, যাতে হিন্দু-মুসলমান মিলে মৃত আনুমানিক হাজার দশেক; এবং ঘটেছে (এও মুসলিম লীগ-কৃত) নোয়াখালির হিন্দু নির্যাতনে, যাতে মৃত্যু আনুমানিক হাজারখানেক, কিন্তু হিন্দু নারী ধর্ষণ, সম্পত্তি ধ্বংস ও বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ অসংখ্য। উল্লেখ্য, নোয়াখালিতে কিন্তু দাঙ্গা হয় নি, হয়েছিল একতরফা হিন্দুহত্যা ও নির্যাতন।

নোয়াখালি পৃথিবী জুড়ে প্রচার পেয়েছিল গান্ধীজির জন্য। কিন্তু গান্ধীজি এখানে পুরোপুরি ব্যর্থ। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমদের প্রতি প্রেম বিতরণ করে তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে, যাতে তারা গৃহচ্যুত হিন্দুদের আবার ডেকে নেয়। অবশ্য নিহত হিন্দুদের জীবনদান করা যাবে কি না এবং ধর্ষিতা হিন্দু মেয়েদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি। কোনো লাভ হয় নি, কোনো মুসলিম কোনো হিন্দুকে ডাকে নি, কোনো হিন্দুও ফিরে আসে নি। শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু পুরো উল্টো কথা বলেছিলেন, যা বিশাল বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। তিনি মধুপুরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য থাকাকালীন নিজের বাংলা ডায়েরিতে ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে লিখেছিলেন একটা civil war (গৃহযুদ্ধ) ছাড়া হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না। কথাটি নিয়ে যতই বিতর্ক হোক, মুসলিম লীগ যে কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির হিন্দুনির্যাতন করেছিল তা আদতে civil war ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর আগে ৮ই জানুয়ারী তারিখে ইংরেজি ডায়েরিতে লিখেছিলেন 'শেষ বিশ্লেষণে শক্তিকে শক্তি দিয়েই রুখতে হবে। সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে বাধা না দিয়ে নিশ্চল হয়ে থাকলে যে কোনো সমাজই ধ্বংস হয়ে যাবে'। স্পষ্টতই এতে গান্ধীবাদী অহিংসা নীতিকে নস্যাৎ করা হয়েছে।

প্রথম জীবনে আমরা শ্যামাপ্রসাদকে শিক্ষাব্রতী হিসাবে দেখেছি, তারপর দেখেছি রাজনীতিক ও বাগ্মী হিসাবে। হিন্দু সমাজ নোয়াখালিতে তাঁর আর একটি রূপ দেখল—সমাজ সংস্কারকের রূপ। তখন পর্যন্ত হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রথা ছিল, যদি কোনো হিন্দুকে জোর করে গোমাংস খাইয়ে দেওয়া যেত তাহলে তার হিন্দু সমাজে ফিরে আসার কোনো উপায় ছিল না—কিছু কিছু জায়গায় প্রচুর খরচ করে কিছু ব্রাহ্মণকে খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসা যেত। কিন্তু কোনো হিন্দু নারী ধর্ষিতা হলে তার উপায় ছিল তিনটি হয় মুসলমান হয়ে যাওয়া, নয় যৌনকর্মী হয়ে যাওয়া, আর না হলে আত্মহত্যা করা। এর বিরুদ্ধে সিংহগর্জনে প্রতিবাদ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, এবং সাহায্য পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দের ও বিভিন্ন পন্ডিতসমাজের—যার ফলে যে সব হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তারা সবাই কোনো প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই হিন্দুসমাজে ফিরে আসেন।

এরপর এল দেশের স্বাধীনতা, দেশভাগ ও শ্যামাপ্রসাদের জীবনের মহত্তম কীর্তি, পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। জিন্নার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতারা মাথা সোজা রাখতে পারলেন না। তাছাড়া তাঁদের ক্ষমতায় আসার, মসনদে বসার জন্য প্রচন্ড আকুলিবিকুলিও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। যখন দেখা গেল দেশভাগ হবেই, তখন মুসলিম লীগ ধরে নিয়েছিল দেশভাগ হলে মুসলিম-প্রধান বাংলা অবশ্যই পুরোপুরি পূর্ব পাকিস্তানে যাবে, এবং হিন্দু-প্রধান আসামও বাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কালক্রমে পাকিস্তানে ঢুকে যাবে।

কিন্তু এতে বাদ সাধলেন শ্যামাপ্রসাদ। সারা বাংলা চষে বেড়ালেন, হিন্দুদের নিয়ে সভা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে বাংলা ভাগ করে বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করলেন। এই দুঃখ, বিশেষ করে কলকাতা না পাওয়া, মুসলমানদের একটি অংশ তিয়াত্তর বছরেও ভুলতে পারে নি। এবং এইজন্য তারা (এবং তাদের পদলেহক হিন্দুরা) শ্যামাপ্রসাদকে 'শ্যামাপোকা' ইত্যাদি বলে গালি দেয়। শেখ মুজিবর রহমান পর্যন্ত তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এই নিয়ে বিলাপ করেছেন।

স্বাধীনতার পর নুতন মন্ত্রিসভা গঠিত হল এবং তাতে শ্যামাপ্রসাদ শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করলেন।১৯৫০

সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। এই স্বল্প তিন বছরেরও কম সময়ে তিনি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা ও সিন্ধ্রি সার কারখানা স্থাপন করে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে পূর্ববাংলার হতভাগ্য হিন্দুদের অবস্থার প্রতিও তিনি পুরোপুরি সজাগ ছিলেন। এই সময়ে, বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ববাংলার উচ্চপদে গেড়ে বসার পরে, হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে, এবং নেহরু যথারীতি তা নিয়ে কিছু নির্বোধ চুক্তি করে সন্তুষ্ট থাকেন। শেষপর্যন্ত এই নির্যাতন গণহত্যার পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে,এবং নেহরু আবার আর এক নির্বোধ চুক্তি করে মনে করেন, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দুই বাঙালি মন্ত্রী, অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ এবং ক্ষিতীশ নিয়োগী পদত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বিশেষত সাভারকারের, কিছু মতভেদের ফলে তিনি হিন্দু মহাসভা ১৯৪৮ সালেই ছেড়ে দিয়েছেন। তার পর থেকে তিনি দলহীন নেতা। ১৯৫০ সালে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক গুরুজি গোলওয়ালকার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বলেন একটি নুতন দল গঠন করতে। শ্যামাপ্রসাদের নিজের এই বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল, কিন্তু গোলওয়ালকার তাঁকে বলেন সবচেয়ে ভাল কয়েকজন স্বয়ংসেবক তাঁকে দল তৈরির জন্য দেবেন। এবং এইভাবে দলে আসেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুন্দরসিংহ ভান্ডারী, বলরাজ মাধোক, পন্ডিত মৌলীচন্দ্র শর্মা ইত্যাদিরা।

তবু শ্যামাপ্রসাদ রাতারাতি দল তৈরী করেন নি। সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন, বহু লোকের সঙ্গে বৈঠক করেন, দলের নাম ও কর্মসূচি নিয়ে বহু চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত ২১ অক্টোবর ১৯৫১ তারিখে দিল্লীর রাঘোমল আর্য কন্যা বিদ্যালয়ে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই দিন বিকালে গান্ধী গ্রাউন্ডস-এ (বর্তমান গুরুদ্বার সিসগঞ্জ-এর সামনে) এক মহতী জনসভায় এই প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে ভাষণ দেন শ্যামাপ্রসাদ।

সেই আরম্ভ হল জনসঙ্ঘের জয়যাত্রা। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, প্রথমত শ্যামাপ্রসাদ এই জয়যাত্রা দেখে যেতে পারেন নি ; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর নিজের রাজ্য, নিজের সৃষ্ট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই তাঁর দল ব্রাত্য হয়ে গেল। যদিও শ্যামাপ্রসাদের পরে জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছিলেন আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ, এবং দলে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ গাঙ্গুলী ইত্যাদির মত নিবেদিতপ্রাণ, কর্মঠ নেতা ছিলেন তবু বামেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এঁরা আটকাতে পারেন নি। ইতিমধ্যে শেখ আবদুল্লা ও জওহরলাল নেহরুর সম্মিলিত এক ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরের শ্রীনগরে বন্দিদশায় শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হল। বন্দিদশায় কারো মৃত্যু হলে, বিশেষ করে যদি তিনি শ্যামাপ্রসাদের মত ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হন, সে ব্যাপারে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে পাঁচটি তদন্ত হয়েছিল—একটি ব্রিটিশ, একটি জাপানি ও তিনটি ভারত সরকারের। গান্ধীজি, ইন্দিরা ও রাজীব যদিও মানুষের চোখের সামনে মারা গিয়েছিলেন, তবুও তাঁদের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত হয়েছিল। আর শ্যামাপ্রসাদ মারা গেলেন শত্রুপুরীতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, আত্মীয়-পরিজন থেকে বহু দূরে—তবু কোনো তদন্ত হল না, সংখ্যাধিক্যের জোরে নেহরু সব তদন্ত আটকে দিলেন।

কিন্তু মহৎ কারণে আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। জনসঙ্ঘ বাড়তে লাগল। তারপর ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার শেষে যখন জয়প্রকাশ নারায়ণ সব দল মিলে জনতা পার্টি গঠন করার ডাক দিলেন তখন দেশের স্বার্থে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে জনসঙ্ঘ জনতা পার্টিতে মিশে গেল।

কিন্তু এই মিশ্রণ স্থায়ী হল না, কারণ মতাদর্শ বা বিচারধারার দিক দিয়ে জনসঙ্ঘের সঙ্গে বাকি দলগুলির কোনো মিল ছিল না। অতএব অন্য দলগুলি জনসঙ্ঘের পিছনে লাগল এবং ধুয়ো তুলল. রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, নচেৎ জনতা পার্টিতে থাকা চলবে না। মামার বাড়ির আবদার আর কি! তখন প্রাক্তন জনসঙ্ঘের নেতারা বললেন রইল তোমাদের জনতা পার্টি, আমরা চললাম। তারপর সেই নেতারা ১৯৮০ সালে আবার নতুন পার্টি তৈরী করলেন, কিন্তু পুরোনো নাম বা চিহ্নে ফিরে গেলেন না। নাম হল ভারতীয় জনসঙ্ঘের বদলে ভারতীয় জনতা পার্টি, চিহ্ন হল প্রদীপের বদলে পদ্মফুল।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আজকে সেই ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন। সাবেক জনতা পার্টি কবেই খড়কুটোর মত বাতাসে উড়ে গেছে! শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেসের এখন পারিবারিক শাসনের চাপে পর্যুদস্ত অবস্থা, সংসদে আসনসংখ্যা দুই অঙ্কে নেমে এসেছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র উঠে যাবার পরে এবং চীন পুরোপুরি পুঁজিবাদী অর্থনীতি আশ্রয় করার ফলে বামপন্থীরা আজ দিশাহীন। কিছু আঞ্চলিক দল এক নেতাকে আশ্রয় করে টিকে আছে, সেই নেতা নেই তো দলও নেই। কিন্তু বিজেপি আছে, থাকবে। কারণ এই দল আদর্শ-আশ্রয়ী দল, যে আদর্শের ভিত্তি প্রোথিত আছে ভারতের পাঁচ হাজার বছরের পরম্পরার মধ্যে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আজ নিশ্চয়ই শ্যামাপ্রসাদ স্বর্গ থেকে তৃপ্তির হাসি হাসছেন। স্বপ্ন সার্থক হলে যে হাসি হয় সেই হাসি।

**(লেখক—পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি (২০০২-২০০৬); বিজেপি জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য (২০০২-২০১৫); রাজ্যপাল (২০১৫-২০২০) ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশ )**

# সূর্যোদয়ের পথে পশ্চিমবঙ্গ

## দিলীপ ঘোষ

গত প্রায় ৫০ বছর পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ্যা যুগ। বামশাসনের ৩৪ আর তৃনমুলীদের ১০ বছর। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার আগে থেকেই বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত হয়েছে বাংলা। নেতাজী রহস্য, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু, বাংলায় কোটি কোটি বাঙালী হিন্দুর সর্বসান্ত হয়ে এ বাংলায় চলে আসা। অসহায় মৃত্যু, কদর্য অত্যাচারের এক নির্মম ছবি আজও বাঙালী হিন্দুর চোখ জলে ভরে তোলে। ১৯৪৬ — ৪৭ থেকে আজও, কোনওদিন থামল না আমাদের কান্নার রোল। চরম মুর্খামির খেসারত দিল বাঙালী হিন্দু ১৯৪৬ থেকে আবার ১৯৭১ এ বারবার। ১৯৬৪ র দাঙ্গায় পাক শাসিত পুর্ববঙ্গ থেকে যত হিন্দু এখানে পালিয়ে আসে তার থেকে অনেক বেশী হিন্দু পালিয়ে আসে ১৯৭১ এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। এক চরম ধোঁকা হয় বাঙালী হিন্দুর সাথে। "জয় বাংলা" শ্লোগানের পরিবর্তে আসে এক নতুন শব্দ, মুজিবের মুখে—ইনসা আল্লা। স্বাধীন বাংলাদেশ নামে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও হিন্দু আর নিরাপদ মনে করেনি স্বাধীন বাংলাদেশে। মাত্র ২০ বছরের তফাতে বিপুল পরিমাণ শরনার্থীর চাপে বেহাল বাংলা, সাথে কংগ্রেসীদের অমানবিক আচরণ। পুনর্বাসনের নামে নরম মাটির বাঙালীকে দন্ডকারণ্যের রুক্ষ মাটি কিম্বা আন্দামানের বিপদসঙ্কুল, রোগের বীভৎসতার মধ্যে ঠেলে দেবার গভীর চক্রান্ত। আর এখানের শরনার্থী শিবিরে শুরু আরো বড় নোংরামী। কাজ করলে মিলবে না সরকারী সাহায্য—বাঙালী হিন্দু যুবকেরা বিড়ি ফুঁকে, তাস খেলে তলিয়ে গেল অতলে। মাঝে একটা বলি—বাংলাদেশ থেকে সেদিন শুধু হিন্দুই আসে নি, সমপরিমাণ মুসলিমকেও ঢোকান হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। ( সুত্র—শ্রী মোহিত রায়)

এই অব্যবস্থার সুযোগে বামপন্থীদের উত্থান। ১৯৭৫ এ ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী অত্যাচারী ইমার্জেন্সির পর বদল এলো সারা ভারতে, বদল হলো বাংলায়। শুরু বাঙালীর আরো এক দুর্ভাগের করুন কাহিনী। ৩৪ বছর ধরে কংগ্রেসীদের পুর্ণ মদতে চলল পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ্যা যুগ। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বজনপোষন, অনুন্নয়ন, মিথ্যাচার, অনুপ্রবেশ, কুকথা চলল বেপরোয়াভাবে।

ফলে সবাই গলায় ফাঁসির দড়ি চেপে আসা থেকে মুক্তি চাইল। মমতা ব্যানার্জীকে মুক্তিসুর্য ভাবলো এখানকার মানুষ। আমরাও ভেবেছিলাম,মমতা ব্যানার্জীর সাথে জোট করেছিলাম। স্বর্গত অটলজীর এক প্রবল স্নেহ কাজ করছিল মমতা ব্যানার্জীর প্রতি। কিন্তু বদলে গেলেন মমতা, বদল এলো পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু বদল হলো না পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য। বামপন্থীদের কালারড জেরক্স কপি হয়ে গেল মমতার দল ও সরকার। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বজনপোষন, অনুন্নয়ন, কুকথা, মিথ্যাচার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিলো।

১৯৪৬-৪৭ থেকে ২০২০—দীর্ঘ ৭৪ বছরের হিসাবে বসে বাঙালীর সামনে এক বিশাল শূণ্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। অব্যবস্থা, বেকারীত্ব, দুর্নীতি বাঙালীর মেরুদন্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছে।কাটমানি হয়েছে সকল কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আগে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বদমান ছিল—মায়ের সোনায় কাঁচি মারে। এবার দেখলাম—তৃণমুল নেতা মায়ের সরকারী অনুদানেও কাটমানি খেয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে নৈতিকতা কোথায় পৌঁছেচে দিদির রাজত্বে। প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—একা খেলে হবে? দিয়ে খেতে হবে। দোলা সেন বলছে—ভাগের টাকা পাঠাতে হবে। মিডিয়ার দৌলতে আজ এসব আর অজানা নয় কারুর।

তাই এবার বিজেপি। মাননীয় মোদীজীর যুগান্তকারী কর্মপদ্ধতি ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক উঁচু আসনের সাথে ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থে গড়ে তোলা প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে 'বিজেপিই আনবে বাংলার মুক্তি'। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কাছে পুণ্যভুমি—ভারতের নবজাগরণে রাজা রামমোহন থেকে শত শত চিন্তাবিদ,আধ্যাত্মিক ঋষি, লেখক, স্বাধীনতা সংগ্রামী,দার্শনিক বিজ্ঞানীর সাথে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মভুমি এই বাংলা। এই বাংলাকে এক আলোর জগতে পৌঁছে দেবার আগে আমরা থামবো না।

সামনে ২০২১ র বিধানসভার নির্বাচন। মোদীজীর প্রতিটি জনমুখী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মানুষের জন্য চালু করা, এটা আমাদের মুল লক্ষ্য। আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লক্ষ টাকার বিনা ব্যয়ের চিকিৎসার সুযোগ আমরা দরিদ্রের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবোই। নতুন কৃষি আইন প্রয়োগে প্রত্যেক চাষীকে ফড়ে রাজের খপ্পর থেকে উদ্ধার আমরা করবই।

কেন্দ্র সরকারের বিশেষ সাহায্যে শিল্পের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য। গ্রামীন বাংলায় পশুপালন,বনজ শিল্পের বিকাশে আমরা এগোবোই। গ্রামীন তাঁতকে বিশ্ববাজারে পৌঁছনোর জন্য যা করণীয় তাই করবো। নদী সাগর পুকুরের বাংলা মৎস্যশিল্পের বিকাশ—সাগরে মৎস্যবন্দর নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য থাকবেই। শিক্ষার ও চিকিৎসার আধুনিকীকরণ ও গুণগত মান বৃদ্ধিও আমাদের সংকল্প। সময় এসে গেছে। প্রস্তুত হোন সকলে। পশ্চিমবঙ্গ এগোচ্ছে সুর্যোদয়ের পথে। আপনিও সপরিবারে এই বিজয় যাত্রার সাথী হোন। কল্যানময়ী জগদম্বা মা দুর্গা আমাদের সকলের অশেষ কল্যাণ করুন।

**লেখক: রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি**

# আত্মনির্ভর ভারত

## সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তির জীবন থেকে শুরু করে একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র সবাই স্বনির্ভর হতে চায়। সব বাবা মা চায় ছেলে মেয়েরা আত্মনির্ভর হোক। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের কাজ নিজের বুদ্ধি দিয়ে, নিজের পরিশ্রম দিয়ে, নিজের নিষ্ঠা দিয়ে নিজের জীবন গঠন করে, জীবন যাপন করে, এই চেষ্টা করার নাম হল আত্মনির্ভরতা, এই স্বয়ং সম্পূর্ণতার নাম হল আত্মনির্ভরতা।

সব মানুষ চায় আত্মনির্ভরতা। আত্মনির্ভর মানুষ অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে না। অন্যের টাকায় যদি আপনার সংসার চলে তাহলে অন্যের নির্দেশ আপনাকে শুনতে হবে। কিন্তু আপনার সংসার যদি আপনার নিজের উপার্জনে চলে, তাহলে আপনি অন্যের উপর নির্ভর না করে, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিজের পারিবারিক জীবন নিজের সিদ্ধান্তে চালাতে পারেন। এর নাম হল আত্মনির্ভরতা। যেমন ব্যক্তি জীবনে আত্মনির্ভর হওয়া দরকার আছে, ঠিক সেরকমই রাষ্ট্রের জীবনেও আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন অন্যথায় রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম থাকে না। পাকিস্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। পাকিস্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্ভর করে চীন অথবা আমেরিকার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। কারণ পাকিস্তান চলে আমেরিকা-চীনের টাকায়। পাকিস্তানের কোনো সিদ্ধান্তের মর্যাদা নেই, কোনো সিদ্ধান্তের দাম নেই। ওদের বাজেটের অনেকটা আসে বিদেশ থেকে। সেইজন্য পাকিস্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার, নীতির কোনো দাম নেই। যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছা হবে ততক্ষণ পাকিস্তানে কোনো প্রকল্প রূপায়িত হবে না।

আত্মনির্ভরতা কিন্তু আমাদের ছিল। আত্মনির্ভর রাষ্ট্রে আমরা ছিলাম। আত্মনির্ভর রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের কোনো বিকল্প হয় না। ভারতবর্ষ চিরজীবন আত্মনির্ভর ছিল।

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Angus Maddison এর একটা বিখ্যাত গ্রন্থ "The World Economy, Historical Statistics" সেখানে উনি দেখাচ্ছেন, প্রথম শতাব্দী থেকে আঠারোশ শতাব্দী পর্যন্ত, তখন জিডিপি নির্ধারিত হতো না। কিন্তু উনি বিভিন্ন বিষয়, লোকসংখ্যা, লোকের জীবনের মান, উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই আঠারোশ সালে ভারতবর্ষে যা জিডিপি ছিল পৃথিবীর কোনো দেশ তার ধারে কাছে ছিল না। ১৭৫৭ সাল যেদিন ইংরেজের কাছে আমাদের ভরাডুবি হলো, যেদিন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো স্থায়ীভাবে, সেদিন থেকে ভারতবর্ষের উপর শোষণ শুরু হলো।

ভারতবর্ষের শিল্প, সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের ছোট ছোট কুটির শিল্প, ভারতবর্ষের কৃষি সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু হলো। এখান থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল নিজেদের দেশকে ধনী করলো। আজকে এই দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, গত সত্তর আশি বছর আমাদের চুরি করা সম্পদে এদের চলেছে। আমাদের এখান থেকে লুটে নিয়ে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করলে জানতে পারবেন ভারতবর্ষের থেকে গ্রেট ব্রিটেন কত টাকা লুণ্ঠন করেছে ২০০ বছরের শাসনে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কতো ট্রিলিয়ন ডলার লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সেই টাকায় তারা দীর্ঘদিন চালিয়েছে। আজকে যখন তাদের লুণ্ঠন শেষ হয়ে গেছে, আর কোথাও লোটার জায়গা নেই, তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। আজকে গ্রিসকে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশে দেশেযেতে হচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক ভাবে ধুঁকছে। আমেরিকা ভাবছে কিভাবে সামাল দেবে এই করোনা পরিস্থিতি। তারা ভাবছে কি করে ভেঙ্গে পরা অর্থনীতিকে সামাল দেবে, সেখানে ভারতবর্ষকে দেখুন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এই কঠিন পরিস্থিতিতেও ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে। যে টাকা উনি ঘোষণা করেছেন সেটা পৃথিবীর বহু দেশের সারা বছরের বাজেটের থেকেও বেশি। আমরা স্বনির্ভর ভারতের সম্পর্কে চর্চা করতে শুরু করেছি। স্বনির্ভরতার অনেক অর্থ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ভাবে তার অর্থ করেন। যার যেমন চিন্তন সে তেমন অর্থ করে। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর ছিল। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যে ভারতবর্ষ কে আবার স্বনির্ভর করতে হবে। আমাদের দেশ পুরোপুরি স্বনির্ভর ছিল, তার উদাহরণ আপনি দেখতে পাবেন কোন বড়ো গ্রামে গিয়ে। দেখুন ওখানে ব্রাহ্মণ পাড়া আছে, কায়স্থ পাড়া আছে, তাঁতি পাড়া আছে, চাষীপাড়া, কামার, কুমোর, নাপিত, জেলে, বৈদ্য সব পাড়া আছে। একটা গ্রামে যা যা প্রয়োজন, সবকিছু ওই গ্রামেই তৈরী করা হতো। গ্রাম স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই উৎপাদন হতো। সেইসময় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর ছিল কিন্তু তারা কখনও আত্মকেন্দ্রিক হবার কল্পনাও করেনি। গ্রামগুলি পরস্পরের সাথে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত ছিল। নিজেদের মধ্যে তারা পণ্য আদান প্রদান করত। একটা উদাহরণ দেখুন—সারা দেশে গরুরগাড়ী চাকার মাপ একই ছিল, কোনও ছোট-বড় ছিল না। তখন তো কোনও কেন্দ্রীয় কারখানা ছিল না, কি ভাবে সমস্ত দেশে চাকার মাপ এক রাখা সম্ভব হয়েছিল। আজকের পদ্ধতি হচ্ছে এক জায়গায় উৎপাদন হয়, গোটা ভারতবর্ষ তা ভোগ করে। একটা কারখানায় উৎপাদন হয় গোটা বিশ্ব তা ভোগ করে। অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছে। আগে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি ছিল না। আমাদের দেশ ছিল বিকেন্দ্রীত অর্থনীতির দেশ। আরবদের আক্রমণ যখন শুরু হলো, তখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করে নিলো। অনেক দেশ ইসলামের ঝড়কে সামলাতে পারেনি। কিন্তু ইসলামের অতো বড়ো তরী ভারতবর্ষে এসে ডুবে গেল কেন? তার মধ্যে প্রধান কারণ ছিল বিকেন্দ্রীত অর্থনীতি, স্বনির্ভর অর্থনীতি। সরকারের উপর নির্ভর করতো না, প্রজারা রাজার উপর নির্ভর করে চলতো না। প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বনির্ভর। নিজেদের জিনিস নিজেরা তৈরি করে নিত। নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতো।

ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আত্মনির্ভর গড়ার লক্ষ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল তৈরি করেছিলেন। উনি বহু শাস্ত্র ঘেটেছেন, আর শাস্ত্র ঘেঁটে উনি লিখেছেন 'The History of Hindu Chemistry'।

ওখানে উনি লিখেছেন, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা যে মানের ছিল, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা যে জায়গায় পৌঁছেছিল আজকে পৃথিবী সেই জায়গায়, সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। উদাহরণ দেখুন, আপনারা জানেন যে কুতুব মিনারের পাশে একটা লৌহ স্তম্ভ পনেরশো বছর ধরে রোদ, জল, ঝড়, বৃষ্টি, তুফান সব কিছু সহ্য করে দাঁড়িয়ে, আজকেও তার গায়ে এতটুকু মরচে পরে নি। এক বিন্দু মরচে সেই লোহার গায়ে পরেনি কিন্তু তখন কোন টেকনোলজি প্রয়োগ করা হতো? তখন কি টাটা ছিল? ভিলাই, দুর্গাপুর ছিল? কোন টেকনোলজি প্রয়োগ হতো যে পনেরশো বছর ধরে তাতে মরচে পরছে না। সেই লোহা তৈরি হতো ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে। আপনারা মাইকেল ফ্যারাডের নাম শুনেছেন, যিনি জেনারেটর আবিষ্কার করেছেন। মাইকেল ফ্যারাডে চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষে যে মানের লোহা, ইস্পাত তৈরি হয়, তেমন ইস্পাত তৈরী করার। সেই ইস্পাত আজকের বিজ্ঞান, আজকের পৃথিবীও আবিষ্কার করতে পারেনি। আত্মনির্ভরতার উদাহরণ দেখুন, গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কামারশালায় কি ধরনের টেকনোলজি প্রয়োগ করা হতো যে তাতে এতো উন্নত মানের লোহা তৈরি হতো। পৃথিবীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধারা চাইতেন ভারতবর্ষ থেকে তলোয়ার নিয়ে আসতে। যে তলোয়ারে মরচে পরে না, যে তলোয়ারে ধার দিতে হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেই সময়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী নাগার্জুন, সেই নাগার্জুনকে আমরা বলি ঋষি, বিজ্ঞানীদের আমরা ঋষি বলতাম। সেই নাগার্জুন বিজ্ঞানকে এমন জায়গায় পৌঁছেছিলেন যে অন্য বস্তুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারতেন। বিশেষ করে পারদকে। আপনারা জানেন কোনো বস্তুর অবস্থা নির্ভর করে তার ভিতরের ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাসের উপরে। ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাসের যদি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তাহলে বস্তুর পরিবর্তন হয়। নাগার্জুন দেখিয়েছেন যে সোনার মধ্যে যে ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাস আছে সেখানে মাত্র এক ভাগের তফাৎ আছে পারার মধ্যে। সুতরাং পারদ থেকে ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাসের পরিবর্তন করে সোনা তৈরি করা সহজ ছিল। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান এতই উন্নত ছিল। সেই বিজ্ঞানের ছোট ছোট

জায়গায় প্রয়োগ হতো। বৃহৎ জায়গায় নয়, গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট কুটিরে তার প্রয়োগ হতো। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়েছেন। আজকে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য উনি দিয়েছেন ২০ লক্ষ কোটি টাকা। উনি দশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন ঠ্যালাওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, যারা রাস্তায় সব্জি বিক্রি করে তাদের জন্য। তারা আত্মসম্মানের সাথে বাঁচবে। তাদের মহাজনের কাছে ধার নিতে হবে না। মহাজনের কাছে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না। তারা নিজের অর্থে নিজের ব্যবসাকে দাঁড় করাবে। স্বাভিমান বোধ জাগ্রত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নতুন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড়, পর্বত থেকে। আজকে আমাদের প্রিয় আরও একজন নরেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখুন ওই একইভাবে চাষীদের অনুদান দিচ্ছেন। তাকে আর আত্মহত্যা করতে হবে না। তার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন। আমাদের রাজ্য নিতে পারেনি সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য আহ্বান করেছেন। সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন, কামারশালা কে গিয়েছেন, ঠেলাওয়ালাকে দিয়েছেন। আগামী ভারত, নতুন ভারত, আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করবার জন্য দিয়েছেন। এই আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করার কথা আজকে নতুন নয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজকে বলছেন তা নয়, স্বামী বিবেকানন্দ আত্মনির্ভর ভারতের কথা, বহুবার বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তার জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন। ছাত্র জীবনে সাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। শক্তির অনুশীলন করার কথা বলেছেন। যে দুর্লভ গুণাবলী মানুষ ছাত্র জীবনে অর্জন করে তার মধ্যে অন্যতম হলো আত্মনির্ভরতা। আগের দিনে রাজার ছেলে ঋষির আশ্রমে আসতো আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য। তাকে সব করতে হতো। রাজার সন্তান হয়েও তাকে গো পালন থেকে শুরু করে, কৃষি কাজ, পরিচ্ছন্নতা সব কাজ শিখতে হতো। তাকে আত্মনির্ভরতার পাঠ দেওয়া হতো। এখানে থাকার সময় রাজপুত্র সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সাথে পরিচিত হত, সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধার কথা জানতে পারত, পরবর্তীকালে রাজা হলে সমাজের সেই দুর্বলতাগুলি দূর করার মত মানসিকতার নির্মাণ হত। প্রাচীন শাস্ত্রে একটা শ্লোক আছে,

'আগ্রতঃ চতুরো বেদাঃ
পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
ইদং শাস্ত্রং ইদং শস্ত্রং
শাপাদপি শরাদপি।'

আমার সামনে চারটে বেদ আছে, পিঠে তীর ভর্তি ধনুর্বানআছে। ইদম শাস্ত্রম ইদম শস্ত্রম অর্থাৎ এটা হলো শাস্ত্র আর ওটা হলো শস্ত্র বা অস্ত্র। তুমি যেভাবে চাও আমি তোমার সাথে মোকাবিলা করব। তুমি যদি যুক্তি তর্কে আমাদের সাথে বসতে চাও আমি যুক্তি তর্কে তার মোকাবিলা করব আর তুমি যদি লড়াই চাও, শস্ত্র চাও, অস্ত্র চাও তোমার সাথে আমি লড়াই করব। এ হলো সাবলম্বনের একটি আদর্শ উদাহরণ। সাবলম্বী মানুষ সব চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করতে পারে। চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করা কাকে বলে। আপনারা যারা তাস খেলেছেন তারা জানেন টোয়েনটি নাইন বলে একটা খেলা আছে। সেই খেলায় একজন ডাক দেয়, যার দম নেই সে বলে পাশ। আর যার দম আছে সে বলে আছি, আঠার ... আছি, উনিশ ... আছি, কুড়ি ... আছি। তুমি যেখানে বলবে আমি সেখানে আছি। সে জানে তার হাতে কি আছে। সে আত্মনির্ভর কিনা? ওই জন্য চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করে বলছে আছি। উত্তর দিচ্ছে আছি। ভারতবর্ষ গোটা বিশ্বে চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে বলেন নি।

প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন। উনি একবারও বলেন নি বয়কটের কথা। ১৯০৫ সালে আমরা বয়কট করেছিলাম, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং বিদেশি জিনিস বর্জনের কথা আমরা বলেছিলাম। কিন্তু নেওয়ার মতো সেরকম স্বদেশী জিনিস বাজারে তখন ছিল না। তার কারণ ইংরেজদের কুটিল চক্রান্তে আমাদের সমস্ত স্বদেশী উৎপাদন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের হাতে কোনো স্বদেশী দ্রব্য মানুষকে দেওয়ার মতো ছিলো না। সে সময় সমস্ত কিছু বিদেশ থেকে আনতে হতো। আর তার জন্য গান লেখা হয়েছিল ... 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীনদুখিনি মা যে তোদের তার বেশি তার সাধ্য নাই'... ঐ মোটা সুতোর সাথে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই, 'আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষে চাই'।

আজকে আর সেই পরিস্থিতি নেই। আপনারা করোনা পরিস্থিতিতেও দেখেছেন, আমরা কোন সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন 'প্রকৃতি, বিকৃতি আর সংস্কৃতির কথা। তার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। প্রকৃতি হলো যে নিজে রোজগার করে নিজে খায়। বেশিরভাগ মানুষ তাই করে, নিজে উপায় করে নিজে খায়। জীবজগতের সব প্রাণীও সেটাই করে, নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করে নেয়। আর বিকৃতি কোনটা? যে নিজে কিছু করে না অন্যের ছিনিয়ে নিয়ে খায়, অন্যের কেড়ে খায় এরই নাম বিকৃতি। অন্যদিকে সংস্কৃতি হল যে নিজের খাবার অন্যের সাথে ভাগ করে খায়। আমরা আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছি পৃথিবীর কাছে। প্রয়োজনীয় ক্লোরোকুইন আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই নিখরচায় ক্লোরোকুইন দিয়েছি, করোনা মোকাবিলা করার জন্য। আমাদের দেশে আগেকোনো পিপিই কিট তৈরি হতো না। কিন্তু স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতবর্ষে এখন পিপিই কিট তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। এটা হলো

স্বনির্ভরতার উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর তার জন্য উনি দরাজ হস্ত হয়েছেন। উনি থ্রেক্ষ মাধ্যমে তিন লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের, ছোট ছোট শিল্পপতিদের, ছোট ছোট শিল্পকে মজবুত করার কথা বলেছেন। যে শিল্পের মাধ্যমে দশ জন, বিশ জন যারা গ্রামের মজদুর, তারা ওখানে কাজ পাবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। যতক্ষণ না সাধারণ মানুষের কাছে পয়সা যাবে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না। একশ্রেণীর মানুষের হাতে পয়সা থাকবে আর এক শ্রেণী বঞ্চিত হবে, সেই ধরণের অর্থনীতি কখনও শক্তিশালী নয়, সেটা হলো দুর্বল অর্থনীতি। যখন সমস্ত মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছাবে তখনই শক্তিশালী অর্থনীতি হবে। বন্টন ব্যবস্থা ভালো হবে। আপনি খ াচ্ছেন, রোগা হয়ে যাচ্ছেন, আপনি খাচ্ছেন অথচ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তার মানে আপনার পেট নিতে পারছে না। হজম করতে পারছে না, সমস্ত শরীরকে শক্তি দিতে পারছে না। কিন্তু যখন খে য়ে আপনার ঠিকমতো হজম হবে, শরীর গ্রহণ করবে আর সমস্ত শরীরকে শক্তি সঞ্চারিত করবে, তখনই শরীর সবল হবে। ঠিক সেরকমই দেশের অর্থনীতি। যদি এক জায়গায় অর্থ জমে যায় তবে দেশ দুর্বল হবে। বন্টন ব্যবস্থা যদি সমান না হয়, সঠিক না হয়, যদি নির্দিষ্ট লোকের কাছে সহায়তা না পৌঁছায় তাহলে অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যায়, দেশ দুর্বল হয়।

আমরা জানি চানক্যের নাম। উনি অর্থনীতি সম্পর্কে, শ্রমজীবী মানুষের সম্পর্কে অসাধারণ কথা বলেছিলেন। ''যতো মানুষ ততো শ্রম, যত শ্রম ততই শ্রী, তত বৈভব।'' আমাদের যদি বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হয় তবে আমাদের যে জনশক্তি আছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের বিশাল জনশক্তি আছে। আমাদের যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে তা দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। অনেকে বলেন আমরা যদি বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই তবে কিভাবে বাঁচব? প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন, আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার কথা বলেননি। আত্মনির্ভরতা মানে আত্মকেন্দ্রিকতা নয়। আত্মবিশ্বাস মানে অহংকার নয়। আমি 'পারি' এটা আমার আত্মবিশ্বাস, আমি 'তোমার থেকে ভালো পারি' এটা আমার অহংকার। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন ভারতবর্ষে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছিলেন, মানুষ শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়েছে হাজার সমালোচনা উপেক্ষা করে। আমাদের বিরোধীরা কম ঠাট্টা তামাশা করেনি। ঘণ্টা বাজানো হবে, তাতে ঘণ্টা হবে। সেই বিরোধীদের মোক্ষম জবাব দিয়েছে ভারতবর্ষের জনতা, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে বিকাল পাঁচটায় তুমুল শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি করে।

ঐ দিন পাঁচটায় আমরা দেখেছি আমাদের চারপাশে যেন গোটা সমাজ গর্জন করছে। সমস্ত বাড়ীর ছাদে ছাদে শিশু, বালক, কিশোর, মহিলা, পুরুষ সবাই মিলে ঘণ্টা ধ্বনি করছে, শঙ্খ ধ্বনি করছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে। সেদিন ভারতের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী মানুষের বাড়ীতে দ্বীপ জ্বলে উঠেছিল, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অজ্ঞ, শহর, গ্রাম, বনবাসী সবাই এক হয়েছিল এক নরেন্দ্রের আহ্বানে। আজকে জনতা জানিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আমি তোমার সাথে আছি। যেদিন প্রধানমন্ত্রী জানালেন সন্ধ্যাবেলায় দ্বীপ জ্বালানোর জন্য, অনেক ঠাট্টা তামাশা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সারা দিয়েছেন কোটি কোটি জনতা। আজকেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে কাজ, প্রকল্প আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে প্রমাণ হয় মাটির সাথে কত নিবিড় যোগাযোগ থাকলে উজ্জ্বলা, জনধন,প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সহায়তা রাশি, স্বচ্ছ ভারতের মত প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। এ হল সাধারণ মানুষের কষ্টের অনুভব। এ হলো বিশ্বাসযোগ্যতা। আর সেজন্য প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন স্বনির্ভর ভারতের। স্বচ্ছ ভারতের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আহ্বান জানিয়ে বসে থাকেননি। আহ্বান জানিয়ে উনি কর্তব্য করেছিলেন, মায়েদের অসম্মান যাতে দূর হয়, মায়েরা যাতে সম্মান নিয়ে বাড়িতে থাকতে পারে তার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশনে প্রতিটি বাড়িতে টয়লেট তৈরি করে দিয়েছিলেন। কোটি কোটি বাড়িতে মায়েদের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন উনি। এই প্রধানমন্ত্রীর আগে কেউ এভাবে মায়েদের সম্মানের কথা ভাবেন নি?

আমি অন্য কারুর সমালোচনা করছি না, কিন্তু যদি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না হয়ে অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে এই করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ব্যবস্থা হত এত সহজে?

আমরা যে প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বাস করেছিলাম সেই বিশ্বাসের দাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, আহ্বান জানিয়েছেন স্বনির্ভর ভারতের। উনি বলেছেন 'Vocal for Local' উনি বলেছেন স্থানীয় জিনিস ক্রয় করো, শুধু কেনা নয় প্রচার করো। উনি বলেছিলেন, তুমি যদি বছরে একটা খাদির পোশাক কেনো তাহলে খাদি শিল্প দাঁড়িয়ে যাবে। যারা বুনকর আছে, তাঁতি আছে তারা বেঁচে যাবে। তাদের দ্রব্য বিক্রি হবে, তাদের উৎপাদন দাম পাবে, মর্যাদা পাবে। আজকে দেখুন ওই শিল্প কোথায় চলে গেছে, কোথায় পৌঁছে গেছে। আজকে মানুষ খাদির পোশাক পরছে এবং খাদির পোশাক পরাটাকে সম্মানজনক মনে করছে। বিদেশি পোশাক নয়, খাদির পোশাক পরা সম্মানজনক মনে করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন দরিদ্র কে সেবা করিয়া, উপবাসিকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব নহে। যতক্ষণ না তুমি ওর মনের দরিদ্রতা দূর করার উপায় বলে দিচ্ছো, স্থায়ীভাবে দরিদ্র দূর করার প্রকল্প তাকে দিচ্ছ, স্থায়ীভাবে তার মনেআশার সঞ্চার না করছো, যতক্ষণ না তার মনে স্থায়ী স্বাভিমানের সৃষ্টি করছো ততক্ষণ তার দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে না। স্বাভিমান ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ হয় না।

**লেখক: যুগ্ম সাধারণ সম্পক (সংগঠন), পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি**

# নতুন শিক্ষা নীতি: একটি সদর্থক পরিকল্পনা

## অমিতাভ চক্রবর্তী

বদলে যাচ্ছে পড়াশোনার রকমসকম। বদলাচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি। কেরানি তৈরি করা নয়, দেওয়া হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষায় গুরুত্ব। গুরুত্ব বিজ্ঞান বোধে। জিডিপির ৬ু হবে শিক্ষাখাতে খরচ যা কিনা বর্তমানে ১.৫% থেকে ২% এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের নাম বদলে হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রক।

প্রাথমিক শুধু নয়, ১৮ বছর পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব।

ক্লাস ৩, ৫, ৮ এ স্কুলের পরীক্ষা। ১০, ১২ বোর্ডের পরীক্ষা। সেমিস্টার থাকছে গোটা আস্টেক। গোটা চব্বিশ সাবজেক্টে বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা, রেজাল্টের ধরণ সব পালটে যাবে জ্জ

১০+২ সিস্টেম উঠে যাচ্ছে। বদলে স্কুল শিক্ষাটা হবে, ৫ (একদম প্রাথমিক শিক্ষা) + ৩ (গ্রেড ৩-৫) + ৩ (গ্রেড ৬-৮) + ৪ (গ্রেড ৯-১২) সিস্টেমে।

অর্থাৎ ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বেসিক এডুকেশন চলতে থাকবে। ক্লাস ৬ থেকে ৮ সাবজেক্টিভ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর ক্লাস ৯ থেকে ১২ উচ্চ শিক্ষার বুনিয়াদি শিক্ষা। ক্লাস ১২-এ ,আলাদা কোনও স্ট্রিম থাকছে না। সায়ান্স পড়লেই আর্টসের সাবজেক্ট নিতে পারবেনা, সে ব্যাপারটা পাল্টাচ্চে। সায়ান্স-আর্টস- কমার্স এর বিভাজন কমছে। আলাদা করে সায়ান্স, আর্টস, কমার্স থাকছে না। কেউ ফিজিক্স নিয়ে পড়ার সাথে সাথে ফ্যাশন টেকনোলজি নিয়েও পড়তে পারে।

ক্লাস ৬ থেকেই ভোকেশনাল ট্রেনিং। এমনকি ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থাও থাকবে। ধরা যাক, কেউ ইলেক্ট্রিকের কাজ শিখতে চায়। সে ক্লাস সিক্স থেকেই শিখতে পারে।

ই-লার্নিংয়ে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। এবং তাতে শুধু ইংরাজী নয় বরং আপাতত ৮টি ভারতীয় ভাষায় অনলাইনে পড়াশোনা করা যাবে। সেরকম স্টাডি মেটেরিয়াল থেকে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যুক্তি বোধ বিকাশের জন্য ও ভবিষতের নিশ্চয়তার জন্য কম্পিউটার কোডিং শেখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ক্লাস ৬ থেকে। বিজ্ঞানবোধকে বাড়ানোর জন্যও বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে।

ক্লাস ৫ পর্যন্ত মাতৃভাষা শেখা মাস্ট। এরপর তা ঐচ্ছিক। ৩ ভাষার ফর্মুলা থাকছে। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং এর সাথে আরেকটা কোনও ভাষা হবে। সেক্ষেত্রে সারা দেশ তথা দক্ষিণ ভারতের জন্য হিন্দি, সংস্কৃত এবং উত্তর ভারতের জন্য সংস্কৃত অথবা দক্ষিণ ভারতীয় কোনও ভাষার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে পরিকল্পনা নেওয়ার কথা চলছে।

পরীক্ষার রেজাল্ট আগে যেরকম হতো, তাতেও বদল আসছে। মুখস্ত করে উগরিয়ে দিয়ে নম্বর তোলার ফান্ডা পাল্টাচ্চে। ছাত্রের দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ৩/৪ বছর পর্যন্ত অনার্স করা যাবে। এরপর ১/২ বছর পোস্ট গ্রাজুয়েশন এর স্তর বিভাজন করা হচ্ছে। বিশ্বের সেরা ১০০টা ইউনিভার্সিটির এদেশে ক্যাম্পাস খুলতে পারার ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে এম-ফিল উঠে গেল। ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তির একটাই কমন এন্ট্রান্স টেস্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় এন্টি বা এক্সিটে অনেক অপশন থাকছে। যেমন, ৩-৪ বছরের গ্রাজুয়েশন। কেউ মনে করলেন, ১ বছর পর আর পড়বেন না। তাহলে তাঁকে ওই ১ বছরেরই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। ২ বছর হলে অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা। ব্যাচেলর ডিগ্রি ৩ বছরে। আর ৪ বছর পুরো কমপ্লিট করলে, ব্যাচেলর উইথ রিসার্চ। আগে এক বা দু বছর পর গ্রাজুয়েশন ছেড়ে বেরোলে কিস্যু হতো না। টুয়েলভ পাশ হয়েই থাকতে হতো।

এককথায় এবারের শিক্ষানীতি ভারতকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে লড়াইয়ে টেক্কা দেওয়ার মত করেই বানানো হয়েছে।

**লেখক: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি**

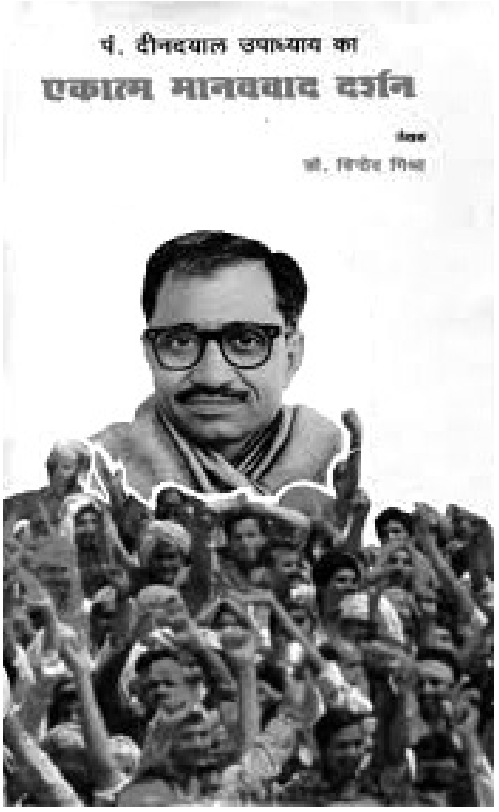


# “একাত্ম মানব দর্শন”-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ একটি উপস্থাপনা

সুব্রত ভৌমিক

একটি প্রশ্নই আমার আজকের লেখার মূল প্রতিপাদ্য। সেটি হল- বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে কেন কমিউনিজমের অনুগামী হয়েছিলেন? শুধুই কি মার্কস, এঙ্গেলসের বিশুদ্ধ কমিউনিজম তত্ত্ব পড়ে। নাকি সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে রাশিয়া ও চীনের মতো দুটি বৃহৎ দেশে পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তে যে নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা প্রাথমিকভাবে তাঁদের জনকল্যাণকর মনে হওয়ায়—তাঁরা কমিউনিজমের অনুগামী হয়েছিলেন। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায়, কোনও সূক্ষ্ম উচ্চকোটির তত্ত্ব বা দর্শনের ফলিত প্রয়োগের ফলে সার্বিকভাবে কোনও পরিবর্তন সমাজে সংঘটিত হলে তবেই মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হন।

একইভাবে একাত্ম মানব দর্শনের ফলিত প্রয়োগের ফলে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারত সুখী ও পরম বৈভবশালী হলেই বৃহত্তর সমাজ তার অনুগামী হবে। আর তখনই পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানব দর্শন প্রকৃত রূপে সমাজের সবার ভাবনা হয়ে উঠবে। বর্তমান সরকার অনেক ইতিবাচক নতুন নীতি ঘোষণা ও তা প্রণয়নের কাজ করলেও বিরোধী অপপ্রচারে অনেক বিষয় ই মানুষের সামনে সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে দেশের মানুষ সহজে বুঝে উঠতেই পারছে না যে, এতদিন ধরে দেশে চলে আসা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি, মিশ্র অর্থনীতি, তারপর বাজার অর্থনীতি ও ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা

অনুযায়ী যে ব্যবস্থা চলে আসছিল তার পরিবর্তে "একাত্ম মানব দর্শন" অনুযায়ী দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠা উচিত এবং সরকার সেই অনুযায়ী এই নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ফলে এই সিদ্ধান্তগুলিকে জনগণ একান্তভাবেই সরকার বা কিছু বিশেষজ্ঞের মস্তিষ্কপ্রসূত বলে মনে করছেন। এগুলো যে আনুপূর্বিক ভাবে "একাত্ম মানব" দর্শনের ফলিত প্রয়োগ তা তারা জানতে ও বুঝতে পারছেন না।

একাত্ম মানব দর্শনের অনুসারী কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত আজকের রাষ্ট্র পরিচালনায় একান্তই প্রয়োজন যা অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখের চেষ্টা করছি—

## শিক্ষা

আজ ভারতে সরকারি মিড ডে মিল স্কুল, সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মিশনারি পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বেসরকারি ব্যয়বহুল পাবলিক স্কুল, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা ইত্যাদি রয়েছে। এই খিচুড়ি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মন 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' হয়ে উঠতে পারবেনা তা বলাই বাহুল্য। সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা কালো ভারতীয়দের যে চোখে দেখত, ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়াম ও পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করা অধিকাংশ ব্যক্তিরা সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করাদেরও একই চোখে দেখবেন। এ ধরনের ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে একাত্মতার পরিবর্তে বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

এছাড়া, শিক্ষা খাতে বিপুল সরকারি ব্যয়ের পাশাপাশি একজন অতি গরিব অভিভাবককেও তার সন্তানের জন্য ন্যূনতম দুই বা তিন গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা করতে হয়। জয়েন্ট, ক্যাটে সাফল্যও বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ প্রাইভেট কোচিং-এর উপর নির্ভরশীল। মেধাবী গরীব ছাত্ররা সে সুযোগ পায়না বলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এটা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও বর্তমান সময়েও গুরুকুল ব্যবস্থার উপযোগিতার ইঙ্গিত দেয় কারণ, কোচিং সেন্টার তো আসলে প্রাচীন গুরুকুলের বর্তমান পরিবর্তিত রূপ।

শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি বা বৈশ্য সমাজের হাতে দেওয়া একাত্ম মানব দর্শনের পরিপন্থী।

সব কিছু বিচার করে সারা দেশে একই পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একই ধরনের সরকারি আবাসিক বিদ্যালয় (ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পৃথক) ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত যেখানে উচ্চবর্ণ- নিম্নবর্ণ, উচ্চবিত্ত - মধ্যবিত্ত - নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত - অশিক্ষিত পরিবারের সন্তান একসাথে পড়বে ও খেলবে। ফলে ছোট থেকেই তারা একসাথে চলা, এক কথা বলা ও মনকে একভাবে গড়ে তোলার শিক্ষা পাবে।

বি পি এল শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি "না লাভ না ক্ষতির" ভিত্তিতে সরকারি বিদ্যালয়ে অন্যদের থেকে অর্থ নেওয়া যেতে পারে। জনগণ সানন্দে এতে সম্মত হবেন কারণ, এক্ষেত্রে গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট কোচিং-এর জন্য তাদের আর কোনও খরচ করতে হবে না।

নতুন শিক্ষা নীতি (NEP-020) তে বর্তমান সরকারের তেমনই পরিকল্পনা ধরা পড়েছে। এখানে একদিকে যেমন অভিন্ন বোর্ড, অভিন্ন পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি সরকারী উদ্যোগে জেলায় জেলায় নবোদয় বিদ্যালয়ের মত আবাসিক বিদালয় ও গুরুকুল খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

## ভাষা নীতি

স্বাধীনতার এত বছর পরেও আর্য - দ্রাবিড়, হিন্দি - আঞ্চলিক ভাষার রেষারেষিতে পড়ে আমরা এখনো ইংরেজিকে আরাধ্য মনে করি। আর এখানেই প্রস্তাবনা হল—মাতৃভাষায় শিক্ষার পাশাপাশি নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত হিন্দিভাষীরা একটি দক্ষিণী ভাষা শিখবেন এবং সমস্ত অহিন্দিভাষীরা হিন্দি শিখবেন—এমন ভাষানীতির ফলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। ইংরেজি সমেত অন্য যে কোনও বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য সার্টিফিকেট কোর্স থাকতে পারে।

## স্বাস্থ্য

১৩৫ কোটির দেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অপ্রতুল। শুধু স্বাস্থ্য বীমা এর সমাধান হতে পারে না। কারণ, বিমার রকমারি শর্ত এবং সমস্ত রোগ বিমার অন্তর্ভূক্ত নয়। অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে থেকে মুড়ি - মুড়কির মতো দামী ওষুধ খেতে হলে বিমার কোনও সুবিধাই মেলে না।

স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারি বা বৈশ্য সমাজের হাতে দেওয়া "একাত্ম মানব দর্শনের" পরিপন্থী।

তাই বি পি এল তালিকাভুক্তদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি "না লাভ না ক্ষতি" বা ন্যূনতম লাভে সকলের জন্য সরকারি হাসপাতাল - এর সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বৈকল্পিক সমাধান।

সরকারের উচিত নবরত্ন প্রতিষ্ঠানের মতো একটি সরকারি ওষুধ কোম্পানি (পি এস ইউ) তৈরির উদ্যোগ নেওয়া। ৭৬ শতাংশ শেয়ার সরকারের হাতে রেখে ২৪ শতাংশ দেশের নাগরিকদের মধ্যে বন্টন করা হলে মূলধনের অভাব হবে না।

রাসায়নিক নির্ভর অ্যালোপ্যাথি ওষুধের (যা তৈরির সময় ব্যাপক দূষণ ছড়ায়) উপর অত্যধিক নির্ভরতা কমিয়ে প্রত্যেক জেলায় একটি করে ভেষজ উপাদান ভিত্তিক (আয়ুর্বেদিক) ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাতে জেলাবাসীর যে কোনও সাধারণ রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধের চাহিদা পূরণ হয়। সমস্ত এক ফসলী জমিতে বিকল্প চাষ রূপে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ ও পালনের ব্যবস্থা

করতে হবে।

মেডিকেল পঠন-পাঠনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে "ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ" মেডিকেল কোর্স চালু করতে হবে যাতে ভবিষ্যতের চিকিৎসকরা রোগ এবং রোগীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা বুঝে আয়ুর্বেদিক, অ্যালোপ্যাথিক বা হোমিও ওষুধের

কোনটি ব্যবহার করে ন্যূনতম ব্যয়ে সব থেকে বেশি কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় সে ব্যাপারে পারদর্শী হন। এতে একদিকে যেমন ওষুধের গুণমান, সর্বোচ্চ মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকবে অন্যদিকে বুঝে বা না বুঝে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ব্যবস্থাপত্রে লেখা অবাঞ্ছিত ওষুধ বা প্যাথলজি টেস্ট-এর চাপে রোগী বা রোগীর পরিবারের নাভিশ্বাস উঠবে না।

সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য ইতিমধ্যেই তেমন ববস্থা নেওয়া হচ্ছে। 'প্রধানমন্ত্রী জনওষধি যোজনা' একদিকে যেমন কিছুটা হলেও জেনেরিক মেডিসিন নিয়ে জনসচেতনতা ঘটাতে সাহায্য করছে তেমনি আয়ুশ আমাদের দেশীয় চিকিৎসার ভালো দিকগুলো তুলে ধরছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই যোগ থেকে আয়ুর্বেদ বিশ্বে আবার মূল চিকিতার ধারায় জায়গা করে নিচ্ছে।

## প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সুন্দরভাবে তাঁর, 'ইন্ডিয়া বিফোর এন্ড আফটার মিউটিনি' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দেশীয় করদ রাজ্যের পঞ্চায়েত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সির ছোটলাট ও সিভিল সারভেন্ট নির্ভর কালেক্টর ব্যবস্থা থেকে কোনও অংশে কম ছিল না। অথচ আমরা স্থানীয় সরকারের (ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ও পৌরসভা) পাশাপাশি বিপুল সরকারি ব্যয়ে অযৌক্তিকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র বজায় রেখেছি। কার্যত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই শেষ কথা বলেন এবং আমলারা ঠুঁটো জগন্নাথ।

আগে, পঞ্চায়েতের সালিশির মাধ্যমেই বহু বিবাদের নিষ্পত্তি হতো। সেখানে আজ কয়েক হাজার ব্রিটিশ আইন, কথায় কথায় মামলা আর কয়েক পুরুষ কেটে যায় মামলার নিষ্পত্তি হয় না। লক্ষ লক্ষ মামলা জমে রয়েছে। বিপুল ব্যয়ে শত শত বিচারপতি নিয়োগ ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা ভারতের ক্ষেত্রে বিলাসিতা। ভারতের কয়েকটি জেলার সমান লোকসংখ্যা ও সমসত্ত্ব সমাজ বিশিষ্ট ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা যে ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যা, জটিল ও অসমসত্ত্ব সামাজিক অবস্থা বিশিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে একান্তই অচল এটা তারই প্রমাণ।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা; তাদের উপযুক্ত প্রশাসনিক ও সালিশীর প্রশিক্ষণ; তাঁদের একাধারে দুই অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক হিসাবে গণ্য করা যাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্রে তাঁরা এখনকার মতো আধিকারিকদের উপর সমস্ত দোষ চাপাতে না পারেন এবং এর জন্য তাঁদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া; সালিশি ক্যামেরার সামনে করা যাতে রাজনৈতিক গা জোয়ারি না চলে—এই ব্যবস্থা চালু করে ধীরে ধীরে আমলাতন্ত্র তুলে দেওয়া। একদম উচ্চস্তরে কিছু রাখা যেতে পারে।

এরকম এক বিকল্প ও আমূল পরিবর্তিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যদি কমপক্ষে দুটি প্রজন্ম গড়ে ওঠে তবে নিশ্চিত যে তাঁরা এই ব্যবস্থা এবং তা যে দর্শনের ফলিত প্রয়োগ অর্থাৎ "একাত্ম মানব" দর্শনকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে। এবং এই চিন্তাধারার এক পরম্পরা ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে। আগামী দিনের রাজনীতিও এই দর্শনের ভিত্তিতে হবে। সরকার পরিবর্তন হলেও মূল ভাবনা বা তত্ত্বের কোনও পরিবর্তন হবে না। পরবর্তী প্রজন্ম এই দর্শনের ভিত্তিতেই যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই পরিমার্জিত ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। তবেই শুধু ওপর ওপর রাজনৈতিক পরিবর্তন না হয়ে জনমানসের স্থায়ী পরিবর্তন হবে এবং "একাত্ম মানব" দর্শনও মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থায়ী আসন পাবে। এবং এই পথে চলে ভারত যদি অদূর ভবিষ্যতে বৈভব ও শান্তির শীর্ষে পৌঁছাতে পারে তবে নিশ্চিত যে বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের কবরের ওপর মৃতসঞ্জীবনী রূপে "একাত্ম মানব" দর্শন বিকশিত হবে।

**(লেখক- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অর্থনীতির বিশ্লেষক ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট)**

# সঙ্ঘ বিচার পরিবার ও ভারতীয় পরম্পরা

## মৃণাল কাঞ্জিলাল

ডাঃ কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার। আর দশটা মানুষের মতই জন্ম। কিন্তু এক অসামান্য চিন্তাশক্তিতে আজ বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠনের জন্মদাতা হিসাবে তাঁকে পরিচিত করে। আজ অলক্ষ্যে থেকে তিনিই যে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছেন তা বলাটা বোধহয় একেবারে অত্যুক্তি হবে না। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক হিসাবে চিহ্নিত জ্যাঁক রুশোকে বলা হলেও তিনি যেমন বিপ্লবের ১১ বছর আগে মারা গেছিলেন, তেমনিই কথা ডাক্তারজীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক আগেই ডাক্তারজী আমাদের ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তনের পথ ধরে ভারত আজ এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সুচনা করেছে। ইনিই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আদ্য সরসঙ্ঘচালক পরম পুজনীয় ডাক্তারজী।

ডাঃ জী এক বহুমুখী কর্মযজ্ঞের সুচনা করেছিলেন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের বিজয়দশমীর দিন কয়েকটি বালককে নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল —এক সম্পন্ন, সমৃদ্ধ ভারত গঠন। প্রায় হাজার বছর বিদেশীর অত্যাচারে দীর্ণ, মুমুর্ষ ভারতের পুনরুত্থান ডাক্তারজীর সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেদিন ডাক্তারজীর লক্ষ্যের কথা জেনে অনেক মানুষ তাঁকে পাগল বলতো। সব জানা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অবিচল।

ডাক্তারজীর এই অনুভুতি একদিনে হয় নি। বা দৈববাণীর মত তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি। দীর্ঘ পঠন পাঠন, বিবিধ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বিশেষকরে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা তাঁর মধ্যে এক সুশৃঙখল অনুশাসিত ভারতীয় জাতি গঠনের প্রেরণা শক্তি দান করে আর যার ভিত্তিভুমি হবে হিন্দুত্ব। ডাক্তারজী অনুভব করেন—হিন্দুত্ব সেই মহান মহান সংস্কৃতি এবং পরম্পরা যা কেবলই কোন ভুখন্ডে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা কেবলই এই পৃথিবীরই নয়, যা সমগ্র জগতের কল্যাণে নিজেকে সমর্পন করেছে। তাই তিনি উপলব্ধি করেন যদি এই বিশ্বের কল্যান আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে হিন্দুত্বকেই ধরে আমাদের এগোতে হবে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পুরণে আদর্শের বাস্তবায়নে এক শক্তিশালী সম্পন্ন ভারতের একান্ত প্রয়োজন।

ডাক্তারজীর অনলস পরিশ্রম, তাঁকে আমাদের মধ্যে বেশীদিন থাকতে দেয় নি। ক্ষণজন্মা পুরুষ এদের এইজন্যই বলে। ডাক্তারজীর এই চিন্তাসকলকে ভাষায় ও আকারে রূপ দিতে থাকেন আর এক মহান সাধক, মহান চিন্তাবিদ, দার্শনিক পরম পুজনীয় গুরুজী—মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর। সংঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক।

শক্তিশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে শ্রী গুরুজী, সংঘ প্রচারক ও স্বয়ং সেবকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবধারার অনুসারী সংগঠন গড়ে তোলার কাজ করতে। একের পর এক সংগঠন গড়ে উঠল ভারতে—এই সংগঠনগুলিকেই আমরা বলি সংঘ বিচার পরিবার।

সঙ্ঘ বিচার পরিবার যে দর্শনে বিশ্বাস করে তার মুল আকর গ্রন্থ শ্রী গুরুজী লিখিত গ্রন্থ 'চিন্তা চয়ন' ইংরাজীতে 'Bunch of thoughts'। শ্রী গীতার অভ্যাস যোগ (ষষ্ঠ অধ্যায়) অভ্যাসের দ্বারা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথ দেখায়। গুরুজী এই অভ্যাস যোগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে ডাক্তারজীর জীবনের এক সাধারণ অভ্যাসের প্রসঙ্গ আনেন। 'স্বভাবো দুরতিক্রমঃ'—গোদা বাংলায়, "স্বভাব যায় না ম'লে"। স্বভাব পাল্টায় না—এটাই স্বাভাবিক মত। ডাক্তারজী স্বভাবগভাবে রাগী ও তেজস্বী জ্বালাময়ী বক্তা ছিলেন, কিন্তু সংঘ স্থাপনার পর কেউ কখনও তাঁর মুখে কড়া কথা শোনেন নি, কেউ তাঁকে রেগে উঠতে দেখেন নি। শ্রী গুরুজী এই উদাহরণের মাধ্যমে যে মানসিক বিপ্লবের চাক্ষুষ প্রমাণ দিলেন তা সংঘ বিচার দর্শনের এক স্তম্ভস্বরূপ। তাই সঙ্ঘ বিচার ধারায় সংস্কার আর সংস্কারিত কার্যকর্তার মুল্য সর্বোচ্চ। সেই জন্যই বলা হয়, অস্ত্র সংস্কারিত ব্যক্তির হাতে না দিয়ে শুধুমাত্র বলবানের হাতে দিলে তা জনকল্যানের পরিবর্তে জনগণের বিপদের কারণই হয়ে দাঁড়ায়।

চিন্তাচয়নে শ্রী গুরুজীর লিখিত এক অধ্যায়ের শিরোনাম 'একটি মানসিক বিপ্লবের জন্য'। কথাটির মধ্যেই সমস্ত সংঘ বিচার দর্শনের লক্ষ্যকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি থেকে এই মহাবিশ্ব একইসুতোয় বাঁধা, এক জায়গায় ধাক্কা লাগলে সমগ্র বিশ্ব কেঁপে ওঠে। মনে করায় মহাত্মা কবীরের দোঁহা—'মরা চামড়ার

নিঃশ্বাসে লোহা গলে যায়, / দুঃখীর দুঃখে ঈশ্বরের আসন টলে যায়'। এই বিশ্বের প্রতি বিষয়ের সাথে প্রত্যেকের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক যা পৌঁছে দেয় আধ্যাত্মিকতার চরম প্রান্তে—'ঈশ্বরঃ সর্বভুতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি' ( ৬১/ ১৮ অধ্যায়)—হে অর্জুন, ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বাস করে, যা ভারতীয় জীবনবোধ,মুল্যবোধ, সংস্কৃতি পরম্পরার মুল কথা—সেটাই সংঘ বিচার দর্শনের আধার বা ভিত্তিভুমি।

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষনে জন্ম নিলো 'একাত্ম মানববাদ'। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত শোষিত মানুষের মুক্তির পথ খুলে গেল। দানবীয় ক্যাপিটালিজম নয়, পাশবিক কমিউনিজম নয়, মানবের অনন্ত প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রয়োজন সনাতনী ভারতীয় পরম্পরার আধারে গঠিত একাত্মমানববা। যে দেখায় 'অখন্ড মন্ডলাকারে সজ্জিত পরমপদ'। এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থানের অর্থ একচেটিয়া লুণ্ঠনের অধিকার নয়— যা আমরা দেখে চলেছি। একাত্মমানববাদ এই পার্থিব জগতকে নির্ভয় দিয়ে বলে—ভারতীয় সংস্কারে আধারিত এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্ম হয় কেবলই বিশ্ব মানবকেপশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করতে। রাষ্ট্র শোষনের যন্ত্র হতে পারে না, রাষ্ট্র হবে পোষনকারী। শুধু মানুষই নয়, সকল প্রাণী অপ্রাণীর পুর্ণ সুরক্ষা ও বিকাশের দায় রাষ্ট্রের। তাই শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবী নিজেকে বললেন—'আমিই রাষ্ট্র'। মা যেমন তাঁর সকল সন্তানের কল্যানের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রের ভুমিকাও অনুরূপ। আজ বিজেপি এই দৈবী পথ অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছে বিজয়ীর বেশে।

ঠিক একই প্রেরণা থেকে ১৯৬৪তে তৈরী হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শ্রী গুরুজী, মাষ্টার তারা সিং, স্বামী চিন্ময়ানন্দ প্রমুখ ধর্মাচার্য্যদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হলো, ভারতীয় সনাতনী পরম্পরা কৃষ্টি সংস্কৃতি, যা মুলত হিন্দু সংস্কৃতি বলেই পরিচিত, সেই সংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক হিসাবে পরিচিত হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ও সমাজ সচেতন করার জন্য পরিষদ কাজ করবে। বিশ্বের সকল হিন্দুকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। হয়ে উঠবে সমস্ত হিন্দু ও হিন্দু সংগঠনের সাধারণ মঞ্চ। পরবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজের কাজ নানাভাবে পল্লবিত ও বিস্তার হওয়ায় হিন্দু মুন্নানি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ প্রভৃতি তৈরী হয়।

মাননীয় দত্তপন্থ ঠেংরিজীর হাতে ভারতীয় মজদুর সংঘের সুচনার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবি কৃষিজীবি মানুষের কাছে পৌঁছতে থাকল সেই মহান ভারতীয় পরম্পরার কথা, যে শুধুই কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠির সুখেই সন্তুষ্ট নয়, শ্রমজীবি মানুষের কর্মের দ্বারা শুধু ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নয়, পরমাত্মা স্বরূপ এই মহাবিশ্ব সেবিত - পুজিত হয়।

ভারতীয় মুল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, কলাকুশলী শিল্পীদের মধ্যে সংস্কার ভারতী, সহিলাদের মধে রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি, আরোগ্য ভারতী, ধর্মজাগরণ সমিতি, বনবাসী কল্যান আশ্রম এর মত অজস্র সংগঠন সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। বন্যা, ভুমিকম্প, যুদ্ধ ইত্যাদি আপতকালীন পরিস্থিতিতেও ওই একই বিচার ধারার উপর তৈরী হয়েছে নানান সংগঠন।

সংঘ বিচার পরিবার এবং ভারতীয় পরম্পরাকে অনুভব করা আবশ্যক। বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন। জনসাধারণের সামনে তাদের সবথেকে বেশী যেতে হয়। অনেকেই বোঝেন না কেন বিজেপিকে অন্যদের থেকে আলাদা বলা হয়। কংগ্রেস বা বামপন্থীদের সাথে চরিত্রগত পার্থক্যের সাথে সাংগঠনিক চরিত্র বিজেপির সম্পুর্ণ পৃথক তা বোঝার অভাবে কখনও হতাশা তৈরী হচ্ছে। বিজেপির কেন ছাত্র সংগঠন নেই বা কিছুদিন আগে ছাত্র সমাজের সমস্যা নিয়ে মাঃ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ কেনই বা বললেন—'ছাত্ররা নিজেদের সমস্যার মোকাবিলা নিজেরা করুক, যদি আমাদের সাহায্য চায় নিশ্চয় করবো, কিন্তু আগ বাড়িয়ে বিজেপি মাথা গলাবে না'—বললেন তা বুঝতেই পারবো না। অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বলেন—সঙ্ঘ কিছু করছে না। তারা বোঝেন না যে সুনাগরিক নির্মাণ ছাড়া সংঘ কিছুই করে না। হ্যাঁ রাষ্ট্র বা সমাজ কোন পথে চলতে পারে সংঘ তার আভাস দিতে পারে। এমনকি, রাষ্ট্রের বিপদে সে ৬২ র যুদ্ধই হোক বা ৬৫, ৭১ এর যুদ্ধকালীন অবস্থা, কিম্বা ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্র হত্যার পৈশাচিকতায় সংঘ ও তার ভিচার সংগঠন পথে নামলেও, সব সময় এই কাজ করার জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তাও বোঝার বিষয়।

শেষ লগ্নে বলি, সমস্ত পৃথিবী আজ অশান্তির আগুণে জ্বলছে। একদিকে জড়বাদী সভ্যতার দানবীয় তান্ডব অন্যদিকে ইসলামিক সন্ত্রাসের পৈশাচিক নৃত্য। এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে পৃথিবীর মানুষ, প্রকৃতি আতঙ্কিত, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত। এই পরিস্থিতি আমরা মহান সনাতনী পরম্পরার অধিকারী হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। সঙ্ঘ বিচার ধারা, একাত্মমানববাদ, ভারতীয় সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতি সহায়ে এই বিশ্বকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে তুলে নিতেই হবে। এই কারণেই পুণ্যভুমি, কর্মভুমি, অগণিত মহাত্মার পাদস্পর্শে পবিত্র, স্বয়ং ঈশ্বরের আবির্ভাবে তীর্থভুমি ভারতে আমাদের জন্ম। বিশ্ব জুড়ে এই মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এগোতেই হবে, অন্য কোন পথ নেই, এটাই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এই সংঘ বিচার কে, ভারতের মূলীভূত বিচারকে পুরো সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই দরকার রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ। তার জন্যই চাই বিজেপিকে। রাজ্যে, রাজ্যে, জেলায় জেলায় এমনকি প্রতি পঞ্চায়েত থেকে প্রতি পুরসভায়।

**(লেখক- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)**

# মোদি সরকারের বিদেশ নীতি: বাস্তবের প্রেক্ষাপটে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন

বিমল শংকর নন্দ

সমাজস্থ মানুষ সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না—অপরের সাথে তাঁকে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে নানা ধরণের সম্পর্কের বন্ধনে রাষ্ট্রকে আবদ্ধ হতে হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেমন সমাজের অস্তিত্ব থাকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি সমাজের কল্পনা করা হয় যাকে আন্তর্জাতিক সমাজ বা বিশ্ব-সমাজ বলা হয়। আন্তর্জাতিক সমাজের প্রধান একক বা সদস্য হল স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র। বর্তমান পৃথিবীতে ২০৬টি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে যার মধ্যে ১৯৩টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্র, দুটি রাষ্ট্রপুঞ্জের 'অবজারভার' রাষ্ট্র এবং ১১টি অন্যান্য রাষ্ট্র। এছাড়াও আছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক সংগঠন যারা আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিগত শতাব্দীর শেষ থেকে আর এক ধরণের অ-রাষ্ট্রীয় কারক বা non-state actor আন্তর্জাতিক সমাজ ও তার প্রক্রিয়াকে প্রায়শই বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করছে। বিগত শতাব্দীর ৭০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা তাদের অস্তিত্ব জানান দিলেও একটি মূর্তিমান বিপদ হিসেবে হাজির হয়েছে বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। বিভিন্ন দেশে সে সময় থেকেই সন্ত্রাসবাদ তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক এর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে প্রায় তিন হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দা যেন গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে গুরুত্ব দিতে হবে। এর ঠিক দশ বছর পরেই তার সমস্ত ভয়ঙ্করতা আর নিষ্ঠুরতা নিয়ে হাজির হয় কুখ্যাত ইসলামিক স্টেট বা আই এস। এরা প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করে,

গড়ে তুলতে চায় এক অন্য ধরণের রাষ্ট্র। এই ইসলামিক স্টেট নিষ্ঠুরতায় এবং বর্বরতায় আল কায়দার চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে। সন্ত্রাসবাদের এই নয়া অবতারদের ভাবনাগত ভিত্তিই হল মৌলবাদ। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম actor বা কারক হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে এখন গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র কি ভূমিকা পালন করবে, কিভাবে রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষিত হবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই নীতিগুলির সমাহার হল বিদেশ নীতি বা পররাষ্ট্র নীতি। এই নীতিগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র ঠিক করে নেয় আন্তর্জাতিক সমাজে তার ভূমিকা ঠিক কেমন হবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের অবদান কি হবে। যত দিন যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ততই জটিল আকার ধারণ করছে। ফলে বিদেশ নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিও ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, বিশেষত ভারতের মতো দেশের পক্ষে। কারণ আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ এবং ভূ-কৌশলগত অবস্থানের নিরিখে ভারত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। ভারত আবার বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে বিদেশ নীতি নির্ধারণের একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারকদের মাথায় রাখতে হয় সংসদের কথাকে কারণ সংসদের জনপ্রিয় কক্ষের কাছে সরকারকে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। ভারতের মতো একটি মুক্ত গণতন্ত্রের দেশে সংবাদ মাধ্যম যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করে। সরকারের যে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে আলাপ আলোচনা চলে। চলে সরকারী নীতির কাটাছেড়া ও বিশ্লেষণ। ফলে সরকারকে বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে প্রতিটি পা ফেলতে হয় সতর্ক হয়ে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকারের বিগত দশ বছরের বিদেশ নীতি পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা হয় বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার এক নতুন আশার জন্ম দিয়েছে। মোদির হাত ধরে উঠে এসেছে এক নতুন ভারত যে বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে শক্তিশালী ভারতের উত্থান বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা।

রাষ্ট্রের বিদেশনীতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিশেষত ভারতের মতো একটি দেশে। কারণ এদেশে বহুযুগ আগে থেকেই রাষ্ট্রের নীতি নিয়ে চর্চা এবং আলোচনা চলেছে। খ্রীষ্টের জন্মের বহু আগে, ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে একটি রাষ্ট্রমণ্ডলে একজন রাজা কি নীতি নির্ধারণ করবেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন কৌটিল্য মনে করতেন যে একটি রাষ্ট্র বা তার শাসক অর্থাৎ রাজার প্রধান লক্ষ্য হয় ক্ষমতা অর্জন। আধুনিক বাস্তববাদী রাজনীতি বিজ্ঞানীদের মতো কৌটিল্যও মনে করতেন একজন বিজিগীষু রাজা (যিনি একটি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী রাষ্ট্র গড়তে চান) এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করবেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন রাষ্ট্রগুলিকে বন্ধু বলে বেছে নেবেন যাতে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত হয়, আর রাষ্ট্র সকলের সম্ভ্রম আদায় করতে সক্ষম হয়। মরগেনথাউ (Morgenthau) এবং অন্যান্য বাস্তববাদী তাত্ত্বিকগণ বাস্তববাদী ভাবনার প্রথম উদ্‌গাতা হিসেবে কৌটিল্যের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচনার আরো আগের রামায়ণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে কূটনীতির ভূমিকা ও গুরুত্বের বর্ণনা আছে এবং অবশ্যই গল্পের আঙ্গিকে। রামের প্রতিভূ হয়ে হনুমানের লঙ্কা গমন এবং লঙ্কা পরিস্থিতি এবং তার সামরিক শক্তি সম্পর্কে রামকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান আধুনিক কূটনীতিকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। আধুনিক যুগে অনেকে মনে করেন যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের 'ইনফরমেশন এজেন্ট'-এর ভূমিকাও পালন করতে হয়। তাঁরা যে রাষ্ট্রে নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে যান সেই রাষ্ট্র এবং তার শক্তি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নিজের রাষ্ট্রকে দিতে হয়। আবার আধুনিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের মতোই হনুমান রাবনের রাজসভায় রাবনের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়েছেন, সীতাকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেছেন। এই আলোচনায় হনুমান রামের শক্তি অযোধ্যায় তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে রাবনকে অবহিত করেছেন। আধুনিক কূটনীতিতে একে 'পাওয়ার প্রোজেকশন' বলা হয়। এখনকার যুগে অবশ্য 'পাওয়ার প্রোজেকশন'-এ অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রামায়ণের কাহিনী সঠিকভাবে অনুধাবন করলে ক্ষমতা, কূটনীতি প্রভৃতি ধারণাগুলোর গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি প্রক্রিয়ায় এই পদ্ধতিগুলি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো।

রামায়ণের যুগ থেকেই আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু সব ভাবনাতেই ছিল এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের ধারণা যে রাষ্ট্র বিশ্ব সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো ভারতের বিদেশ নীতির প্রাথমিক পর্বে ভারতকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক লক্ষ্যটি অবহেলিত হয়েছে। ভারতের মতো সংসদীয় ব্যবস্থায় পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এদেশের বিদেশনীতির মূল ভিতটিকে তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদেশনীতি প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ নিয়ে নেহেরুর আগ্রহ এত বেশী ছিল যে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাউকে নিয়োগ করেন নি। নিজের হাতেই পররাষ্ট্র দপ্তর রেখেছিলেন। ঠান্ডা লড়াই এবং দ্বিমেরুপ্রবণ রাজনীতির যুগে কোন সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। কিন্তু ঠান্ডা লড়াই এবং দ্বিমেরুপ্রবণ রাজনীতির আবহে প্রয়োজন ছিল ভারতকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং মতিগতি সম্পর্কে

অনেক বেশী সতর্ক থাকা। কিন্তু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং ভারতের দুই শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী চীন এবং পাকিস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে নেহেরু এমন কিছু সমস্যা তৈরী করে দিয়ে যান যার ফলভোগ এখনো করতে হচ্ছে ভারতকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হানাদারদের বাগে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া এবং কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ এলাকা (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) পাকিস্তানের হাতে থেকে যাওয়া, ১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধে কাশ্মীরের লাডাখ অঞ্চলের প্রায় ৩৭০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা (আকসাই চিন) চীনের দখলে চলে যাওয়া নেহরুর ভুল বিদেশনীতির ফল। তাই নেহেরু অবশ্যই ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের বিদেশনীতির মূল কাঠামোটিকে তৈরী করেছেন যদিও সেই কাঠামোটি ছিল খুবই নড়বড়ে। কারণ নেহেরু বিদেশনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককেই উপেক্ষা করেছিলেন এবং সেটি হল বাস্তববাদ।

এই প্রেক্ষাপটেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশনীতিটিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে তাতে বিদেশ নীতি সম্পর্কে দলের ভবিষ্যৎ ভাবনাটি সুষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে প্রধান ভাবনাটিই ছিল 'নেশন ফার্স্ট' (Nation First) বা দেশ আগে। এই ইস্তাহারে জাতীয় স্বার্থকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তবতা বা pragmatism কে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলা হয়। এটা ঠিক ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের পর ভারতের বিদেশ নীতিতে এক লক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তা হল একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে দেশকে গড়ে তোলা। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের পুনরায় পরাজয় এবং পাকিস্তান বিভাজন ও বাংলাদেশের সৃষ্টি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, সর্বোপরি ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে এদেশ এশীয় তথা বিশ্ব রাজনীতিতেও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার শক্তি রাখে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হল সাহসী নেতৃত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদী ভাবনা। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পর এ নিয়ে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। মাত্র দুই বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভারতের বিদেশনীতিকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেন। ১৯৯৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি লাহোর বাসযাত্রা ছিল পাকিস্তান সহ সমস্ত প্রতিবেশীর কাছেই একটা বার্তা যে, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপনে ভারত সব সময়েই আগ্রহী, কিন্তু বন্ধুত্বের প্রক্রিয়াটি সব সময় দ্বিমুখী। যে দেশ বন্ধুত্বের ভাষা বোঝে না তাকে সমুচিত জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। লাহোর বাস যাত্রার তিন মাস পরেই জম্মু ও কাশ্মীরের কারগিল অঞ্চলে পাকিস্তানের হামলার সমূচিত জবাব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯৯ সালের মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঘটে চলা এই সংঘর্ষে পাকিস্তান শুধু পিছু হটে নি, ভারতের মনোভাব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বার্তাও গিয়েছিল পাকিস্তানের কাছে। সেটি হল ভারত আর আগের মতো একটি শান্তিবাদী pacifist state নয়। বরং আঘাত হলে প্রত্যাঘাতে প্রস্তুত দেশ। আর অটলবিহারী বাজপেয়ীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৯৮ সালের ১১ এবং ১৩ মে পোখরান পরমাণু পরীক্ষা। ১৯৭৪ সালের মে মাসে পোখরানে প্রথম পরমাণু পরীক্ষা চালালেও ভারতের ঘোষিত নীতি ছিল ভারত পরমাণু ব্যবহার করবে শান্তিপূর্ণ কাজে। ১৯৭৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মোরারজী দেশাই-এর নীতি ছিল পৃথিবীর সব দেশ পরমাণু অস্ত্র তৈরী করলেও ভারত কখনোই পরমাণু অস্ত্র তৈরী করবে না। এই দিক দিয়ে দেখলে বাজপেয়ীর পরমাণু নীতি ছিল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৯৮ সালের পরমাণু পরীক্ষার পর ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করে যে পরমাণু অস্ত্র তৈরীর জন্যই এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে মাত্র পাঁচটি দেশের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিয়ে ভারতের উত্থান ঘটে এক নতুন বিশ্বশক্তি হিসেবে।

বাজপেয়ী যেখানে শেষ করেছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি শুরু করেছেন সেখান থেকে। প্রথম এন.ডি.এ. সরকারের কার্যকাল শেষ হয় ২০০৪ সালে। আর মোদির নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার ক্ষমতায় আসে ২০১৪ সালে। মাঝখানের দশ বছর ছিল নড়বড়ে কোয়ালিশন, নীতি পঙ্গুত্বের যুগ। বিজেপি এর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেই পঙ্গুত্বের যুগের অবসান ঘটায়। নরেন্দ্র মোদি বিদেশ নীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতির ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন, তাঁর গণমোহিনী নেতৃত্ব এবং ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সহজেই তার পক্ষে জন সমর্থন সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই মোদি বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেছিলেন। সেই সফরগুলিতে মোদি ব্যক্তিগত কূটনীতির এক নতুন ধারা তৈরী করেন। যে দেশগুলিতে তিনি সফল করেছিলেন সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদির ব্যক্তিগত কূটনীতির এই ঐতিহ্য আরো গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির নেতাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একদিকে যেমন বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়েছে অন্যদিকে ভারত বিশ্বের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে এসে তার ভূমিকা পালন করতে পারছে। বিশ্বরাজনীতির প্রান্তদেশ থেকে কেন্দ্রে এসে প্রধান ভূমিকা পালন নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদির বিদেশ নীতির সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী।

বাজপেয়ীর মতোই নরেন্দ্র মোদির প্রাথমিক নীতি ছিল 'নেবারহুড ফার্স্ট' (Neighbourhood first) নীতি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদি যখন শপথ গ্রহণ করেন সেই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন (ঙঙ্টঙ্খ -এর রাষ্ট্র প্রধানদের উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদি প্রথমেই ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে সফর শুরু করেন। পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক দ্রুত উন্নত হতে থাকে। যদিও পাকিস্তানের কার্যকলাপ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংগঠন SAARC কে সম্পূর্ণ একটি 'অক্ষম' সংগঠনে পরিণত করেছে তবু ভারত দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে এক কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ভুটান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ বার্মা বা মায়ানমারের সাথে ভারতের সম্পর্ক এখন যথেষ্টই দৃঢ়। এবং ভারত এই সম্পর্কস্থাপনে সক্ষম হয়েছে নিজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত স্বার্থকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে। একটি আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে SAARC এর পক্ষে যেহেতু সক্রিয় ভূমিকা পালন সম্ভব হচ্ছে না এ কারণে ভারত BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation) -এর মতো বহু সহযোগিতাভিত্তিক সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার উপর নজর দিয়েছে।

মোদির বিদেশ নীতির আরো কতগুলি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসীমা রাও বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে যে 'লুক-ইস্ট' পলিসির সূত্রপাত ঘটান মোদি তাকে 'অ্যাক্ট ইষ্ট' পলিসিতে পরিণত করেছেন। লক্ষ্য হল পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে সম্পর্ক এবং সহযোগিতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমকালীন সময়ে বিশ্বজোড়া চীনের আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশগুলি যে পাল্টা ব্যবস্থা শুরু করেছে ভারতও সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগর এবং ভারত মহাসাগরে চীনের ভূমিকা ক্রমেই আগ্রাসী হয়ে উঠছে, চীনের এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাপান, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আর্থিক এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ক্রমেই দৃঢ় করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করছে কারণ আগ্রাসী চীনকে প্রতিরোধ করতে এর কোন বিকল্প নেই। মোদির 'অ্যাক্ট ইষ্ট' পলিসি ক্রমেই 'অ্যাক্ট এশিয়া' পলিসিতে পরিণত হচ্ছে।

ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে পৃথিবী এক মেরুপ্রবণ। এই ব্যবস্থার শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এখন উন্নতির শিখরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিস্পর্ধী হওয়ার স্বপ্ন দেখা দেশ রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করছে ভারত, অর্থাৎ কোন দেশের ছত্রছায়ায় নয়, ভারত নিজেই বিশ্বে তার ভূমিকা সদর্থকভাবে পালন করতে চায়। একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারতের উত্থান মোদির বিদেশনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

**লেখক: অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক**

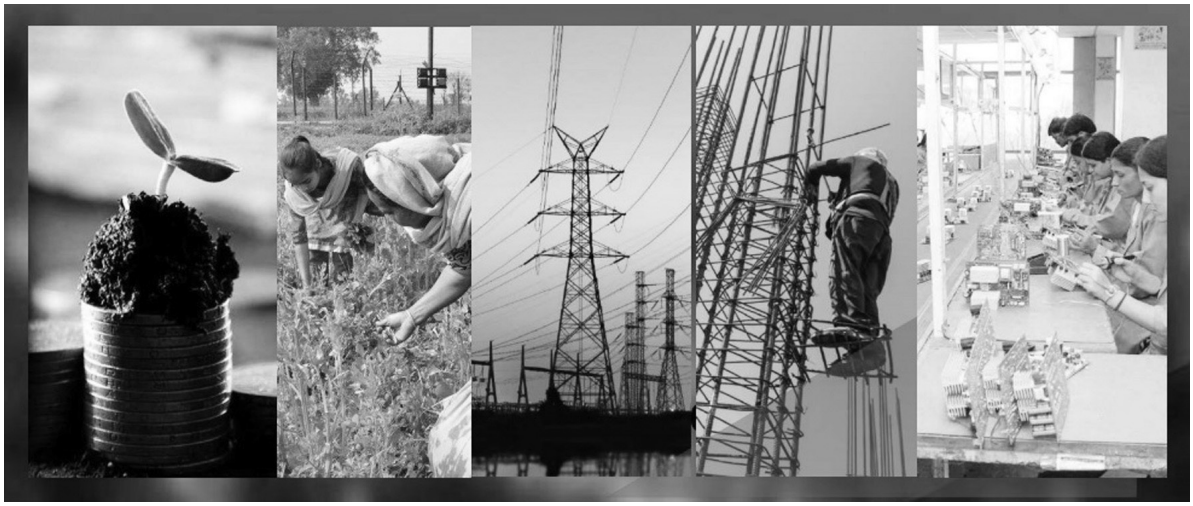

# আত্মনির্ভর ভারত ও ভারতনির্ভর বিশ্ব

## সুভাষ চন্দ্র গুহ

স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ চলে গেলেও ব্রিটিশরাজের শোষণ অব্যাহত থেকে ছিল। ক্ষমতার মধুতে একশ্রেণীর আমলারাও রাজনীতিকদের সঙ্গে লুটোপুটি খেয়ে চলেছিল। মুষ্টিমেয় নেতা আর কিছু উচ্চপদস্থ আমলা একটা বোঝাপড়ার সমীকরণে যুক্ত হয়ে সব সুখ ভোগ করছিল, আর কোটি কোটি নিরন্ন মানুষ তার জোগান দিচ্ছিল। স্বাধীনতার আগে থেকেই নেহরুকে ঘিরে তৈরি হওয়া মৌচাক দেশপ্রেমিক মানুষকে জায়গা নিতে দেয় নি।জায়গা করেছিল তারাই যারা ইংরেজ শাসনের ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক যুগের অবসান ঘটল এবং সাধারণ ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা এল। কিন্তু সেই ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে বর্তমান ভোট ব্যবস্থায় ও দলনির্ভর গণতন্ত্রে যে ছিদ্র আছে সেটিকেও তো আটকাতে হবে। প্রচলিত গোপন ভোটব্যবস্থায় নির্বাচিত হবার পরে মন্ত্রিত্বে আসীন জননেতারা আমলাতন্ত্রের খপ্পরে পড়ে যান এবং জনতার সঙ্গে নেতার নাড়ির সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে যায়। সেই কারণে ভোটজীবী রাজনৈতিক দলবাজরা, তাদের পোষা বুদ্ধিজীবীরা এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা সেই ছিদ্র দিয়ে গণতন্ত্রের দুর্বলতা কায়েম রাখতে সফলকাম হন।এতদিনের স্বাধীন ভারতবর্ষে তাই হয়ে এসেছে। সেই কারণে অনেক জঞ্জাল জমা হয়েছে। সেই জঞ্জাল অপসারণের কাজটি তো অনায়াসসাধ্য হতে পারে না।তাই স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নিরন্তর জনকল্যাণমুখী নানাবিধ সেবা বা পরিষেবামুখী কর্মোদ্দোগের পাশাপাশি নিয়মিত 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আদানপ্রদানে দেশবাসীর মনে বিশ্বাস, ভরসা,উৎসাহ উদ্দীপনা ধরে রাখতে প্রয়াস করেছেন।

সকলের প্রতি বিশ্বাস, সকলের সঙ্গে কাজ এবং সকলের জন্য কল্যাণ এই মহাসঙ্কল্প নিয়ে দেশমায়ের সন্তানদের মঙ্গল কামনায় একাত্ম মানবতার মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনায় সিদ্ধ, আত্মবলিদানের অঙ্গীকারে ঋদ্ধ এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত আপামর দেশবাসীর জন্য সঙ্কল্পিত কর্ম সম্পাদনে নিরন্তর রত রয়েছেন।

ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের দিশায় এগিয়ে নিয়ে চলার সনাতন শপথে অক্লান্ত ভারতপথিক সাধারণ ভারতবাসীর একজন হিসাবে নিজেকে তাদের মধ্যে হাজির করেছেন, তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন। স্বতন্ত্রবীর সাভারকর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেশাভিমান যারা মুছে দিতে চেয়েছিল, যারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশমায়ের ক্ষতির মত আত্মহননের পথ বেছে নিতেও কুণ্ঠিত হয় নি,তাদের সবরকম মতলবি প্রয়াসকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর সাধনলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা টের পেয়েছিলেন

যে বিশ্বব্যাপ্ত কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সুনামি নামতে পারে। তাই নোটবন্দী অস্ত্র দিয়ে শুরু করেছিলেন আত্মরক্ষার প্রথম লড়াই। তারপর আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির কুশলী প্রয়োগে প্রশাসনিক সবরকম নিয়ন্ত্রণমূলক কাজে যথাসম্ভব নৈব্যক্তিকতা প্রণয়ন করে আমলা তন্ত্রকে দীর্ঘসূত্রিতা,অর্থনৈতিক দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। 'এক দেশ এক কর' নিয়মের প্রবর্তন, তিন তালাক প্রথার মত সামাজিক ব্যাধি, কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতা এবং তজ্জনিত বিষমতার অবসান ঘটানো হল। স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে প্রাপ্য সাধারণ সুবিধাগুলি খর্ব হয়, ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা এমন সব আইনের যথাযথ সংস্কার করা হল।

সর্বদা প্রধানমন্ত্রী ১৩০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন সাকার করার কথা বলেন। আত্মনির্ভর ভারতের যে সনদ তিনি পেশ করেছেন সেখানে গ্রাম সমাজ আর নগর সমাজের পুনরুজ্জীবিন ঘটিয়ে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলার বার্তা রাখা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,বাসস্থান, পরিবেশ, রুজি রোজগার সব বিষয়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে আর্থিক বা প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে কোন দয়া দাক্ষিণ্য নয়, স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টাকে সহায়তার কথাই বলা হয়েছে।

মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলি সমাজপ্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান পাশ্চাত্যের দেশগুলির সঙ্গে একই তুলাদন্ডে সাধারণ মানুষের জীবনমান ও চাহিদার হিসাব করা এখানে চলে না। রাষ্ট্রপ্রধান পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কুবেরের (যন্ত্ররাজ বিভূতির) রথ নির্বিবাদে চলতে পারে। সেখানে সমাজ কীভাবে চলবে, কোন দিকে যাবে, না যাবে, সেটি কার্যত মানুষ ঠিক করে না; ঠিক করে যন্ত্ররাজ, যন্ত্রের অধিকারী পুঁজি। এই টাকার বা পুঁজির প্রাচীন নাম ছিল কুবের, আধুনিক নাম 'কর্পোরেট-পুঁজি'।

প্রধানমন্ত্রী যে আত্মনির্ভর ভারতের ডাক দিয়েছেন সেটি ধারণা করতে হলে আমাদের জানতে হবে কর্পোরেট-পুঁজি বিষয়ে আধুনিক যুগদ্রষ্টা মণীষীদের চৌম্বক মন্তব্যসমূহ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইউরোপীয় কুবেরের মূলনীতি হল 'অর্থসংগ্রহ'। অর্থসংগ্রহের জন্য অর্থসংগ্রহ; 'ক্রমবৃদ্ধি'ই তার একমাত্র ধর্ম। বরফের পাহাড় যেমন বরফ পড়ে পড়ে ক্রমশ উঁচু হতে থাকে, এও অনেকটা তেমনি। অর্থ সংগ্রহ করে সে ফুলে ফেঁপে উঠতে চায়। ধনীকে সে নিত্য প্ররোচিত করতে থাকে, 'আরো টাকা আনো, দেখো, আমি কেমন ফুলে উঠি, কোটি থেকে কোটি-কোটি হয়ে যেতে পারি; তুমিও কেমন কোটিপতি থেকে কোটি-কোটিপতি হয়ে যেতে পারো।'

বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে যন্ত্রযুগের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ শেষমেষ মানুষের উপর যন্ত্রকে রাজত্ব করতে দিতে রাজি হয়নি ব'লে অধীনতাকামী কল বা যন্ত্রকে চলে যেতে হয় মহাপ্রস্থানে, পাশ্চাত্যে। প্রায় হাজার বছর পরে ইউরোপে প্রবল ঢক্কানিনাদে প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিপ্লব 'আধুনিকতা' ও 'গণতন্ত্র'-এর নামে মানুষের উপর রাজত্ব করার সেই রাস্তাটাই খুলে দিয়েছিল যন্ত্রের সামনে; বৃহৎশিল্প বা যন্ত্ররাজ মানুষের সামাজিক ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন যন্ত্রের প্রয়োজন অনুসারে তার খাদ্য কাঁচামালের অবাধ যোগান,যন্ত্রজাত উৎপন্ন-ধারাকে অবাধে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং যন্ত্রের প্রয়োজন অনুসারে সমাজসদস্যগণকে শ্রমিক রূপে গ্রহণ ও বর্জন—এই তিনটি অনিবার্য কার্যক্রম রাষ্ট্র যেন বজায় রাখে—এই দাবি শাসক-পরিচালকের কাছে রাখা হয়েছিল। এইভাবে রাষ্ট্রকে জনগণের দায়বহন থেকে মুক্ত করে গণতন্ত্রের মধ্যে ঘাপটি মেরে বহাল তবিয়তে বসে থাকা কুবেরের সেবাতেই নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করা হল।

বৃহৎশিল্প, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ফেঁপরা-গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র, এই বিষাক্ত ত্রিফলা ঢুকিয়ে মানবজাতির অস্তিত্বের লীলাভূমি কর্মজগৎ, জ্ঞানজগৎ ও প্রশাসনিক জগৎ-এর ত্রিলোক তা দখল করে ফেলা হল। জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মনুষ্যজগৎকে খাবলে খেয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করা হল। সারা বিশ্ব সেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইল। জ্ঞানীপ্রবর টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বললেন, 'এর চেয়ে তো দাসতন্ত্র ছিল ভাল।'

পুঁজিতন্ত্রের বিশ্বায়ণের যুগে ভারতবর্ষ এই কুপ্রভাবের থেকে রক্ষা পায় নি।কিন্তু বৌদ্ধযুগে যেমন হয়েছে, আত্মশক্তি বিকাশের অধ্যাত্ম সাধনার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা কুবেরের জালে পুরোপুরি ফেঁসে যাওয়া থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভারতবাসী তার সমাজবদ্ধ মানবিক জীবনের মূল্যমান এমন মাত্রায় বেঁধে রেখেছে যে,ধনকুবেরকে নয়,সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে সে বড় আসন দিয়েছে।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম' ত্যাগের বুদ্ধি জাগিয়ে নিয়ে ভোগ কর, ভোগের মধ্যে ডুবে যেও না, তাহলে ভোগের তৃপ্তি হারাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, মৌমাছি মধু খেতে এসে যেন মধুভাণ্ডে আটকে না যায়।

এযাবৎকাল যারা দেশ পরিচালনা করেছে তারা ছিল পাশ্চাত্য কুবের সভ্যতার তল্পিবাহক মাত্র। তারা মেকলের দুরভিসন্ধীর শিকার। তাই তারা কোনদিন জনসাধারণের ভারতকে দেখতে পায় নি।সাধারণ ভারতবাসীর সংস্কার শিখিয়েছে, জীবনে সামগ্রীর থেকে সুখের মূল্য বড়। তাই সেইটুকু সামগ্রী সে দাবী করে,যা পেলে সে সুখী হয় ও নির্বিবাদে তার মনের রাজত্বে বিরাজ করতে পারে। এই বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা যায়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসঞ্চয়ের ভার নেয় তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।' আর সে সামগ্রীর বোঝা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আজ তা এতই বেড়েছে যে, হয় বোকা দেশনেতাদের দেশে

ঐ উদ্বৃত্ত সামগ্রীগুলি বেচে দিয়ে, নয় সমুদ্রে ফেলে দিয়ে কুবেরকে প্রাণ বাঁচাতে হয়।তার মানে, কুবেরের রথ যদি না থামে রক্ষা নেই। এবার তাকে থামতে হবে, থামাতে হবে। নইলে সভ্যতা নামক অন্ধকূপের বন্দীরা মরবে, কুবেরও বাঁচবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশ পরিচালনার নীতিতে কুবেরের রথকে আপাতত থামাতে চেয়েছেন। সাধারণ ভারতবাসীর চাহিদাটা মেটাতে স্লোগান তুলেছেন -যুবদের হাতে রোজগারের কাজ, আর বয়ঃবৃদ্ধদের প্রয়োজনে ওষুধ।যারা কুবেরের প্রভাব বশে সাধারণ ভারতবাসীর ন্যূনতম চাহিদা পূরণে বাধা দেবে তাদের কঠোর হাতে শাসন করতে হবে।

তাই আত্মনির্ভর ভারতের যে সনদ প্রধানমন্ত্রী পেশ করেছেন সেখানে ভারত সংস্কৃতির লক্ষ্মীপুঁজিকে আহবান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে যার যার সাধের লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য সাধ্যটুকু আয়ত্বাধীন করতে সরকারী নীতি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এই নীতির মুখ্য বিন্দুগুলি হল ল্যান্ড (Land), লেবার (Labour), লিক্যুডিটি (Liquidity) এবং ল'স (Laws)। সুষ্ঠু জনজীবনের স্বার্থে রাষ্ট্রকে এই বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কুবের অধিকৃত রাষ্ট্রশাসন সমাজশাসনের মহামূল্যবান নীতিগুলিকে অস্বীকার করেছে, উন্নয়নের নামে সমাজশাসন থেকে মনুষ্যত্বকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়ে জোচ্চুরি, চোট্টামি, চামারি, চশমখোরীকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে প্রয়াস করেছে। কিন্তু কুবেরের এই প্রয়াস ভারতীয় সমাজদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার কাছে অসফলই থেকে গেছে। একাত্ম মানবতার আদর্শে সদাসঞ্জীবিত ভারত সমাজকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন মোদীজী। তাই মনুষ্যত্বের শক্তিতে চিরভাস্বর ভারতের কৃষিজীবী, শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের আত্মস্থ হতে বলেছেন।

সেইমতো গ্রাম সমাজ আর নগর সমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলতে বার্তা দেওয়া হয়েছে।শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান,পরিবেশ,রুজি রোজগার সব বিষয়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে আর্থিক বা প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন দয়া দাক্ষিণ্য নয়, সমাজনির্ভর জনগণকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। কুবেরের সহায়তার বাধ্যবাধকতা থেকে তারা যেন বেরিয়ে আসতে পারে। সেইজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত কুবের পুঁজি (দুষ্টু আমলা নিয়ন্ত্রিত) ভেঙ্গে ফেলে (liquidity) সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। শুধু তাদেরই শ্রমার্জিত অর্থ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া মাত্র নয়,পরম যত্নে সেইমতো পরিকাঠামোও গড়ে দিচ্ছেন (আইনী সংস্কার) যাতে তারা স্বনির্ভর রোজগেরে হয় এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ার স্বপ্ন সাকার হতে পারে।

প্রথম পর্বের ২০ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবস্থার মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন, জলাশয় বা ভেরীর মাছচাষ, নদী সমুদ্রের জীবিকা, হাঁস মুরগী পালন, পোলট্রি ব্যবসা, পশুপালন, গোপালন, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, সার উৎপাদন, সৌর বিদ্যুৎ,খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি যাবতীয় বিকেন্দ্রীকৃত উদ্যোগে প্রাণ সঞ্চার করতে চাওয়া হয়েছে। সবরকমের ক্ষুদ্র ও মধ্য আকারের উদ্যোগে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা হয়েছে।

যন্ত্ররাজের জয়গান গাওয়া ইউরোপীয় শ্রম আইনের বিশ্বজোড়া আধিপত্য, অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ নেতারা যেগুলি বহাল রাখতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে করায়ত্ত ও কুক্ষিগত করাটাই এতদিন একমাত্র কর্তব্য বলে জেনে এসেছে তাদের বিরোধীতা আজকের দিনে প্রবল থেকে প্রবলতর হবে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের দিশায় এগিয়ে নিয়ে চলার সনাতন শপথে ভারতবাসীর স্বপ্ন সাকার করতে শ্রম আইনে বদলের কথা বলেছেন। অক্লান্ত ভারতপথিক তিনি সাধারণ ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন। তাদেরই একজন হিসাবে নিজেকে তাদের মধ্যে হাজির করেছেন। এমনকী বিদেশের মাটিতেও যখনই সাধারণ মানুষদের মধ্যে তিনি পৌঁছেছেন, তিনি তাদেরই লোক হয়ে উঠেছেন।। ভারতবাসীর নয়নের মণি নরেন্দ্র মোদীকে তাই সারা বিশ্বের মানুষ কুর্নিশ জানাচ্ছে।

বস্তুত, নতুন বিশ্ববীক্ষায় শিল্পনীতি এবং শ্রমনীতিতে 'ট্রাস্টীসীপ' ধারনা উৎসাহ পাচ্ছে। মালিকানা এবং শ্রম নিয়োজনের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নয়,পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমন্বয়ের সম্পর্ক বেশী কার্যকর বলে স্বীকৃত হচ্ছে। যে কোন উদ্যোগে অংশীদারত্বের পুঁজিমূল্যের বদলে ঝুঁকি পালনের ইচ্ছা বা প্রবনতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা হচ্ছে। ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের স্বাভাবিক গতিছন্দে এই নীতি সমাদৃত হয়ে এসেছে। আজ থেকে ১৫০বছর আগে জামসেদজী টাটা বুঝেছিলেন, উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠি মালিকানার বিপরীতে অবস্থিত ঝুঁকিগ্রাহক মাত্র নয়, তারাই আসলে উদ্যোগের অস্তিত্বের মূল কারণ। পরবর্তীকালে আরো আরো উদ্যোগপতি ঘরানা টাটাদের এই নীতিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করে ভারতীয় সমাজের জীবনমানে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

উন্নয়নকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার উপায় ভারতবর্ষে পরীক্ষিত প্রমানস্বরূপ বিদ্যমান আছে। নরেন্দ্র মোদী আজকে ভারত রাষ্ট্রের নেতামাত্র নন,তিনি ভারত সমাজেরও নেতা।ভারত সমাজের আবেগকে তিনি ধারণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্কল্প এবং সদিচ্ছা আত্মনির্ভর ভারতের জীবনবোধকে প্রামাণিক সত্য হিসাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে। আগামী দিনে কুবের পুঁজির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি ঘটবে। ভূপ্রকৃতি, সবুজ, জীবজগৎ বাঁচবে এবং মানব সমাজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত হবে।ভারতীয় জীবন দর্শন বরণ করে নিয়ে ইউরোপীয় যন্ত্র সভ্যতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে সারাবিশ্বের মানুষ ভারতের জয়গান গাইবে।

**লেখক: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী**

# ভারতের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও বিরোধীদের ভিত্তিহীন অভিযোগের কিছু উত্তর

আদিত্য দাস

স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ২টি পর্যায়ে বিভক্ত, প্রথমটি ১৯৪৭-১৯৯১ ও দ্বিতীয়টি ১৯৯১ বর্তমান। প্রথম ৪০ বছর ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৯০-৯১, ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ৪.২% p.a., মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধির ২% ক্রেতার দাম সূচক (১৯৬৯-৭০; ১৯৯০-৯১) বৃদ্ধি হয়েছিল ৮.২ এবং আর্থিক ঘাটতি (১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯০-৯১) গড়ে ৫.৫% এবং বাহ্যিক ঋণ ২৮.৭% ছিল ভারতের GDP র।

এই regulated ব্যবস্থা ভারতের স্বক্ষমতাকে restrict করে রেখেছিল এবং এই বৃদ্ধির হারকে ব্যঙ্গ করে ''Hindu Rate of Growth'' বলা হতো। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজা কৃষ্ণণ-এর নামকরণ করেন, যেটা একটা ধর্মের শুধু নয় একটা গোটা জাতির অপমান।

পি. ভি. নরসিমহা রাও এর নেতৃত্বে ১৯৯১ এর আর্থিক উদারিকরণ শুধু ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি নয় তার সাথে কয়েক কোটি ভারতীকে আর্থিক ভাবে স্বক্ষম করেছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছে। উদারিকরণ পরবর্তিতে ভারতের আর্থিক অবস্থা বোঝার জন্য বিভিন্ন সরকারের জাতীয় আয় ও মুদ্রাস্ফিতী দেখে নেব ঃ

| সময় | GDP বৃদ্ধি | মুদ্রাস্ফিতী | প্রধানমন্ত্রী |
|---|---|---|---|
| 1991-92 -থ-ক 1995-96 | 5.10% | 10.20% | পি. ভি. নরসিমহা রাও |
| 1996-97 -থ-ক 1997-98 | 5.80% | 8.10% | এইচ. ডি. -দভ -গৌডা ও আই. কে. গুজরাল |
| 1998-99 -থ-ক 2003-04 | 5.90% | 5.40% | অটল বিহারি বাজ-পই |
| 2004-05 -থ-ক 2008-09 | 6.90% | 5.70% | ডঃ -মান-মা-হান সিং |
| 2009-10 -থ-ক 2013-14 | 6.70% | 10.10% | ডঃ -মান-মা-হান সিং |
| 2014-15 -থ-ক 2018-19 | 7.30% | 4.60% | ন-রন্দ্র -মাদী |

এই চার্ট দুটি জিনিস নির্দেশ করে, এক হ গড় GDP বৃদ্ধির হার নরেন্দ্র মোদির সময়ে ৭.৩% যেটার ব্যাপ্তি আগের গুলোর তুলনায় অনেক বেশি এবং বৃদ্ধির হার অনেক বেশি যেটা মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টের কাজ করে।

দুই হল পাঁচ বছর UPA-2 সরকারের (২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪) এর সময়কালে মুদ্রাস্ফীতির হার ১২.২% এবং ৮.৪% এর মধ্যে ছিল। যেটা যেকোনো দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সরকার আসার পর ৫.৯%, ৪.৯%, ৪.৫%, ৩.৬% এবং ৩.৯% ছিল (টার্গেট ছিল ৪% +/- ২% রেঞ্জ)

যখন নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এল ভারত বিশ্বের দশম বৃহত্তর অর্থনীতি ছিল, বর্তমানে ভারত পঞ্চম বৃহত্তর অর্থনীতি। Mc Kinsey Institute এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মধ্যবিত্তের আয়তন দ্রুত গতিতে বাড়ছে (১৪% ছিল ২০০৫ সালে, ২৪% ছিল ২০১৫ সালে) এবং অনুমান করা যায় ২০২৫ সালে এটা বেড়ে ৪৪ হবে।

''Easy of Doing Business'' ২০১৪ থেকে ১৪২ তম স্থান ছিল এবং সেটা ২০১৯-এ ৭৭ তম স্থান পৌঁছেছে। এর মানে ২০১৪ সালে নতুন সরকার আসার পর, দ্রুত গতিতে ব্যবসার পরিকাঠামো ও পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা কথা আছে আমাদের অধ্যাপক কূলের ''Public REsearch Paper of Perish'' সেই রকমই চ্যালেঞ্জ ছিল ২০১৪ সালে নতুন সরকারের কাছে ''Perform or Perish''। এর অনেক অংশে দায়ী ছিল পূর্বতর সরকার, যেমন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ধস (১৯৪৭-২০০৬)

**বিরোধীদের প্রথম প্রশ্ন হল হার ২০২০ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ঋণাত্মক কেন?**

**উত্তর:** GDP এর সংজ্ঞা একটি দেশের ভৌগোলিক সিমানায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উৎপাদিক মোট পণ্য ও পরিষেবার পরিমান। এখন বিরোধি রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ও সঘোষিত অর্থনীতিবিদের কাছে প্রশ্ন হল লকডাউনের এই ৩ মাসে আপনারা কতবাট পেট্রোল কিনেছেন? কতবার রেষ্টুরেন্টে খেতে গেছেন? কতবার জামা কাপড় কিনেছেন? কতবার বিমাণ পরিষেবা নিয়েছেন? তাহলে এই পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী ওঙ্গঞ্জ -র সংখ্যা আনবেন কি করে? আপনারা ঘরে বসে থেকে কোনো পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার না করলে অর্থমন্ত্রী কি চিনের মতো তথ্য

উৎপাদন করে GDP কে ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক করে দেবেন?

**বিরোধীদের দ্বিতীয় প্রশ্ন অতিমারির আগে আটটি ত্রৈমাসিক কও ফল উল্লেখযোগ্য ছিল না কেন?**

**উত্তর:** আমাদের GDP-র একটি বড় অংশে আসে পরিষেবা রপ্তানী থেকে (IT/ITES)। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের দেশে বেকারত্বর সমস্যা সমাধানের লক্ষে পরিষেবা আমদানীতে ২০১৭ থেকে কিছু শর্ত আরোপ করেছে ফলে ভারতের ওই দেশে রপ্তানী কমেছে (ঠিক এই কাজ আমরা সিমেন্ট, ইলেকট্রিক, ইস্পাত শিল্পে করেছি)। এই সমস্যার সম্মুখীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পণ্য সরবরাহকারী সব দেশকেই হতে হয়েছে (জার্মানী, ব্রিটেন, চিন, ফ্রান্স, জাপান সবাইকে)। উদাহরণ ২০১৯-২০-তে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের GDP বৃদ্ধির হার এতকম ছিল যে, ভারত এদের ছাড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে সপ্তম থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে।

**বিরোধীদের তৃতীয় প্রশ্ন হল নোট বন্দিতে ভারতের অর্থব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হল কেন?**

**উত্তর:** নোট বন্দি হওয়ার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিরোদ করতে রাস্তায় নেমে পড়ে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। RBI তথ্য অনুযায়ী Spevified Bank Notes (SBN) estimated value ১৫.২৮ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে ২৬ জুন ২০১৭ অবধি যেখানে ৮ নভেম্বর ২০১৬-তে outstanding SBN দিল ১৫.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা এবং মোট নোট circulation এর ছিল ১৭.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা। এই নোট বন্দির ফলে ১৫.২৮ লক্ষ কোটি টাকার মালিক ও তার ঠিকানা পাওয়া গেল এবং ট্যাক্সের আওতায় এসে গেল। ভুয়ো টাকা (Fake Currancy) যেটা ভারতের অর্থনীতিতে ছিল ৪৩.৩৩ কোটি, ২০১৬-১৭তে তা কমে ২০১৭-১৮ তে দাঁড়ায় ২৩.৩৫ কোটিতে এবং ২০১৮-১৯-এ তা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.২৪ কোটিতে।

Post Demonitisation লক্ষ নতুন কর দাতা যোগ হয়েছে এবং Income Tax return ফাইল বেড়েছে ২৪.৭% যেটা আগে ছিল ৯ । ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড্ বেড়েছে ৬৫ ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ফিরে আসেনি এবং ৩ লক্ষ টাকার উপর সব্ -র আওতায় এসেছে। ১ কোটি টাকার বেশি শ্রমিক EPF ও ESIC আওতায় এসেছে।

২ লক্ষ ১০ হাজার ভুয়ো কোম্পানী বন্ধ করা হয়েছে, ৩.০৯ লক্ষ Bound of Directors কে disqualify করা হয়েছে ২.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা IT investigation এর আওতায় এসেছে।

এই নোটবন্দি সংস্কারের ফলে ব্যবসায় কালো টাকার লেনদেন স্বাভাকি ভাবেই কমেছে। কালো টাকায় গড়ে ওঠা বহু ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমার কালো টাকাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে শিল্প ও বানিজ্য বৃদ্ধি করে দেসের 'হার বেসী রাখব নাদ্ধিক কালো টাকা ভারতের অর্থ ব্যবস্থা থেকে বের করে বারতের অর্থ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করব।

**বিরোধীদের চতুর্থ অভিযোগ হল ভারতের ৪৫ বছরের সর্বচ্চ বেকারত্বের হার ২০১৮-১৯ সালে এবং সেটা উর্ধ্বমুখী।**

**উত্তর:** যখন কোনো দেশের অর্থনীদি ৭.৩% (পাঁচ বছরের গড়) হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার multiplier effect কর্মস্থানে পড়তে বাধ্য। কিন্তু ভারতে কিছু বিরোদী রাজনৈতিক দল এবং কিছু সংবাদ মাধ্যম একটা ভুয়ো খবর অপ্রকাশিত খবর নিয়ে প্রচার করা শরু করে এবং দাবি করে যে বারতে ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার ২০১৮-১৯ সালে।

প্রথমত, এই দাবির কোনো ভিত্তি নেই কারণ কোনো সংস্থা এই রিপোর্ট পাবলিস করে নি।

দ্বিতীয়ত, আধার লিঙ্ক হয়োর ফলে ১.৪৭ কোটি MGNREGA ভুয়া Job Card holder সনাক্ত হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভুয়ে শিক্ষক সনাক্ত হয়েছে। ফলে এগুলোকে বিবেচনা করলে বোঝা যায় বাস্তবিক অর্থে এই সংস্থা কমে গেলেও দেশের বাস্তবিক বেকারত্বে কোনো প্রভাব পড়ে না।

তৃতীয়ত, ILO এর estimate অনুযায়ী UPA সরকারের ১০ বছরে গড় বেকারত্ব ছিল ৫.৫৪৮% এবং সেটা কমে ঞ্জঙ্গঙ সরকারের ৬ বছরের গড় ৫.৪৬৫ (জুন ২০২০) নিচে চিত্রে দেওয়া হল।

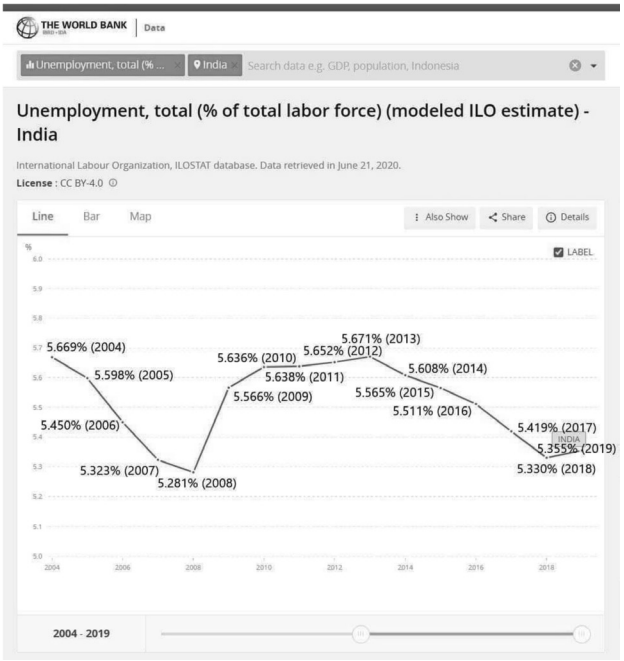

চতুর্থত UPA সকরারের ১০ বছরে মোট বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) এসেছে ৩০৪.০৬ বিলিয়ন (গড়ে ৩০.৪১ বিলিয়ন প্রতি বছর) এবং তা বেড়ে ৩১৮.৮৯ বিলিয়ন হয় NDA সরকারের ৫.৫ বছরে যার গড় (৫৭.৯৮ বিলিয়ন প্রতি বছর) এবং আমরা জানি FDI এর সাথে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক সরাসরি। নিচে চিত্র দেওয়া হল—

**II. FINANCIAL YEAR-WISE FDI INFLOWS DATA:**

**A. AS PER INTERNATIONAL BEST PRACTICES:**

(Data on FDI have been revised since 2000-01 with expended coverage to approach International Best Practices)

*(Amount US$ Million)*

| S. No. | Financial Year (April-March) | FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) | | | | | | Investment by FII's Foreign Institutional Investors Fund (net) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Equity | | Re-invested earnings + | Other capital + | FDI FLOWS INTO INDIA | | |
| | | FIPB Route/ RBI's Automatic Route/ Acquisition Route | Equity capital of unincorporated bodies # | | | Total FDI Flows | %age growth over previous year (in US$ terms) | |
| FINANCIAL YEARS 2000-01 TO 2019-20 | | | | | | | | |
| 1. | 2000-01 | 2,339 | 61 | 1,350 | 279 | 4,029 | - | 1,847 |
| 2. | 2001-02 | 3,904 | 191 | 1,645 | 390 | 6,130 | (+) 52 % | 1,505 |
| 3. | 2002-03 | 2,574 | 190 | 1,833 | 438 | 5,035 | (-) 18 % | 377 |
| 4. | 2003-04 | 2,197 | 32 | 1,460 | 633 | 4,322 | (-) 14 % | 10,918 |
| 5. | 2004-05 | 3,250 | 528 | 1,904 | 369 | 6,051 | (+) 40 % | 8,686 |
| 6. | 2005-06 | 5,540 | 435 | 2,760 | 226 | 8,961 | (+) 48 % | 9,926 |
| 7. | 2006-07 | 15,585 | 896 | 5,828 | 517 | 22,826 | (+) 155 % | 3,225 |
| 8. | 2007-08 | 24,573 | 2,291 | 7,679 | 300 | 34,843 | (+) 53 % | 20,328 |
| 9. | 2008-09 | 31,364 | 702 | 9,030 | 777 | 41,873 | (+) 20 % | (-) 15,017 |
| 10. | 2009-10 | 25,606 | 1,540 | 8,668 | 1,931 | 37,745 | (-) 10 % | 29,048 |
| 11. | 2010-11 | 21,376 | 874 | 11,939 | 658 | 34,847 | (-) 08 % | 29,422 |
| 12. | 2011-12 | 34,833 | 1,022 | 8,206 | 2,495 | 46,556 | (+) 34 % | 16,812 |
| 13. | 2012-13 | 21,825 | 1,059 | 9,880 | 1,534 | 34,298 | (-) 26% | 27,582 |
| 14. | 2013-14 | 24,299 | 975 | 8,978 | 1,794 | 36,046 | (+) 5% | 5,009 |
| 15. | 2014-15 | 30,933 | 978 | 9,988 | 3,249 | 45,148 | (+) 25% | 40,923 |
| 16. | 2015-16 | 40,001 | 1,111 | 10,413 | 4,034 | 55,559 | (+) 23% | (-) 4,016 |
| 17. | 2016-17 | 43,478 | 1,223 | 12,343 | 3,176 | 60,220 | (+) 8% | 7,735 |
| 18. | 2017-18 (P) | 44,857 | 664 | 12,542 | 2,911 | 60,974 | (+) 1% | 22,165 |
| 19. | 2018-19 (P) | 44,366 | 689 | 13,672 | 3,274 | 62,001 | (+) 2% | (-) 2,225 |
| 20. | 2019-20 (P) (up to SEPTEMBER, 19) | 26,096 | 331 | 6,537 | 1,936 | 34,900 | - | 4,531 |
| CUMULATIVE TOTAL (from April, 2000 to SEPTEMBER, 2019) | | 448,996 | 15,792 | 146,655 | 30,921 | 642,364 | - | 218,781 |

Source: (i) RBI's Bulletin for November, 2019 dt.11.11.2019 (Table No. 34 – FOREIGN INVESTMENT INFLOWS).
(ii) Inflows under the acquisition of shares in SEPTEMBER, 2011, August, 2011 & October, 2011, include net FDI on account of transfer of participating interest from Reliance Industries Ltd. to BP Exploration (Alpha).
(iv) RBI had included Swap of Shares of US$ 3.1 billion under equity components during December 2006.
(v) Monthly data on components of FDI as per expended coverage are not available. These data, therefore, are not comparable with FDI data for previous years.
(vi) Figures updated by RBI up to SEPTEMBER, 2019.Figures are provisional.
(vii) Data in respect of 'Re-invested earnings' & 'Other capital' are estimated as average of previous two years.
'#' Figures for equity capital of unincorporated bodies are estimates. (P) All figures are provisional

১৯৯১ তে দেশ থেকে লাইসেন্স রাজের অবসান ঘটিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমারাও। কিন্তু বাদ রেখেছিলেন একমাত্র কৃষি ক্ষেত্র। ফলে একদিকে শহর ও নগর এগিয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামীণ ভারত পরে আছে সেই বিংশ শতকেই। কিছু সোভিয়েত যুগের বস্তাপচা কৃষিবিপণন আইন এবং অসৎ সরকারিবাবু, নেতা ও ফোঁড়েদের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে, গ্রামের মানুষ দলে দলে পাড়ি দিয়েছে শহরের পরিকাঠামো বানানোর উন্নয়নযোগ্যে। কৃষিজীবি মানুষ পেটের দায়ে পরিণত হয় অদক্ষ শ্রমিকে এবং শ্রমদান করতে বাধ্য হয় অতি ন্যূনতম বেতনে। ২০২০ তে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গরুড় পাখির মত দেশের কৃষকদের এই আইনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করলেন এবং গ্রামীণ ভারতকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে পরিকাঠামো নির্মাণে এক ট্রিলিয়ন বিনিয়োগের অমৃত নিয়ে এলে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি ১৯৬৫ তে "জয় জওয়ান জয় কিষান" প্রকল্প শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, যা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তার অবর্তমানে তার উত্তরসূরিরা নেহেরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতিযুগের বিভিন্ন কৃষি ও কৃষিবিপণন আইন পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। উপরন্তু কৃষকদের রক্ত জল করা ফসল আয়ের উৎসহয়েদাঁড়িয়েছেনেতা, বাবু, ফোঁড়ে ও বাহুবলীদের। আমাদের দেশে ৪০% খাদ্য।ষ্ট হয় কোল্ড স্টোরেজ ও লজিস্টিকস পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং কিছু লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফোঁড়েদের অনৈতিক গড়াপেটার জন্য। ফলে, কৃষকরা শহরের পাড়ি দিয়েছেন বহুতল বাড়ি, মেট্রো রেল, সড়ক বা বিদ্যুৎ প্রকল্পেঠিকাকাজকরতে।

কৃষিবিপ্লবের পাঁচ দশক পরেও, আমাদের দেশের খাদ্যদ্রব্যমূল্য অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশের থেকে বেশী। আর এই মৌরসীপাট্টা বন্ধ করতেই তিনটি bill কেন্দ্র তিনটি বিল পেশ করেছে

**১. কৃষক উৎপাদন বাণিজ্য ও বাণিজ্য (পদোন্নতিও সুবিধা) বিল, ২০২০;**

**২. মূল্য নিশ্চয়তা ও খামার সেবা বিল, ২০২০ এর**

**৩. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) চুক্তি; এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) বিল, ২০২০।**

এগুলি এই বছরের ৫ জুন সরকারী অধ্যাদেশ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। এখন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিল পেশ হয়েছে। সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক বিলগুলোর মূল বিষয়গুলি।

**১. কৃষক উৎপাদনবাণিজ্য ও বাণিজ্য (পদোন্নতি ও সুবিধা) বিল ২০২০**

এই বিলে কৃষকদের বিজ্ঞপ্তিকৃত কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটির (এপিএমসি) বাইরেকৃষিবিক্রয়ওবিপণনকরার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেছে। রাজ্য সরকারগুলিকে এপিএমসি বাজারের বাইরে এই বাণিজ্যের জন্য কোনরকম বাজার ফি, সেস বা লেভি আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তঃ রাজ্য বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং কৃষিপণ্যের ইলেকট্রনিক বাণিজ্যের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করা। বিলের বিধান অনুযায়ী, খামারের পণ্য ব্যবসা করার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না, প্যান কার্ড ধারী যে কেউ এখন সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে কিনতে পারবেন।

**২.মূল্য নিশ্চয়তা ও খামার সেবা বিল, ২০২০ বিষয়ে কৃষক (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) চুক্তি**

এই আইন চুক্তিভিত্তিক কৃষি বিধি এবং রাষ্ট্রীয় এপিএমসি আইনে অভিন্নতা আনতে চায়। খামার পণ্য বিক্রয় এবং ক্রয়ের জন্য কিভাবে বাণিজ্য চুক্তি হবে তার রূপরেখা দিয়েছে। কৃষক এখন পারস্পরিক সম্মত মূল্যে যে কোন কর্পোরেট সংস্থা বা অন্য কারুর সাথে চুক্তি করতে পারবে। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং ক্ষমতায়নই এই বিলের লক্ষ্য।

**৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) বিল, ২০২০**

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাজারের প্রশাসনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে এই বিলে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা থেকে শস্য, ডাল, তৈলবীজ, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ এবং আলুকে অপসারণ করা হয়েছে। এতকাল এই সব খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন, চলাচল, গুদাম জাত করা এবং বন্টন সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণের ওপর চলতো। এতে ভোক্তার বিশেষ সুবিধা না হলেও, কৃষকদের চরম বঞ্চনার মধ্যে যেতে হতো।

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাধীনতার পর কৃষি সংস্কারে এটি সর্ব বৃহৎ পদক্ষেপ। কৃষকদের নোটিফায়েড মান্ডিদের বাইরে তাদের পণ্য বিক্রি করার অনুমতি দেয়, তার মানে এই বিল মান্ডির অস্তিত্ব বিলোপ করা নয়। কৃষকরা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য একটি অতিরিক্ত জায়গা পেলো। টাকা থাকলে যে কেউ বিক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। সর্বোচ্চ দরদাতাদের কাছেই কৃষক বিক্রি করবে। যদি বাইরের কোন বিক্রেতা না থাকে, কৃষক এখনও তাদের ফসল রাষ্ট্রীয় নির্ধারিত মূল্যে মাণ্ডীতে বিক্রি করতে পারে। অনেকে ভুলে গেছেন যে বিহার সরকার ২০০৬ সালে কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটি আইন বাতিল করে কৃষকদের বাজারে সরাসরি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে।

চুক্তি চাষের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, কনট্রাক্ট ফার্মিং উতাদনের পরিমাণ, গুণমান মান এবং খামার পণ্যের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কিত ক্রেতা এবং কৃষকদের মধ্যে চুক্তি গঠন করে। বিত্তবান ক্রেতা চাষের জন্য প্রয়োজন যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত উপদেশ প্রদান করতে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। আমদের দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিতে বিনিয়োগের যথাযত মূলধন, প্রযুক্তিগত পরামর্শ নেই। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ কৃষকের সাহায্যের জন্য সরকারী ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। একটি পারস্পরিক লাভজনক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেসরকারি খাতের সমর্থন প্রয়োজন যেখানে কৃষক এবং বিনীয়কারী উভয়ই লাভ করে। ইচ্ছে করলে, রাজ্য সরকার ও বিধি বদ্ধ সংস্থা গড়ে সাধারণ কৃষকের সাথে চুক্তি চাষ করতে পারে। কৃষিতে নতুন সম্পদ গঠন, কৃষকদের নতুন দক্ষতায় শিক্ষিত করে উৎপাদন বাড়ানোই এই বিলের লক্ষ্য, এতেই কৃষকদের ক্ষমতায়ন সম্ভব।

ভারতবিরোধী ও বংশবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি ও এজেন্টরা ভুয়ো খবর ছড়ানো এবং তার ভিত্তিতে দোষারোপ করা রপ্ত করেছে কারণ আদর্শগত ভাবে জাতীয়তাবাদের সাথে লড়াইয়ে অপারক। এবং এই জাতীয়তাবাদী সরকার কোভিড পরবর্তী ভারতবর্ষের জন্য যে ব্যাঙ্কিং ও কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার করেছে, তার জন্য ইতিহাস চিরদিন মনে রাখবে। কুৎসার ফলে দেশবাসী নরসিমহা রাও জি ও অটল জি-কে প্রত্যাক্ষান করেছে কিন্তু আজ তাদের মাহাত্য বুঝঝে। কিন্তু আজ যদি আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির সঠিক মূল্যায়ন না করতে পারি তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

**লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক**

# নতুন কৃষি বিল যুক্তি ও বিশ্লেষণে

অম্লানকুসুম ঘোষ

আকাশ বাতাস জুড়ে আচমকাই গেলো গেলো রব। সংবাদমাধ্যমের পাতা থেকে সংসদের গান্ধীমূর্তি সমস্তই আজ তোলপাড়, কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত কৃষি বিল নাকি ভারতীয় কৃষকদের সর্বনাশ করবে, কৃষকরা নাকি হয়ে যাবে কর্পোরেটের হাতের পুতুল, তাই হতদরিদ্র কৃষকরা এসি গাড়ী করে এসে নতুন ট্রাক্টর পুড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে। ঘুম উড়ে গেছে শরদ পাওয়ার থেকে সুপ্রিয়া সুলে বহু হতদরিদ্র কৃষকের। কিন্তু কি এমন আছে এই কৃষি বিলে?

কৃষি বিলে কৃষকের কি প্রকৃতই উপকার হবে? নাকি পুরো লাভের গুড়টাই খেয়ে যাবে কর্পোরেট সংস্থাগুলি? এ প্রসঙ্গে দেখা যাক, এতদিন আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থা কেমন ছিল। কৃষক মূলত ছিল উৎপাদক। উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন কৌশল এবং কি উৎপাদন করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কৃষকের নিজস্ব। কিন্তু উৎপাদন হয়ে যাবার পর উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার সময় আসতো বিপণন ব্যবস্থার ভূমিকা।

আর এখানেই শুরু হতো ফড়েদের রাজত্ব। ফড়েদের নিজস্ব সিন্ডিকেট রাজ। যার বাইরে কেউ কৃষকের কাছ থেকে মাল কিনতে পারতো না। কৃষকরা বাধ্য থাকত সেই ফড়েদের কাছেই ফড়েদের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রি করতে। আসল উৎপাদক কৃষক কিন্তু ফসলের মূল্যের নির্ধারক ছিল না। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যিই খুব অদ্ভুত। অর্থনীতির যে কোনো ক্ষেত্রেই কোন বস্তুর যিনি উৎপাদক তিনিই স্থির করেন সেই বস্তুর মূল্য কত হবে একমাত্র কৃষিক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। যেখানে উৎপাদকের হাতে ছিল না উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ, কৃষিক্ষেত্রে ফড়েদের এই রাজত্ব চলে আসছে বহুকাল ধরেই। ফড়েদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্যই মান্ডির ব্যবস্থা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থা ইত্যাদিগুলি স্থিরীকৃত হয়েছিল কিন্তু এগুলো কৃষকদের শোষনের হাত থেকে মুক্তি

দিতে পারেনি কারণ মান্ডিতেও দেখা গেছিল সেই ফড়েদেরই রাজত্ব।রজতচক্রের বিনিময়ে তারা সরকারি কর্মীদেরও নিয়ন্ত্রণ করত আর  ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্দিষ্ট কিছু ফসলের ক্ষেত্রে পাওয়া যেত।এছাড়াও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সত্যিই ন্যূনতম থাকতো ,ফসল বাজারজাতে হবার পরে যে লাভ হত কৃষক তার অংশ হতো না অথচ এই কৃষিপণ্যই যখন বাজারে আসত এবং সাধারণ ক্রেতা যখন সেই কৃষিপণ্য কিনতে যেত তখন ফসলের অগ্নিমূল্য মাঝের এই বিপুল সম্পদ চলে যেত মধ্যস্বত্বভোগী ফড়ে, আড়তদার, পাইকার এবং কিয়দংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হাতে।  এহ বাহ্য, বিভিন্ন কৃষিপণ্য ঘুরপথে ফড়েদের কাছ থেকে কিনে সেই পণ্যই প্রক্রিয়াকরণ করে বিপুল দামে বাজারজাত করে ভারতীয় বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নিয়ে যেত বিদেশি কোম্পানিগুলো। উৎপাদিত আলুর পাইকারি মূল্য কেজি প্রতি ১ টাকা থেকে ৩ টাকার বেশি কখনোই পেত না। কেনার  সময় কিন্তু সেই আলুই বিকোত ৩০-৩৫ টাকা দরে আর বহুজাতিকগুলি সেই আলুকেই সামান্য প্রক্রিয়াকরণ খরচ যোগ করে যখন বাজারে বিক্রি করে চিপস হিসেবে তখন তার দাম দাঁড়ায় হাজার টাকা কিলো।রূপকথায় একটা গল্প ছিল না ,কোনো এক রাজপুত্রের চোখের জলে মুক্ত ঝরে, এখনকার কৃষকদের পরিস্থিতিতে  এর অর্থ হলো  কৃষকের চোখের জল মুক্তঝরা আর সেই  মুক্ত জড়ো হয় আড়তদার পাইকারদের গদীতে। এই অচলায়তনের কি পতন ঘটবে না? এই প্রশ্ন এতদিন জাগ্রত ছিল কৃষকের মনে আর এই অচলায়তনের পতন ঘটানোর জন্যই এসেছে এই আঘাত আর অচলায়তনে আঘাত এলে গেল গেল রব তো উঠবেই প্রত্যাঘাত তো হবেই সেই গেল গেল রব সেই প্রত্যাঘাতের নমুনা দেখা যাচ্ছে গোটা দেশজুড়ে। তাইতো দেখা যাচ্ছে তথাকথিত দরিদ্র কৃষকরা সদ্য কেনা ট্রাক্টর পুড়িয়ে নাকি বিক্ষোভে শামিল হচ্ছে, শত কোটির ওপর উপার্জনকারী তথাকথিত দরিদ্র কৃষকরা একের পর এক প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। কি আছে এই কৃষি বিলে যাতে এইসব দরিদ্র কৃষকরা এত প্রতিবাদ করছে? একটু দেখা যাক।

কৃষি বিলে কৃষককে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়ার এবং কর্পোরেটের কাছে নিজের ইচ্ছেমত ফসল বিক্রি করার। কর্পোরেটের সঙ্গে কৃষকের চুক্তি হবে, সেই চুক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষকের নিজের ইচ্ছাতে সম্পাদিত হবে এবং সেই চুক্তিতে কৃষি জমি হস্তান্তর বা রূপান্তর কখনোই করা যাবে না সেই উল্লেখও চুক্তির পাঁচ নং ধারায় রয়েছে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে কৃষিজমি কর্পোরেট গ্রাস করে নেবে সেই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা যায়।তাহলে শুধুমাত্র ফসল চাষের সময় কর্পোরেটের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া অগ্রিম দাদন নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ফসল চাষ করার সহায়তা কৃষক পেতে পারে এবং সেই ফসলের বাজারজাত  করার সময় কর্পোরেটের কাছে বাজারজাত করতে পারে। এই প্রশ্ন উঠতে পারে, চুক্তিতে যদি কর্পোরেট ফসলের কম মূল্য দিয়ে কৃষককে ঠকায়? চুক্তিতে কিন্তু ফসলের মূল্য প্রথমে উল্লেখিত থাকবে অর্থাৎ ফসলের মূল্য পছন্দ না হলে কৃষককে চুক্তিতে যাবে না।

কৃষি বিলকে অনেকেই নীলকরের সঙ্গে কৃষকের চুক্তির সঙ্গে তুলনা করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীলকরের সঙ্গে কৃষক চুক্তি করতে বাধ্য ছিল এখানে কিন্তু কৃষক চুক্তি করতে বাধ্য নয় তার ইচ্ছে সে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তি করবে কি করবে না এবং চুক্তি না করে শুধুমাত্র ফসল বিক্রি করার সময়ে সে কর্পোরেটের কাছে ফসল বিক্রি করতে পারে তার নিজের ইচ্ছেতে, যদি সে মনে করে কর্পোরেট তাকে ফসলের অধিক মূল্য দিচ্ছে তবেই। এতে কৃষকের লাভ হল যে সে ফের  কাছে কম মূল্যে ফসল বিক্রি করার হাত থেকে বাঁচল। এখন সে  কারো কাছেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য নয় সেটাও তার ইচ্ছাধীন। আসলে কর্পোরেট শোষণ করবে কি করবে না সেটা নির্ভর করে আইনের উপর এবং প্রশাসনের ওপর। আইন যদি কর্পোরেটকে মনোপলি বা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে তাহলে সে শোষণ করবে যেমন নীলকররা করত, বর্তমান কৃষি বিল কর্পোরেটকে মনোপলি  বা একচেটিয়া অধিকার অধিকার প্রদান করছে না বরং তার চুক্তি বা বিপণন নির্ভর করছে কৃষকের সম্মতির উপর সে ক্ষেত্রে শোষণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।বরং  ফড়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং কর্পোরেটদের নিজেদের  মধ্যের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ফসলের মূল্যবৃদ্ধির একটি সম্ভাবনা থেকে যায় ,এতে কৃষক লাভবান হয়। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে গত ৬ বছর ধরে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তি চাষ কিন্তু আইনসম্মত।

ইতিমধ্যে মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির মত কর্পোরেটরা কিন্তু বিভিন্ন কৃষকের সঙ্গে চুক্তিতে চাষ করিয়ে তাদের ফসল বিক্রি করছে এবং কৃষকরাও কিন্তু ভালোই লাভবান হচ্ছে। এই বিলের ফলে যদি বিগবাজার থেকে রিলায়েন্স ফ্রেশ ও নামে তাতে আখেরে কৃষকদের পক্ষেই সহায়ক হবে।  এছাড়াও এই কৃষি বিলে কৃষককে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে নিজের রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যেও নিজের ফসল বিক্রি করার। এই স্বাধীনতা যখন কৃষক পাচ্ছে তখন অন্য রাজ্যের সম্ভাবনাময় বাজারের কথা ভেবে সে নিজের ফসলের অধিক উচ্চ মূল্য ধার্য করতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু ফসলের উৎপাদক কৃষক ফসলের মূল্য নির্ধারক হয়ে গেল। এটাকে অর্থনীতির এক যুগান্তকারী পরিবর্তন বলা যেতে পারে।

তাহলে এই বিলের এত বিরোধিতা কেন? কারাই বা করছে?

বিরোধিতা তারাই করছে যাদের স্বার্থে ঘা লেগেছে। বিরোধিতা করছে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত  এই ফড়ের দল,  যারা এতোদিন কৃষককে শোষণ করেছে নিজেদের ইচ্ছামত। তাইতো দেখা যাচ্ছে এই বিরোধিতায় কোন প্রকৃত কৃষক শামিল নেই, শামিল হয়েছে শুধুমাত্র ফড়েরা। সাধারণ মানুষকে এ জন্য সতর্ক

থাকতে হবে। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কি এবং উপস্থাপিত বিকৃত তথ্য কি সে ব্যাপারে অবহিত হতে হবে তবেই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা গৃহীত একটি সঠিক সিদ্ধান্ত সঠিক হবে প্রণীত হতে পারবে।

তবে একটি বিষয়ে আরেকটু সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সেটি হল, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উল্লেখ এই বিলে রাখা উচিত ছিল।যদিও বলা আছে যে চুক্তি কৃষক এবং কর্পোরেট-এর মধ্যে হবে উভয়ের সম্মতিতে এবং সেখানে যে মূল্য উল্লিখিত থাকবে সেই মূল্যেই কর্পোরেটকে কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে তবুও সেই মূল্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সমান বা বেশি হবে সে কথাটি বিলে উল্লেখ নেই। একথা সত্য যে কৃষক নিজের সম্মতিতে চুক্তি সই করবে কাজেই মূল্য কম হলে চুক্তিতে যাবে না এবং সব ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হয়ও না। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশের কৃষকরা অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং আইনের ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদের যে সব ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আছে সেই ধরনের কোন ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে কম মূল্যে বিক্রি করার জন্য চুক্তি সই করিয়ে যদি তাকে প্রতারণা করে তার থেকে রক্ষা পাবার সুরক্ষা কবচ যদি এই বিলে থাকতো অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যাপারটি উল্লেখ থাকতো তাহলে আরো ভালো হতো। সুধীজন আশা করবেন এই বিলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কথাটি প্রবেশ করিয়ে সামান্য সংশোধন করে বিলটিকে আরো সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ বর্তমান কৃষি বিলের এই একটিমাত্র ইস্যুতে আপত্তি জানিয়েছে। তাদের মতে, এই একটিমাত্র ত্রুটি সংশোধন করে নিলে বর্তমান কৃষি বিল দেশের এবং বিশেষ করে দেশের কৃষকসমাজের সম্পূর্ণ উপকার করতে সমর্থ হবে। বিরোধিতা বিভিন্ন প্রকার হয়। এক, গঠনমূলক বিরোধিতা যা ত্রুটি খুঁজে বার করে তা সংশোধন করে আরও উন্নত হতে সাহায্য করে। দুই, ধ্বংসাত্বক বিরোধিতা যা সর্বাত্মক বিরোধিতা করে সমূহ ধ্বংসের কারন হয়। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের বিরোধিতা প্রথম শ্রেণীর অর্থাত গঠনমূলক বিরোধিতা , বিরোধী দলগুলির ও সংবাদমাধ্যমের মত ধ্বংসাত্বক বিরোধিতা নয়। সরকারকে এই দুই শ্রেণীর বিরোধিতার মধ্যে প্রার্থক্য নিরূপণ করেই এগোতে হবে। বিরোধী দলগুলির ও সংবাদমাধ্যমের ধ্বংসাত্বক বিরোধিতাকে সমূলে দমন করতে হবে ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের গঠনমূলক বিরোধিতা থেকে আত্মসংশোধন করতে হবে। তবে বর্তমান সরকারের সে সদিচ্ছা থাকায় আগামীতে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে বলাই যায়।

**লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক**

# কৃষিবিল ২০২০

## সোমনাথ গোস্বামী

গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রবল অনীহা।দীর্ঘদিনের অচলায়তন কে আঁকড়ে ধরে ভোটব্যাংক নির্ভর রাজনীতিই তাদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।মোদী সরকারের কৃষি বিল নিয়ে সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আবারও একবার উপরের চিত্রটি পরিস্কার হয়।আজ যারা এই বিলের বিরোধিতা করে দেশ জুড়ে আন্দোলন করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন।স্বাধীনতার পর থেকে আপনারা কৃষকদের কল্যানে যদি এতো তৎপর ছিলেন তবে স্বাধীনতার সাত দশক পরেও কেন এই দেশে প্রতি বিয়াল্লিশ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করে?কেন দেশের ৪০ু কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য যে কোনও পেশায় যেতে চান?কেন মোট চাষযোগ্য জমির পরিমানের নিরীখে আমরা বিশ্বে সপ্তম হলেও একর প্রতি উৎপাদনে আমাদের স্থান আফ্রিকার কিছু দেশেরও নীচে ?আমাদের কাছে এতো শস্য শ্যামলা ভূমি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের খাদ্যশস্য রপ্তানির বাজারে আমাদের উপস্থিতি কেন নগণ্য?উপরের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এদেশের প্রথম সারির প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছেই আছে।তারা জানেন এদেশে প্রতি বছর ৯০০০০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য মজুত করার পরিকাঠামোর অভাবে নষ্ট হয়।তারা এটাও জানেন এদেশের কৃষকদের মাথাপিছু জমির পরিমান মাত্র ১.০৮ হেক্টর, এত স্বল্প জমিতে শুধুমাত্র গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করে কোনও কৃষক সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারার মত আয় করতে পারেন না।কিন্তু তারা জ্ঞানপাপী।তারা সব জেনেও কিচ্ছুটি করবে না।কারণ কৃষক যত গরিব হবে সে যত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হবে,ততো তাকে সামান্য কিছু দান খয়রাত করে তার ভোট টা খুব সহজে পাওয়া যাবে।বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যেখানে উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর প্রায় ৫০ু প্রক্রিয়করণের ব্যবস্থা আছে,আমাদের দেশে তা ৫ু।কেন এই অবস্থা? কারণ স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে সেই অর্থে কোনও বেসরকারি বিনিয়োগ হয় নি আর বিনিয়োগ হয় নি কারণ কোনও বেসরকারি সংস্থা কৃষক দের সাথে সরাসরি চুক্তির ভিত্তি

তে ফসল ক্রয় করতে পারতো না।

ভারতের কৃষকদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করতে গেলে তাদেরকে সংগঠিত করে সংঘবদ্ধ কৃষিকাজ ও উদ্যানপালন ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই।সংঘবদ্ধ পদ্ধতিতে চাষ করলে তারা সল্পমূল্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাথে যুক্ত হতে পারবে,ফলে একর প্রতি ফলন বাড়বে আর পূর্বনির্ধারিত মূল্যে চুক্তি চাষ করলে ফসল উৎপাদনের পর তা বিক্রি করার দুশ্চিন্তা থেকে কৃষকরা মুক্তি পাবে।মোদি সরকারের প্রস্তাবিত তিনটি কৃষি বিলে ঠিক এই জিনিসটাই মাথায় রেখে করা হয়েছে।

প্রথমটি হলো ফার্মারস প্রোডিউস ট্রেড এন্ড কমার্স বিল

যে এপিএমসি আইন কে কিছুটা বদলে কৃষকদের দেশের যে কোনও জায়গায় নিজের উৎপাদিত ফসল বিক্রির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।এতদিন কৃষকরা শুধুমাত্র সরকার নির্ধারিত কৃষিবাজারে ফসল বিক্রি করতে পারতো।এখন সেই ব্যাবস্থার পাশাপাশি খোলা বাজারে দেশের যে কোনও প্রান্তে ফসল বিক্রির স্বাধীনতা পেল কৃষকরা, ফলে তাদের কাছে বিরাট বাজার উম্মুক্ত হলো যাতে তাদের নিজেদের ফসলের দর কষাকষির জায়গাটা মজবুত হলো।

দ্বিতীয় বিলটি হলো ফার্মারস এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস আসুরেন্স এন্ড ফার্ম সার্ভিস বিল যা কৃষকদের চুক্তিচাষ কে বৈধতা দিলো এবং যে কোনও চুক্তির ক্ষেত্রে কৃষকদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য মহকুমাশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় বিলটি হলো এসেনশিয়াল কমডিটিস আমেন্ডমেন্ট বিল।যেটা নিয়ে বিরোধীদের বিস্তর অভিযোগ।এর ফলে নাকি খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাবে।তাদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে এখন তো রাজ্যে বিলটি লাগু হয় নি তাও কেন প্রতিবছর আলু,পেঁয়াজ, টমেটো সহ অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় সব্জির দাম লাগাম রাখতে মুখ্যমন্ত্রী কে নিজে বাজারে বাজারে ঘুরতে হয়? কারণ টা পরিষ্কার আগেই বলেছি আমাদের দেশে কৃষিপণ্য সংরক্ষনের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে ফলে ফসল উৎপাদনের মরশুমে বাজারে প্রচুর যোগানের কারণে কৃষকদের সল্পমূল্যে তা বিক্রি করতে হয়,অন্য দিকে অসময়ে যোগান কম থাকার জন্য বাজারে সব্জি অগ্নিমূল্য হয়ে যায়।এখন কোনও সরকারের পক্ষেই দেশের উৎপাদিত সমস্ত ফসলের সংরক্ষন করার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়,তার জন্য প্রয়োজন বেসরকারি পুঁজি।কিন্তু কোনও বেসরকারি সংস্থা কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে সংরক্ষণের পরিকাঠামো কেন তৈরি করবে যদি তারা ইচ্ছেমতো মজুত করার স্বাধীনতা না পায়?তাই অত্যাবশ্যক পণ্যের আইন বদলের দরকার ছিল।কিন্তু তার মানে এই নয় যে খাদ্য নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না।কোনও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দ্বিগুন হয়ে গেলে সরকার তার মূল্য নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করার কথা সংশোধিত আইনে বলা আছে।এ তো গেল বিলের কথা যা সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে।কিন্তু সংবাদমাধ্যম যা দেখাচ্ছে না তা হলো কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০০ কোটি টাকা খরচ করে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশ জুড়ে ১০০০০ কৃষক উৎপাদক সংগঠন বা ফার্মারস প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে এছাড়া এক লক্ষ কোটি টাকার একটি কৃষি পরিকাঠামো তহবিল গঠন করা হয়েছে।অর্থাৎ কৃষক দের সংঘবদ্ধ করে তাদের কে আধুনিক প্রযুক্তি, সার ,বীজ কীটনাশক সল্পমূল্যে পাওয়ায় ব্যবস্থা করিয়ে তাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও ফসলের গুনগত মান বাড়িয়ে তাদের উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা এই পুরো প্রক্রিয়া টা নিরঙ্কুশ ভাবে সংগঠিত করতে যা যা সম্ভাব্য করার দরকার সেটা করার চেষ্টা হয়েছে।যারা বলছেন চুক্তি চাষে নাকি কৃষকরা কর্পোরেটদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে তারা হয়তো জানেন না এদেশের ৬৬ু পোল্ট্রি ও ৯০ু কফি চুক্তির ভিত্তিতে চাষ হয় যাতে কৃষকরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে,এছাড়া জ্জ্ঞঙ্খ ত্বদ্রন্ড্রখন প্রায় দুদশক ধরে ৪০ লক্ষ কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সরাসরি কিনে নিয়ে তাদের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে সাহায্য করেছে।কাজেই বেসরকারি সংস্থা কৃষি ব্যাবস্থায় ঢুকলে কৃষকরা আরও অসহায় ও দুর্বল হবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই।আর খাদ্যদ্রব্যের বাজার কে একচেটিয়াকরণকরে কর্পোরেটগুলো নাকি খাদ্যদ্রব্যের দাম কে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যাবে বলে যে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে তা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তার একটা উদাহরণ হলো মধু। মধু উৎপাদনের সঙ্গে এদেশে মাত্র আড়াই লক্ষ মানুষ যুক্ত আছে এবং মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ করার কাজটি দেশের বিরাট ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়েও হয় না তা সত্ত্বেও মধু কে কোনও কর্পোরেট আজ পর্যন্ত একচেটিয়া করতে পারলো না আর ধান,গম,পেঁয়াজ,আলু ডালের মতো ফসলে যেখানে কোটি কোটি মানুষ যুক্ত,প্রতিটি রাজ্যে এমনকি প্রতিটি জেলায় যে ফসলের গুণগত চরিত্র আলাদা এবং যে ফসল গুলোকে গুদামজাত করতে কয়েক লক্ষ কোটি বিনিয়োগ দরকার তা কি করে একচেটিয়া করা যায় তার উত্তর টা কি বিরোধী দলগুলি দেবেন?

কাজেই শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা বন্ধ করুন।দেশের আত্মনির্ভর হওয়ার পথ চলায় নিজেদের কে সহায়ক করে তুলতে না পারলেও অন্তত নিষ্ক্রিয় রাখুন,অন্তরায় হতে দেবেন না,তাহলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না।

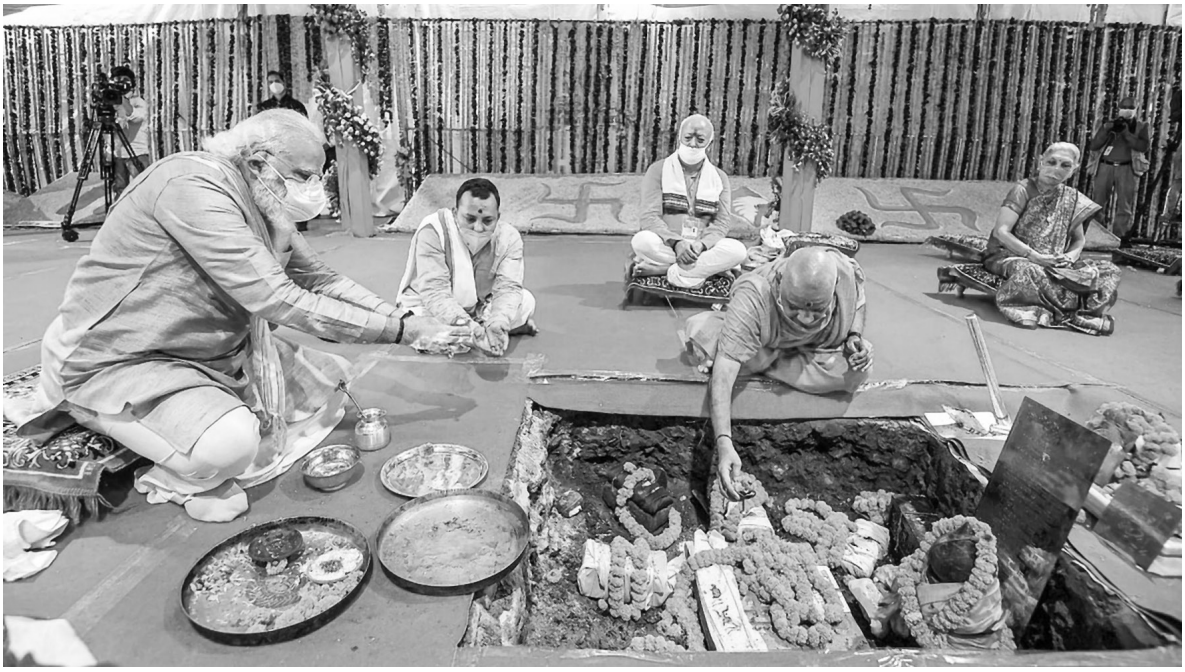

# ক্ষমতার অলিন্দে রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু যখন রাম মন্দির

দেবযানী হালদার

অনেকেই বলতেন রাম জন্মভূমি আন্দোলন নাকি বিজেপির শুধুই ক্ষমতায় আসার চাল ছিল। কংগ্রেসী নেতারা তো ভরা টিভিতে বিজেপিকে খোঁটা দিয়ে বারবার বলতেন "রাম মন্দির বানায়েঙ্গে, লেকিন তারিখ নেহি বাতায়েঙ্গে"। আবার তাদেরই উকিল সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে রাম মন্দিরের রায়দানের তারিখ পিছোনোর জন্য। আগে প্রথাগত মিডিয়ার যুগে অনেক খবর ই চাপা থাকত, কিন্তু সোশাল মিডিয়ার ভাইরালের চোটে আজ সবার কাছে তাদের সমস্ত চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। সেখানেই পাবলিক ধরে ফেলছে তাদের ভন্ডামি। রাম মন্দিরের শিলানাসের সাথে সাথে বিরোধীদের দ্বিচারিতা বেলুন গেছে ফুটো হয়ে। মানুষ বুঝে গেছে ও যাচ্ছে যে কারা প্রকৃত হিন্দু আর কারা রাজনীতির জন্য কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধরার মতো হিন্দু সাজছে।

সংঘ বিচার পরিবারের রাম নিয়ে ভাবনা বরাবরই পরিস্কার। রাম এই দেশের অখন্ডতার প্রতীক। মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধায় মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণ আমাদের ইতিহাস। আমাদের কাছে তাই রাম সর্ববৈ সত্য। রামের সত্যতা নিয়ে, রামের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রমাণের কোন অভাব নেই। রামের নিষ্ঠা, ন্যায় রামকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যখন

মানুষ সেই বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করেছে। সেই শ্রদ্ধা কখন যেন ভক্তিতে পরিণত হয়েছে আর বহুত্ববাদ হিন্দু ধর্মে রাম দেবতায় পরিণত হয়েছে। দেবতা রামের জন্মস্থান মানুষের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। মানুষ সরযূ নদীতে অবগাহন করেছে। অযোধ্যায় পরিক্রমা করেছে যুগে যুগে হাজার হাজার বছর ধরে যার প্রমাণ থেকে গেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণে, মুসলিম লেখকদের বিবরণে, ইংরেজ আমলে বিভিন্ন গেজেটিয়ারে। অতএব রামের মন্দির ছিল তাই নিয়ে সংশয় থাকার কোন কারণ ছিল না। হিন্দু ধর্মের প্রতি ন্যূনতম জ্ঞান যাদের আছে, আস্থা যাদের আছে, তারা জানে রাম মন্দির তাঁর জন্মস্থানেই ছিল। কোন এক কালে যখন অযোধ্যার রাজা দশরথের রানী কৌশল্যা যে প্রসূতি গৃহে রামের জন্ম দিয়েছিলেন, কালক্রমে তাই রাম জন্মস্থান মন্দির হয়ে গিয়েছিল। ঠিক যেমন কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেবের ভূমিষ্ঠ হবার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের সামনে গিয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে আপামর মানুষ ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায়।

কিন্তু মুঘল আমলে যখন এই মন্দির ভেঙে একটি মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বারবার তাকে মুক্ত করার জন্য রক্ত ঝরিয়েছে রামের ভক্তের দল যাদের কাছে ''রোম রোম মে রাম হ্যায়''। সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস আমরা পাই তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে। সিপাহী বিদ্রোহের আগে বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণ ও গেজেটিয়ার থেকে বোঝা যায় অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরে হিন্দুদের প্রবেশ ছিল অবাধ। তাদের পূজা-অর্চনার অধিকার বন্ধ হয় নি। মসজিদ নির্মাণের পর বরঞ্চ একটা বিবরণীতেও মুসলিমরা নামাজ পড়ছে, এমন কোন তথ্যপ্রমাণ নেই। তবুও ১৮৫৫ সালে যখন ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বেঁধেছিল তার কারণ কিন্তু ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে অপসারণ করে সমগ্র অবধ প্রদেশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আনা ছিল প্রধান কারণ। ব্রিটিশ শাসকরা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল। আর সফল হয়েছিল হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরতরে লড়াইয়ের সূত্র রেখে দেওয়ায়। রাম মন্দির উদ্ধার করার জন্য বহু মামলা হয়েছে, বহু দাঙ্গা হয়েছে যার ইতিহাস দীর্ঘ।

কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে যে রাজনীতির নোংরা খেলা অযোধ্যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তা সত্যি অভাবনীয়। রাম মন্দির উদ্ধারের জন্য অযোধ্যায় বৈরাগী সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সংকল্প নিয়েছিল। তাদের কাছে রামের মাহাত্ম্য রামের জন্মস্থান উদ্ধার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতার পর উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ বিধানসভায় বিধায়ক ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব যিনি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গেলে নতুন করে নির্বাচন হয়। এই উপ নির্বাচনকে ঘিরে অযোধ্যা সেই প্রথম রাজনৈতিক কারণে উত্তাল হয়ে ওঠে।

নরেন্দ্র দেব সোশালিস্ট হবার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বাবা রাঘব দাস কে নির্বাচনের টিকিট দিয়েছিলেন। রাঘব দাস কট্টর হিন্দুত্ববাদী ছিলেন, সাধুসন্ত সমাজে তার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। অযোধ্যায় যখন রাম মন্দির উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছিল, সর্বত্র বাবা রাঘবদাস রাম মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতলেন। এরপর ১৯৪৯ সালে ২২-২৩ শে ডিসেম্বরের রাতে যখন বিতর্কিত কাঠামোয় রামলালার মূর্তি স্থাপিত হয়, তখন দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সেই মূর্তি সরানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল ''এদেশের মুসলিমদের প্রতি খারাপ ব্যবহার হলে তিনি পাকিস্তানের কাছে জবাব দিতে পারবেন না।'' অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগের থেকে প্রতিবেশী পাকিস্তানের ধর্মীয় ভাবাবেগের মূল্য তাঁর কাছে বেশি ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু লীগপন্থী রাজনীতির নামে মুসলিম তোষণ অব্যাহত থাকল। যার ফল সুখকর হয় নি।

ধীরে ধীরে কংগ্রেসের তোষণ নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়তেছে থেকেছে। আইনি লড়াই শুরু হয় ১৯৫০ থেকে। ১৯৬১ সালে সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড রাম মন্দিরের সম্পূর্ণ মালিকানা দাবি করে মামলা করে ফৈজাবাদ সিভিল জাজ কোর্টে। একদিকে আইনের লড়াই চলতে থাকে। অন্যদিকে সাধু সমাজ ও হিন্দু সমাজে মন্দির উদ্ধারের পরিকল্পনাও চলতে থাকে লাগাতার। কংগ্রেসের তরফ থেকে যখন কোনো ভাবেই কোন সদিচ্ছা পাওয়া যায় নি, তখন সাধুসন্ত সমাজ আন্দোলনের মাধ্যমে রাম মন্দির উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এর মধ্যে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গঠন হয় ১৯৬৪ সালে। প্রথম ধর্ম সংসদ দিল্লিতে ১৯৮৪ সালে। সেখানে কি করে রথ যাত্রার মাধ্যমে জনজাগরণ করা যায়, রাম মন্দির নিয়ে জনচেতনার উন্মেষ করা যায় তার পরিকল্পনা হয়েছে। সেই জনচেতনার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে রথযাত্রায় বিহারের সীতা মারি থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত এই বিস্তৃত পথে মানুষের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ দেখা যায় তার থেকে রাম মন্দিরের গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হয় না। যদিও সেবারে রথযাত্রা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার জন্য মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেলেও জনমানসে যা প্রভাব রেখে যায় তা অভাবনীয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসেন ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীব গান্ধী।

রাজীব গান্ধীর সময় সারা ভারত দুটো দুর্ঘটনায় নড়ে গিয়েছিল ১. মীনাক্ষীপুরমের গণ ধর্ম পরিবর্তন আর ২. ইন্দোরের এক মুসলিম মহিলার স্বামীর কাছে তালাক পাবার পরেও খোরপোষ চেয়ে মামলা করে কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া। যা শাহবানু মামলা নামে খ্যাত।

সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় অসহায় পাঁচ সন্তানের মা মধ্যবয়সী শাহবানুর জন্য মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বিরুদ্ধে গিয়ে খোরপোশের জন্য রায় দেয়। সেই রায়ে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র ধর্মের জন্য এই দেশের কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব মুসলিম সমাজে ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। মুসলিম সমাজকে শান্ত করার জন্য "মুসলিম মহিলা বিল" নিয়ে এসে রাজীব গান্ধীর সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচার ব্যবস্থাকে কাঠ গড়ায় তুলেছিলেন। শরীয়ত অনুযায়ী মুসলিম মহিলার তালাকের পরে স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পায় না। তখন তার দায়িত্ব ওয়াকফ বোর্ডের কাছে থাকবে যদিও বাস্তবে তা কখনোই হয় নি। কিন্তু এই "মুসলিম মহিলা বিল" আনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের কাছে কংগ্রেসের মানসিকতা ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে।

কংগ্রেস যে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও অন্য আইন দিয়ে বদলাতে পারে, একই দেশে শুধুমাত্র ধর্মের জন্য বৈষম্যমূলক দুই আইন থাকতে পারে, তা সাধারন মানুষের ভাবনার অতীত ছিল। শাহবানু মামলা কংগ্রেস যেমন মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করেছিল, ঠিক তেমনি মুসলমানদের শান্ত করতে গিয়ে "মুসলিম মহিলা আইন" মেনে হিন্দুদেরকেও ক্ষুব্ধ করে ফেলে। অন্যদিকে এরপরের রথ যাত্রার জন্য রাম মন্দির যে হিন্দুর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণ হয়ে যায় রাজীব গান্ধী যখন গদি বাঁচানোর জন্য, হিন্দুদের ভোটের জন্য, তাদের শান্ত করার জন্য রাম মন্দির মামলায় প্রথম মাথা গলায়। যে রাম মন্দির এতদিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হবে বলে তালা বন্ধ ছিল, শুধুমাত্র পূজারী ছাড়া কারোর ভিতরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। গরাদের বাইরে থেকে হিন্দু তার প্রিয় রামলালার দর্শন করতো হঠাৎ করে সেই তালা খুলে দিতে সচেষ্ট হল। কারণ ভোট বড় বালাই। বহু মানুষ প্রতিবছর তালা খোলার জন্য কোর্টে আবেদন করলেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হলফনামা দিয়ে বলা হত যে সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য তালা খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন রাজনীতির ফল খাবার ইচ্ছা কোন কেন্দ্র সরকারের থাকে তখন এক সপ্তাহের মধ্যে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার কোর্টে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে তালা খুলেও দিতে পারে। ১ লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে তালা খোলার নির্দেশের মাত্র ৪০ মিনিটে দূরদর্শনের টিমের সামনে চাবি না পাওয়ায় তালা ভেঙে ফেলা হয়। দেশ তারও প্রত্যক্ষদর্শী থাকে। এই ঘটনায় মুসলিমদের এক বড় অংশ রাজীব গান্ধীর বিরোধী হয়ে পড়ে। ফলে রাজীব গান্ধীও কিছুটা বাধ্য হয়েই হিন্দু নেতাদের শরণাপন্ন হন। মধ্যস্থতার মাধ্যমে যখন রাম মন্দির নির্মাণের কথাবার্তা চলছে তখন বিতর্কিত জায়গাকে রাতারাতি বদলিয়ে সেখানে ভূমি পূজন ও শিলান্যাস করানো হয় ১৯৮৯ সালের ৯ ও ১০নভেম্বর। সেই বছর লোকসভা ভোট পিছিয়ে নিয়ে আসা হয় কারণ দুর্নীতির একটা একটা মামলায় রাজীব গান্ধী সরকার তখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছে হেভিওয়েট নেতারা। শাহবানু মামলা এবং তালা খোলায় মুসলিমরা আগের মতো আর আস্থা রাখতে পারে নি। রাজীব গান্ধী উত্তরপ্রদেশের জাতপাতের রাজনীতিতে হিন্দু ভোট ছাড়া যে জেতা যাবে না সেটা বুঝেছিলেন খুব সহজে। কিন্তু ততদিনে হিন্দুরা বুঝে গেছে যে তালা খোলা থেকে শিলান্যাস, সবটাই আই ওয়াশ। সত্যিকারের মন্দির নির্মাণে সরকারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কারণ লীগ পন্থী নেতাদের রমরমা ক্ষমতার অলিন্দে বরাবরের মত তখনও ছিল। কংগ্রেস নির্বাচনে হেরে যায়। এরপর প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং এর সময় রাম মন্দির নিয়ে মধ্যস্থতা হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বরঞ্চ ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর ও ২ রা নভেম্বর মুলায়ম সিং যাদব সরকার বিতর্কিত কাঠামোয় সেবা করতে আসা নিরস্ত্র অসহায় মানুষদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য লোক কে হত্যা করেছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ই ডিসেম্বর যেদিন বিতর্কিত কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেল লাখ লাখ ধাক্কায় সেদিনও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং বারবার কেন্দ্রের পি ভি নরসিমা রাও সরকারকে আবেদন করেছিল যাতে সমস্যার সমাধান খুব তাড়াতাড়ি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সাধুসন্ত সমাজের কাছে রাম মন্দির নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কার্য সম্পাদনের সময় পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভোট পলিটিক্সের জন্য তারও হাত বাঁধা।

বিতর্কিত কাঠামোকে বারবার মসজিদ বলা হয়েছে। বারবার এমন ভাবে বামপন্থী ইসলামিক লবির ইতিহাসবিদ থেকে তোষামোদি রাজনৈতিক নেতারা কখনো মুসলিম সমাজকে বোঝাতেই দেয় নি যে এই রাম মন্দির আসলে হিন্দু ভাবাবেগ, তাদের ধর্মীয় অধিকার। বরঞ্চ বারবার তাদের ভুল বোঝানো হয়েছে শুধু মাত্র ভোটে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। তাদের আসল সত্য কখনো জানানো হয় নি যে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত রেকর্ড বা মোঘল দস্তাবেজে বাবরি মসজিদ বলে কখনো কিছু ছিল না। তার কখনো কোন ওয়াকফ গঠন করা হয় নি। মসজিদে কখনো নামাজ পড়া হয় নি। মন্দিরের অধিকার কখনো হিন্দুরা ছেড়ে দেয় নি। সব রেকর্ডে এর নাম "জন্মস্থান-ই -মসজিদ" বলা হয়েছে। যে মসজিদ শিয়া নাকি সুন্নীদের, তার জন্য কোর্টে লড়াই হয়েছে, সেখানে এত বছর কিছু মিথ্যা, ভুয়ো নথীকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতির কি সত্যিই কোন দরকার ছিল? গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতা বদল হবে জনগণের ইচ্ছায়। সেখানে কংগ্রেসী উদ্যোগে ক্ষমতা ধরে রাখার এই যে অপপ্রয়াস চলেছে, দুর্নীতির দলদলে ডুবতে থেকেছে দেশ আর অর্থনৈতিক ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছি আমরা। রাম মন্দির নিয়ে অযথা রাজনীতি কংগ্রেসের শেষের একটা মূল কারণ।

**(লেখিকা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)**

# নতুন পথের দিশারী নবভারতের স্থপতি

## পবিত্র চৌধুরী

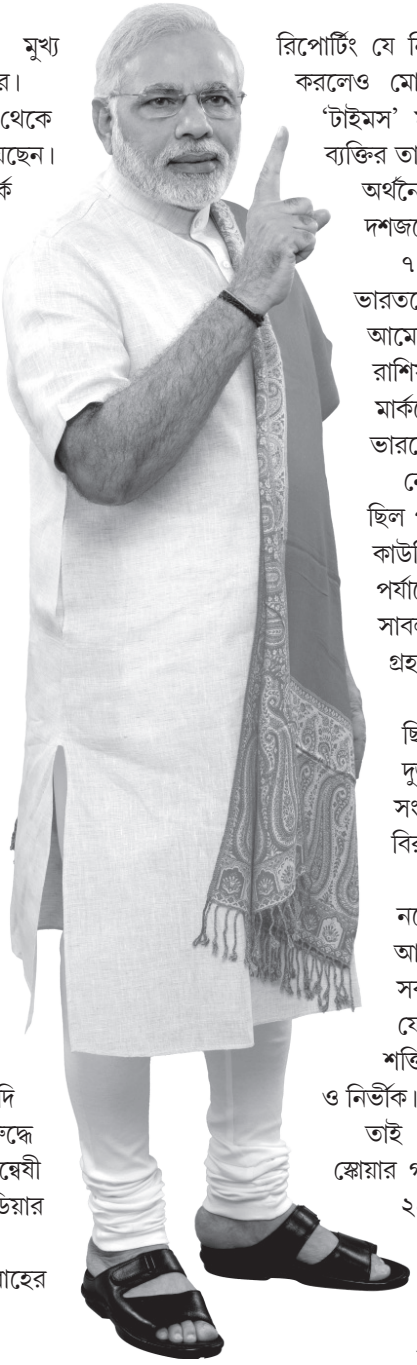

২০১৪। আমেরিকার ভারতীয় মহলে মুখ্য আলোচনা—নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি সরকার।

আমি আমেরিকায় এসেছি ১৯৮০। তখন থেকে এ পর্যন্ত ভারতে আটজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। প্রতি বছরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে আসেন ইউনাইটেড নেশনস্-এর জেনারেল এসেম্বলীতে ভাষণ দেবার জন্য। কিন্তু তাদের আটজন আমেরিকান সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় না। কেবল যখন ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন তখন ১৯৮১-র দশকের প্রথমদিকের তখন আমেরিকান মিডিয়া সেটা সংবাদ করেছিল।

কিন্তু নরেন্দ্র মোদী। তার আমেরিকা সফর আমেরিকান মিডিয়ায় একটা বড় সংবাদ। আমেরিকার মিডিয়া মূলত নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি ও ভারতের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। তাদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে যতই অপছন্দ করুক তারা নরেন্দ্র মোদীকে অবজ্ঞা করতে পারে না। 'হিন্দু পার্টি', 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' ইত্যাদি যথেষ্টভাবে বলে সম্বোধন করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদগোষ্ঠী 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'। মজার কথা হল ডিমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান নেতাদের বহুলাংশই খোলাখুলি খৃষ্ট চিন্তাধারায় সিক্ত। কিন্তু তাতে মিডিয়ার কোন কটাক্ষ, বক্রোক্তির প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের মতো এরাও ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র। আর মুসলমান গরিষ্ঠ হলে পুরো দেশটাকেই বানিয়ে দেয় 'ইসলামিক রাষ্ট্র'। তাতেও কোন টু শব্দ নেই কারও। কিন্তু ভারতবর্ষে কোন নেতা যদি হিন্দু ধর্মের নাম উচ্চারণ করে তখন তার বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়ে যায় তথাকথিত সেকুলারদের, স্বার্থান্বেষী ইনটেলেকচুয়ালদের, আপোষবাদী মিডিয়ার বজ্রনিনাদ।

এতটাই গুরুত্বপূর্ণ নরেন্দ্রমোদীর কর্মপ্রবাহের রিপোর্টিং যে নিউ ইয়র্ক টাইমস বৈরী ভাষা প্রয়োগ করলেও মোদীর কভারেজ দিতে বাধ্য হয়েছে। 'টাইমস' মার্গাজনের পৃথিবীর ১০০ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় আছে 'নরেন্দ্র মোদী'। 'ফোর্বস' অর্থনৈতিক সম্পদনার তালিকায় পৃথিবীর দশজনের মধ্যে একজন মোদী।

৭০ বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন যে ভারতকে পৃথিবীতে স্বমহিমায় তুলে ধরেছে। আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনের জি পি, রাশিয়ার ভ্লাডিমির পুটীন, জার্মানীর এঞ্জেলা মার্কলের সঙ্গে একই সাথে উচ্চারিত হয় ভারতের নরেন্দ্র মোদীর নাম।

নেহরু কংগ্রেস প্রবর্তিত বৈদেশিক নীতি ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ফলে ভারত সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য আসন পায়নি। প্রচন্ডরকম পর্যালোচনা করে মোদী ভারতের এক সাবলীল গতিশীল অকুতোভয় ক্ষিপ্র পর্যক্রম গ্রহণ করেছে। পৃথিবী চকিত।

নেহরু, গান্ধীর আভ্যন্তরীণ নীতিও ছিল অদ্ভুত এক ক্লীব দুর্বল মেরুদন্ডহীন। দুজনেই প্রথম প্রকৃত দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বিরুদ্ধাচারণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে।

অনেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার মধ্যে আপামর জনসাধারণ নিদর্শন পেয়েছেন যে সর্বস্তরে সমস্ত বিষয়ে সমদৃষ্টি রাখেন এবং যে কোন সমস্যার সঠিক মোকাবিলা করার শক্তি রাখেন। তার উদ্দেশ্য প্রয়াস সৎ, দক্ষ ও নির্ভীক।

তাই মোদীর নিউইয়র্ক আগমনে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে নরেন্দ্র মোদীর সভায় আসেন ২৫ হাজার অনাবাসী ভারতীয়। কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সভায় ও নিউইয়র্কে এত মানুষ আসেনি।

ইউনাইটেড নেশনস এ মোদীকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রাঙ্গণে এক জমায়েত হয়। সেখানে উপস্থিত নিউইয়র্কের আইন কলেজের ছাত্রী তরুণী অদিতি শর্মা। তার পক্ষে যোগদান কঠিন। কারণ অদিতি দৃষ্টিশক্তি রহিত। তবু আনন্দে উদ্ভাসিত অদিতি। তার পক্ষে দেখা কেবল অনুভবেই। তাতেই অদিতি আপ্লুত।

নরেন্দ্র মোদী তার সাবলীল গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিশাল ক্যানভাসে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের ভারতের স্বমহিমায় অপরূপ এক ছবি এঁকেছেন এবং দৃঢ় সংকল্পে পর্যায়ক্রমে সেই চিত্রকে বাস্তবায়িত করেছেন। সত্তর বছরে এরকম চিন্তাই কেউ করেনি। বিশাল ভিশনই কারও নেই।

ভারতের বর্তমানে উপলব্ধ সুযোগ সুবিধা উচ্চমধ্যবিত্তর বা বড়জোর নিম্ন মধ্যবর্তী অবধি পৌঁছয়। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা নিম্নতম অবধি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন অতি দ্রুত। তৈরী হল জনধন যোজনা।

তৈরী হল বিভিন্ন রকম বীমা। ফসল বীমা, দুর্ঘটনা বীমা রোজগারী মানুষের কর্মজীবন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পরিবার সম্পূর্ণ অসহায় নিঃসম্বল হয়ে যায়। তার প্রতিকার আনল দুর্ঘটনা বীমা। মাসে এক টাকা প্রিমিয়াম। বীমার পরিমান দুই লক্ষ টাকা।

'আধার' কার্ডে আছে প্রতি ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় পত্র। এর সম্বাবনা সুবিশাল। আমেরিকার 'সোসাল সিকিউরিটি কার্ড'-এর নবতম সংস্করণ পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে 'আধার' বর্ত্তমানে। এখন ভুয়ো নামে সরকারী অনুদান বা বিভিন্ন প্রকল্পর সুবিধা দেয়া বন্ধ। যেমন '১০০ দিনর কাজ' এর অর্থ যেত পঞ্চায়েতের কাছে। সেই অর্থ তারা বন্টন করত কর্মীদের। ভুয়ো নামের কর্মীদের টাকা কর্তৃপক্ষরা তছরূপ করতেন। সব প্রাপ্য অর্থ এখন সর্বস্তরে সরাসরি প্রাপকের ব্যঙ্কের এ্যাকাউন্টে যায়। ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে আধার। সরকারের ভবিষ্যতের সব অনুদান, খরচ আধার এর সাথে যুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতের হাজার হাজার কোটি সরকারী অর্থ অপহরণও বন্ধ হবে।

ব্যাঙ্কের ঋণ, ব্যবসা, জমি, সরকারী খয়রাতি সমস্ত কিছুতেই 'আধার' যুক্ত হয়েছে। যার ফলে এক ভুয়ো নামে ব্যাঙ্ক ঋণ আত্মসাৎ করে আর এক ভুয়ো নামে অন্যত্র অন্য সংস্থায় জালিয়াতির কোন সুযোগ পাবে না, গা ঢাকা দিয়ে থাকাও সম্ভব হবে না।

ব্যক্তিগত সম্পর্কর ক্ষেত্রেও আধার এর বিস্তার অসৎ উদ্দেশ্য কুকর্ম করা অনেক নিবারণ করবে।

১৩০ কোটির ভারতবর্ষে সড়ক নির্মাণ এবং সকল দ্রুত যানবাহন অতি গুরুত্বপূর্ণ। আগে যেখানে ১৮ কিমি নতুন সড়ক যে সময়ে তৈরী করত এখন মোটী সরকার ৪০ কিমি সে সময়ে তৈরী করছে।

সমাজের যারা তাদের এক বড় অংশের রন্ধন করার জ্বালানী সিলিন্ডার নাই। যারা সিলিন্ডার কিনতে সক্ষম, তারাও প্রয়োজনে মাসিক বরাদ্দের বেশী কিনতে পায় না। কংগ্রেসী সরকার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এক নির্দেশনামা জারী করলেন। রাহুল গান্ধী নির্দেশ ছিড়ে বললেন পরিবার পিছু প্রতি মাসে একটা সিলিন্ডার চাই। আর যাদের অর্থ সামর্থ নেই তাদের কথা বাদ। এই রাহুলের দৃষ্টি। এখন নতুন উজালা প্রকল্পে অতি দরিদ্র পরিবার মোদী সরকারের কাছ থেকে গ্যাসসিলিন্ডার পেয়েছে। বাকী যারা আছে তারাও দ্রুত পাবেন। বিরাট এক অন্তজ জনসমষ্টি লাভ করল দৈনন্দিন জীবনের জ্বালানী সমস্যার এক স্থায়ী সুরাহা। বহুবছর অপেক্ষা করতে হল মোদী আসা পর্যন্ত।

ভারতের অর্ধেকের বেশী মানুষকে দৈনন্দিন শৌচ সারতে হয় উন্মুক্ত স্থানে। মা বোনরা শরমে মারা যান প্রতিদিন এই লজ্জা যাতনায়। কোন সরকার বা রাজনৈতিক নেতা তো দূরের কথা, কোন সমাজনেতাও এই সংকট সমাধানের চিন্তাই করেন নি।

বরং শুধু আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার সোমিনী সেনগুপ্ত ভারতে পোস্টিং থাকাকালীন এক মহিলার উন্মুক্ত শৌচকর্মের ঘটনার রিপোর্ট করেন সেই মহিলাটি বাধ্য হলেও তার পক্ষে ঘটনাটি হৃদয় বিদারক কিন্তু দোষী সে নয়। নিউইয়র্ক টাইমসে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাতকৃত্য ঘটনাটি নির্দয় ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ রূপেই প্রকাশ পায়। এই ঘটনা ব্যাঙ্গ করার নয় হাস্যকরও নয়। সে বোধ কি সবার হয় না? এই ঘটনা অশ্রুসিক্ত হবার।

নরেন্দ্র মোদী এই সমস্যা উপলব্ধি করেন হৃদয় দিয়ে। চোখ বুজে থাকলে সমস্যা অদৃশ্য হয় না। সারা দেশের কাছে নিদারুণ এই সমস্যা তুলে ধরেন তিনি। মিরাকেল হল-ইতিমধ্যেই কোটি শৌচ টয়লেট নির্মাণ হয়ে গেছে। অতি দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে সারা দেশে টয়লেট নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য। অতঃপর 'স্বচ্ছতা' অভিযান তিনি সারা ভারতে শুরু করে শতাব্দীর পূতিগন্ধময়, গ্লানি আবর্জনা পরিস্কার আরম্ভ করেছেন।

শৌচ এবং স্বচ্ছতা নিয়ে মোদীর পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম আন্তজাতিক নেতৃবর্গ এবং সমাজ সংস্কারকদের চমৎকৃত করেছে। কারণ অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামরিক ইত্যাদির বাইরে তো রাষ্ট্রনেতারা কথা বলেন না।

নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে কাজটা আরো বেশী কঠিন কারন ইউ.পি.এ.-কংগ্রেস শেষ দশ বছর সমস্ত দিক দিয়ে দেশকে নিম্নগামী করেছে।

সেই সুযোগে ভারতের অনেক গৌরব কৃতিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা চালু হয়েছিল। যেমন 'যোগ' স্টুডিও তে আমেরিকা সজ্জিত। মালিকানা প্রায় সকলই সাদা আমেরিকানদের। শিক্ষার্থীও তারাই। কিন্তু 'যোগ'এর উদ্ভদ ভারতবর্ষে এটা প্রকাশ্যে স্বীকার করছিল না। সুবিধা আহরণ করবে। কিন্তু মর্যাদা দেবে না। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু-আমেরিকান ফাউনডেশন' একটা আন্দোলন আরম্ভ করে 'টেক ব্যাক যোগ'।

আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেবার অল্পদিনের মধ্যে মোদী ইউনাইটেড নেশানস আসেন। অবাক বিস্ময়ে বিশ্ববাসী হঠাৎ

শোনে ইউনাইটেড নেশানর-এর সেক্রেটারী জেনারেল ঘোষণা করছেন, এখন থেকে প্রতি বৎসর ২১ জুন 'ইন্টারনেশনাল যোগ ডে' রূপে সারা পৃথিবীতে যোগ উৎসব পালিত হবে। প্রথম বৎসর ইউনাইটেড নেশনস প্রাঙ্গনে যোগ সাধক সদগুরুর উপস্থাপনমত তার নির্দেশমতো কয়েকশত স্থানীয় আমেরিকান ভারতীয় যোগ পারদর্শী যোগ ক্রিয়া প্রদর্শন করছে।

ভারতীয় দূতাবাস সমূহ উদ্দীপনাসহ এখানকার স্থানীয় সংস্থাদের সহযোগে বিভিন্ন শহরে প্রতি বছর যোগ উৎসব পালন করছে ইউনাইটেড নেশনস-এর প্রাঙ্গনে বিশাল জনসমাগমে উড়ছে পতাকা।

'যোগ—বিশ্বকে ভারতের উপহার' আমাদের ছোট সংস্থা 'ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইন্টেলেকচুয়াল ফোরাম ইনক' এই কর্মকান্ডে অংশ নেয় আরো অনেকের সাথে একযোগে। কনসুলেটের সাথে এরকম উদ্যোগ আগে দেখিনি। ইতিমধ্যে বন্ধুবর কলকাতার লেখক আশীষ গঙ্গোপাধ্যায় একবার যোগ উৎসবের সময় নিউইয়র্ক থাকাকালীন টাইমস স্কোয়ারে বিশাল জনসমাগমে বিস্মিত। এখন কনসাল জেনারেল বঙ্গ তনয়া রিভা দাস গাঙ্গুলীর সাথে আশীষের পরিচয়ের পর তিনি আশীষকে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন।

কোন উন্নত জ্ঞানরাশি হিন্দুর দেশ ভারত থেকে এসেছে সেটা স্বীকার করতে অনেকেরই সঙ্কোচ বোধ হয়। সেটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ আমেরিকাতে 'যোগ' এখন হাজার কোটি ডলারের ব্যবসা। আর তার স্বত্ব এবং আত্মিক, মানবিক উপকার বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে ভারতকে সর্পপূজা, হনুমানপূজা, ইদুর পূজাকারী সাপুড়েদের, প্যাগানদের দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রচেষ্টা চলছে অতি পরিকল্পিতভাবে সেক্রেটারী টু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টমাস ম্যাকলের সময় উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে।

ইউরোপীয়ান খ্রীশ্চানরা এসেছিল ভারত লুঠ করতে, রাজত্ব করতে এবং দেশটাকে খৃষ্টধর্মে পরিণত করতে। আরব মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরাও একই উদ্দেশ্যে ভারতে আসে এবং ছয় সাত শত বছর রাজত্ব করে। তারা বর্বর আক্রমণ, নারী নির্যাতন এসব চূড়ান্ত করে কিন্তু কোন ছদ্মবেশ নেয় নি। কিন্তু ইউরোপীয়ানরা নিজেদের দাবী করে 'সভ্য' জাতি রূপে, তাই পররাজ্য লোভী বলে পরিচিতি চায় না। তাদের দরকার হয় মুখোশের তারা দেখাতে চায় তারা অশিক্ষিত অজ্ঞ হিন্দু দেশ থেকে অন্ধকার দূর করে 'আলোক' বর্ত্তিকা নিয়ে এসেছে। এইজন্য ভারতকে উন্নত সভ্য স্বীকার করতে আপত্তি। যাতে খৃষ্টানরা বলতে পারে ভারত অজ্ঞ অন্ধকার ছিল বলে ভারতে খ্রীষ্টানরা আসে as it is 'white Mans Burden', এই অজুহাতে।

এই মনোবৃত্তি এখনও আমেরিকান একাডেমিয়া, সংবাদ মাধ্যম থিংক ট্যান্‌ক, রাজনীতি এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের এজেন্ডা থাকে। কারও প্রতি বন্ধুত্বভাব, কারও প্রতি বৈরীভাব। কেউ কম্যুনিজম, কেউ ক্যাপিটালাইজম! কেউ রাষ্ট্রধর্মীয়, কেউ ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ শোষিত, কেউ শোষক। কোন দেশীয়রা আক্রমণকারী কোন আক্রান্ত।

যেমন ভারত এবং তার হিন্দু জনগোষ্ঠী ছয়শত বৎসর আরব, মধ্য এশিয়ান মুসলিম এবং আরও দুই শত বৎসর খৃষ্টান ইউরোপীয়ান শক্তি দ্বারা আক্রান্ত এবং দাসত্বে জীবনযাপন করে। যেই কারণে অনেক রাষ্ট্রশক্তি, অনেক ধর্মশক্তি ভারতকে সেভাবেই দেখতে চায়। সম মর্যাদা দিতে নারাজ।

সেই কারণে আমেরিকা ইউরোপ এবং অনেক দেশেই মিডিয়া এবং রাষ্ট্রনেতারা ভারতের প্রতি অন্যায় বৈষম্যমূলক এবং অসত্য রিপোর্টিং করে, অন্যায় ভাষণ দেয়।

আর ভারতের শিক্ষিত, ইনটেলেকচুয়াল এক অংশ পূর্বতন প্রভুশক্তিদের প্রতি নতজানু মনোভাব প্রকাশ করে তাদের বাক্য কার্য্য ও আচরণে। এদের অনেকেই সেই শক্তিসমূহের এজেন্ডা অনুযায়ী নিজ দেশের স্বার্থ পরিপন্থী কাজ করে যায় নিজেরই অজান্তে, বা জেনেশুনে।

পৃথিবীর নেতৃস্থানীয়রা জানে এখন ভারতে এক জননেতা দায়িত্ব নিয়েছেন যিনি ভারতের সামগ্রিক উন্নতি করতে সক্ষম এবং বদ্ধপরিকর আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সকল ক্ষেত্রে।

ভারতের সকল মানুষের প্রতি তার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধ অসীম। রাষ্ট্রের জনগনের সুরক্ষা ও রাষ্ট্রর সার্বভৌমত্বের প্রতি তার অতন্দ্র প্রহরা।

ভারতের বিদেশী শত্রুরা এবং দেশের নিজস্ব ক্ষমতালোভী শক্তিরা এবং নেতাজন জানে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীতে তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করে দেশের ক্ষতি করা সম্ভব হবে না। তাই নানাভাবে অনেক কপট অভিসন্ধি করে যত্রতত্র বিশৃঙ্খলা ঘটাবার চেষ্টা হবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। যে কোন উপায়ে চেষ্টা চলতে থাকবে ভারতের এই অগ্রগমনে বাধা দেবার। তারা ফিরে আনতে চাইবে সেই সময় যখন দেশের পতাকা, দেশের রাষ্ট্রশক্তি, দেশের মেজরিটির ধর্ম, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা, যথাযথ বলে গণ্য হত। দুর্নীতি, দেশদ্রোহ অপশাসন ছিল পুরস্কৃত।

শুধু দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমও ভারত ও হিন্দুধর্মীদের সম্বন্ধে অন্যায় বিরূপ বার্ত্তা প্রকাশ করে। নির্দশন- উত্তরপ্রদেশে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মহম্মদ আকলাকের মৃত্যু হয় হিন্দুদের আক্রমণে। ধরে নেওয়া াক মহম্মদ আকলাক সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই খবর নিউইয়র্ক টাইমস বড় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। আকলাকের মৃত্যুর এক বছর পূর্ত্তিতে নিউইয়র্ক টাইমস তার অ্যানিভার্সারীতে রিপোর্টিং করে।

কিন্তু পশ্চিমবাংলার বারাসাতের কামদুনিতে দরিদ্র হিন্দু পরিবারের প্রথম কলেজ ছাত্রী সম্পূর্ণ বিনা কারণে আক্রান্ত, গণধর্ষণের শিকার হয়। তৎপর দুই পা চিড়ে হত্যা

করা হয়। বীভৎস হলেও সেটা কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমনস ছাপতে দেখিনি। আসাসীরা মুসলমান হলে কি টাইমস নীরব থাকে? তারা মাইনরিটির অভাব অভিযোগ, মহিলাদের সম্পর্কে যত্নশীল রিপোর্টিং করে। কাশ্মীরে ধর্ষণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ করে নিজের দেশেই হিন্দু উৎখাত, বিতাড়িত হল। কাশ্মীরে হিন্দু মাইনরিটি। কিন্তু মিডিয়া প্রায় নিশ্চুপ।

বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দুকে ধর্ষণ আক্রমণ হত্যা 'এথনিক ক্লিনজিং' চলছে বিশেষত জোরদার রূপে ২০০১ থেকে। যার ফলে ১৯৪৮ এর হিন্দু জনসংখ্যা কমবেশী ২৯ শতাংশ থেকে বর্ত্তমানে ৭ শতাংশ হয়েছে। সেইরূপ পাকিস্থানে ২০ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তৎসত্ত্বেও মিডিয়া কেন চুপ?

অপরপক্ষে ভারতে ১৯৪৮ এর মুসলিন জনসংখ্যা ছিল ৮ শতাংশ। এখন সেটা একশত ভাগবৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ। খৃষ্টান জনসংখ্যার বৃদ্ধিও প্রায় এক শত ভাগ। হিন্দুর সংখ্যা পতন হয়েছে—বৃদ্ধি নয়—পতন ৮৮ শতাংশ থেকে ৭৮ শতাংশ।

কিন্তু সামান্য একটা ছোট ঘটনাও যদি সেটা খৃষ্টান বা মুসলিম স্কর্থের বিপরীত হয়, তবে সেটা বহুলভাবে সর্বস্তরে প্রচারিত হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে। স্বার্থান্বেষী ইনটেলেকচুয়ারা, সুবিধাবাদী সিউডো সেকুলাররা ইনটলারেন্স ব্রিগেড তৈরী করে।

যদি হিন্দু বা ভারত ইনটলারেন্ট হত, তবে ভারতে মাইনরিটির পাকিস্থান বা বাংলাদেশের মতো অবস্থা হত। শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি পেত না, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্থান থেকে ক্রমাগত মুসলিমরা ভারতে আসে, ফিরে যায় না। সেখানে বিপদ, সেখান থেকে সবাই পালায়।

কেন এই মিথ্যাচারী রাহুল গান্ধী আমেরিকান রাষ্ট্রদূত স্টিমোথী রোমারকে বলেন, যে হিন্দু টেররিজম নিয়ে চিন্তিত তিনি। নিজের দেশের মেজরিটির উপর মিথ্যা বদনাম করার আসল উদ্দেশ্য কি? রাহুল কী ক্ষেত্র তৈরী করছিল হিন্দুর উপর মিথ্যা অপবাদ চাপাবার?

কূটনৈতিক পর্যায়ে কিন্তু ভারতের স্থান এখন স্বীকৃত। এক আলোচনাচক্রে ভারত-আমেরিকা বৈদেশিক পারস্পরিক সম্পর্কেরস্পেশালিষ্ট এলিসা আয়ারসের বলেন, আমেরিকা বলেছে পৃথিবীতে এখন ভারত বৃহৎ 'সিকিউরিটি প্রোভাইডার'। আরও বলেন যে ভারতই একমাত্র দেশ যাকে বর্তমানে আমেরিকা সম্বোধন করেছে 'মেজর ডিফেন্স পার্টনার' রূপে। আমেরিকার ৪০ বৎসরব্যাপী ডিপ্লোম্যাট, যিনি আটজন প্রেসিডেন্টের সাথে যুক্ত ছিলেন, ভারতে রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সেই ফ্রানক উইজনেয়ার এক প্রশ্নোত্তরে বলেন, ট্রাম্প-মোদী ক্রমিক সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো।

পৃথিবী জানে ভারত শান্তিপ্রিয়। হিন্দুর উপর জবরদস্তি করেই আটশত বৎসর রাজশক্তি তান্ডব চালিয়েছে। সেইজন্যই এখনও সেইরূপ নানা প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভারতের আটরাজ্যে হিন্দুরা মাইনরিটি হয়ে গেছে। একবারও তাদের সমস্যার কথা কোন মিডিয়া বলে না।

সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে ঘটনার বিশ্লেষণ করার জন্য। প্রতিবাদ করতে হবে, যাতে দেশের অগ্রগতি কেউ রোধ না করতে পারে। কাজটি কিন্তু অতি দূরহ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—একটা নগন্য কেউটেরও দংশন ক্ষমতা অনেক হতে পারে। আর যদি বিখ্যাত অনসূয়া নীচ ব্যক্তির নীচ দেশের প্রতি এত হীন বৈরী মনোভাব পোষন করে তাহলে সেটা দেশের অগ্রগতির পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। দেশের নোবেল ম্যান যখন বিদেশে পত্রপত্রিকায় দেশের বিরুদ্ধে অসাবধানে দীন জীর্ণ অসত্য বক্তব্য রাখেন। তাতেই ভারতের ভাবমূর্তী ক্ষুণ্ণ হয়। আভ্যন্তরীন এবং বৈদেশিক অনেক সমস্যারও উদ্ভব এখানেই।

আমেরিকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১-র এক ইন্টারভিউ দেন নিউইয়র্ক The Chatiner, অতি নগ্ন অসত্য আক্রমণ ভারত এবং হিন্দুর উপর। কাশ্মীরে দুই লক্ষ হিন্দুর উপর, অকথ্য আক্রমণ, ধর্ষণ, এথনিক ক্লিনসিং, বাংলাদেশে ফেলে আসা নিজ ভাইবোন, পরিবার পরিজনদের উপর ২০০১ সাল থেকে যে অকথ্য অত্যাচার, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, দেশ থেকে হিন্দু বিতরণ চলছেই সেই সম্বন্ধে দেশ ত্যাগে বাধ্য পূর্বতন ঢাকা নিবাসী একটা বাক্যও ব্যাক্ত করেননি।

বাংলাদেশ পাকিস্থানে শাসন ব্যবস্থায় সকলেই মুসলমান। তাতে কারো কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি কেবল হিন্দুরা যদি হিন্দু গরিষ্ঠ ভারতে শাসন চালায় তাই উক্তি "And the president, Prime Minister, The leadership all are hindu" এ কোন দাসবৃত্তি। ৮০০ বছর দাসত্বের ফল। আবারো সম্বোধন ২০০৭ "We had a muslim president, a sikh prime minister, a christian lady of the ruling party" কী আনন্দ! নীজ দেশেই কোন হিন্দু কোন উচ্চ পদে নেই। কী আনন্দ! এডুকেশন সেক্রেটারী টমাস ম্যাকোলে ভবিষ্যতে বৃটিশদের স্বার্থ বহন করে ভারত চালাবার জন্য ইংরাজী শিক্ষায়, ভাবধারায় শিক্ষিত এক বিশেষ ভারতীয় শ্রেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাঁরা দেখতে ভারতীয় কিন্তু চিন্তাভাবনায় বৃটিশের স্বার্থে কাজ করবে।

We Govlsh a class of persons indian in blood and colour but english in taste, in opinion in morals and in intellect.

শকুনের দূরদৃষ্টি। সার্থক বৃটিশের প্রচেষ্টা।

পথের আগাছা কাটা নির্মূল করেই এগোতে হবে।

**লেখক প্রবাসী বাঙালী, ইন্ডিয়া-আমেরিকান ইনটেলেকচুয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি**

d-mail: pchow26@gmail.com

# কথায় কথায় মোদি ম্যাজিক

## সুন্দর মৌলিক

বড়ে বড়ে দেশো মে... ইউ নো হোয়াট আই মিন। পুরোটা না বলেই ছেড়ে দিয়েছিলেন বারাক ওবামা। ভারতে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে বলিউডি বুলি। হাততালি তো পরবেই। ওমা! ওবামা যে সেই বিখ্যাত ডায়লগটাও জানেন, সমাঝদারো কে লিয়ে ইশারাহি কাফি হোতা হ্যায়। নাকি এর পেছনে কোনও মেক ইন ইন্ডিয়া স্ক্রিপ্ট রাইটার! ওসব থাক, আমরা বরং ভারতীয় ডায়লগ শিল্পে নজর দিই। বড় বড় রাজনীতির ছোটে ছোটে বাতে...

ছোট ছোট বাত যে বড় বড় স্লোগান হয়ে যায় এটা রাজনীতিবিদদের থেকে বেশি কেই বা জানে? স্লোগান মানে ছোট কথার বড় অর্থ। পরীক্ষায় ১৫ নম্বরের ভাবসম্প্রসারণ লেখা যাবে। ডায়লগ তথা স্লোগানে বিশ্বের তাবৎ রাজনীতিক কথায় কথায় মাসতুতো ভাই। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো এ ব্যাপারে মাস্টার ব্লাস্টার। লাইনে লাইনে চার-ছয়। ডায়লগের মধ্যে সুর-তাল-ছন্দের ধ্রুপদী শিল্পী যেন। বক্তৃতার মধ্যে এক একটা ডায়লগ আলাপ, তান, সওয়াল-জবাব হয়ে ঝালায় পৌঁছে যায়। সম থেকে সমে ফিরিয়ে সে কি উন্মাদনা! এই করোনাকালেই তো তিনি এক দারুণ স্লোগান উপহার দিয়েছেন দেশকে, 'দো গজ কি দূরি, মাস্ক জরুরি'। শুধু দেশ কেন, গোটা বিশ্বের কাছেই তো এ এখন মহামন্ত্র।

ভারতীয় রাজনীতিতে কত কত ডায়লগ বা উক্তি বা স্লোগান

যে ইতিহাস তৈরি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই স্বাধীনতার আগে থেকে। তাই বা কেন! রাজনীতির মহাগ্রন্থ মহাভারতেরই অঙ্গ গীতা তো গোটাটাই শ্রীকৃষ্ণের ডায়লগে ঠাসা। যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে একের পর এক ডায়লগে কাহিল করে অস্ত্র ধরিয়ে ছেড়েছিলেন। সেই সূত্রেই 'সম্ভবামী যুগে যুগে' থেকে 'মা ফলেষু কদাচন' শ্রীকৃষ্ণের ট্যাগলাইন হয়ে গেছে। ক্যালেন্ডারের ছবি কিংবা ধর্মকথায় বাণী আর বাণীদাতাকে আলাদা করা যায় না। সুভাষচন্দ্র বসু মানেই 'দিল্লি চলো'। তিলক মানেই 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। রামকৃষ্ণের 'যত মত, তত পথ'।

ঠিক সেই পথেই ভারতীয় রাজনীতিতে এসেছে, 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ' থেকে 'সবকা সাথ, সবকে বিকাশ'। এক একটি এক এক রাষ্ট্রনেতার ট্যাগলাইন। পুরো ফিল্মি গন্ধ। ডায়লগে যায় চেনা।

একটু এদিক ওদিক করে নিলে প্রায় একই ছবি আগেই দেখিয়েছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি। ভাইব্রান্ট গুজরাতের অনুষ্ঠানে প্রাক ওবামা সফরে নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করতে "মোদি বোল" এই মোদি পুজো সেরেছিলেন। আমেরিকান অ্যাক্সেন্টে 'সবকা সাথ, সবকে বিকাশ' শুনে হাততালির ঢেউ। তারপর ওবামা এসেও—বড় বড় দেশ মে...

তবে সব ডায়লগ তো আর স্লোগান হয় না। কিছু কিছু হয়। এক একটা সময় এক একটা বাক্যবন্ধনী ঝড় তুলে দেয়। ১৯৬৫ তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্লোগান তুলেছিলেন, 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'। সেনাবাহিনীকে প্রেরণার সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের পাঞ্চ। ৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে সাফল্যের পাশাপাশি নিজস্ব ট্যাগলাইনও পেয়ে গেলেন ইন্দিরা গান্ধী—'গরিবি হঠাও'। এরপর জরুরি অবস্থা, দেশজুড়ে আন্দোলনের মধ্যেই জয়প্রকাশ নারায়ণ ৭৭-এর নির্বাচনে ট্রাম্প কার্ড বানালেন নয়া স্লোগানকে—'ইন্দিরা হঠাও, দেশ বাঁচাও'। নেহরু-কন্যার 'গরিবি হঠাও'-এর পাল্টা। দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরার মৃত্যুর পর ৮৪-র ভোটে 'যব তক সুরয চাঁদ রহেগা, ইন্দিরা তেরা নাম রহেগা' স্লোগান কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এক করুণা স্রোত তৈরি করল। সেই অশ্রু স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন রাজীব গান্ধী। ওদিকে রসিক রাজনীতিক লালুপ্রসাদ একই সুরে নতুন শব্দ গাঁথলেন, 'যব তক সামোসা মে রহেগা আলু, তব তক বিহার মে রহেগা লালু।' ডায়লগে বহু ওভার বাউন্ডারি মারা যাদব মালিকের এটি শুধু ট্যাগলাইন হল না, স্লোগানের নয়া নজির তৈরি হয়ে গেল। এই প্রথম আম-আদমির জীবনমুখি রাজনৈতিক স্লোগান। দিল্লিতে টানা বারো বছরের কংগ্রেস রাজের শেষে বদল আনল, 'বারি বারি সবকি বারি, আবকি বারি অটলবিহারী'। তবে সেটা বাজপেয়ীর নয়, বিজেপির স্লোগান। তিনি নিজস্ব ট্যাগলাইন তৈরি করলেন, ১৯৯৮-এ পোখরানে পরীক্ষামূলক পারমানবিক বিস্ফোরণের পর। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্লোগানকে এক কদম এগিয়ে দিলেন—'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান'।

মাঝে জাতীয় স্লোগানে যেন একটু ভাটা পরেছিল। এখন নরেন্দ্রভাই হাল ধরেছেন। তাঁর আবার এক আধটায় মন রোচে না। ডায়লগের বাজারে তিনি হচ্ছেন খিলাড়িও কা খিলাড়ি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অনেক ট্যাগ লাইন নির্মাণ করেছেন তিনি। এ-কদিনেই এত স্লোগান দিয়ে ফেলেছেন যে কোনটা তাঁর নিজস্বী হবে তা নিয়ে বুলি বনাম বুলি কম্পিটিশন চলছে। মোদীর প্রথম লোকসভা নির্বাচন পর্বটা ছিল এক স্লোগানমুখী। 'আবকি বার, মোদি সরকার'। কিন্তু ভোট প্রচারে নেমে নিত্য নতুন ডায়লগ তৈরি করতে লাগলেন মঞ্চে মঞ্চে। একের পর এক। হিট করে গেল—'আচ্ছে দিন আনে বালা হ্যায়'। মোদির আচ্ছে দিন এসেও গেল। জয়ের রায় পেয়ে প্রথম বক্তব্য শুরুই করেছিলেন এইভাবে— 'আব আচ্ছে দিন আ গ্যায়া'।

শুধু স্লোগান নয়, অনুপ্রাসও প্রিয় নরেন্দ্র দামোদর দাসের কাছে।। সঙ্গে ফর্মুলা। নিয়মে বাঁধা, গতানুগতিক বক্তৃতা তাঁর পছন্দ নয়। প্রতিটি বক্তৃতাই যেন আলাদা আলাদা রাগে গাওয়া।

তাঁর কথায় বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তিনটি 'ডি' (3D) শুধু ভারতের আছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, ডেমোক্র্যাসি, ডিমান্ড।

ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া তৈরির ফর্মুলা—ফাইভ 'টি' (5T)। ট্যালেন্ট, ট্র্যাডিশন, ট্যুরিজিম, ট্রেড, টেকনোলজি। একই বর্ণ দিয়ে শুরু শধের মালা গাঁথার ভুরি ভুরি নির্দশন।

বস্ত্র শিল্পকে চাঙ্গা করার ফাইভ এফ (5F) ফর্মুলা—ফার্ম টু ফাইবার, ফাইবার টু ফেবরিক, ফেবরিক টু ফ্যাশন, ফেবরিক টু ফরেন।

চিনকে টক্কর দিতে ফর্মুলা থ্রি এস (৩ছ)—স্কিল, স্কেল, স্পিড।

শুধু ইংরেজি নয়, রাষ্ট্রভাষাতেও সেই একই ধারা। উন্নয়নের থ্রি এস (3S)—সমবেশক, সর্বদেশক, সর্বস্পর্শী। লেহ-লাদাকের উন্নয়নের ফর্মুলা পি-থ্রি (3P)—প্রকাশ, পর্যাবরণ, পর্যটন। নেপালের পাশে দাঁড়ানোর হিট এইচআইটি (HIT) ফর্মুলা—হাইওয়েজ, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ট্রান্সমিশন লাইন্স। আর সরকারে সুশাসন দেওয়ার ফর্মুলা পিটুজিটু (P2G2)। প্রো-পিপল গুড গভর্নেন্স।

নরেন্দ্র মোদি শুধু অ্যাক্রোনিমেরই কারিগর নন, তাঁর ডায়লগে অনায়াস ফ্রেজ। বিনিয়োগ আনার ডায়লাগ—'ফ্রম রেড টেপ টু রেড কারপেট।' কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ডায়লগ 'ফ্রম স্ক্যাম ইন্ডিয়া টু স্কিলড ইন্ডিয়া।' সরকারি কাজের গতি আনার টিপস—'পুট লাইফ ইন ফাইল।' তারপর সেই মঙ্গলযান অভিযানের পর বলেছিলেন, 'আজ মম কা মঙ্গল সে মিলন হো গ্যায়া, আউর মঙ্গল কো মম মিল গ্যায়ি'। উদাহরণ প্রচুর। অপেক্ষা আরও অনেক পাওয়ার।

# আয়ুর্বেদ: কেন্দ্র সরকারের নীতি ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতা

অগ্রণী আচার্য

প্রায় সপ্তম শতাব্দী থেকে অবিভক্ত বঙ্গে আয়ুর্বেদ এর প্রচলন, সময় এর সাথে সাথেই জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছায় এই বঙ্গ আয়ুর্বেদ, মাধব কর, চক্রপাণি দত্ত, হারানচন্দ্র চক্রবর্তী, গঙ্গাধর রায়, যোগেন্দ্র নাথ সেন, যামিনী ভূষণ রায় প্রভৃতি দিকালরা বঙ্গদেশে তথা হিন্দুস্থান এর আয়ুর্বেদ সমাজ কে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদ এর উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, রাজনৈতিক অবজ্ঞা ও অতি বামপন্থী নীতির আস্ফালন এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের নীতি হীনতার কারণে কালের গর্ভে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে বঙ্গ আয়ুর্বেদ, বাংলার চিরাচরিত আয়ুর্বেদ পরম্পরা।

এই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য জুড়ে ডাক্তারের অপর্যাপ্ততা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আক্ষেপের সুরে জনগণকে বলতে বাধ্য হচ্ছেন 'ডাক্তার কি দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যায়? যে ডাক্তার কিনে ঘাটতি মেটাবো'। অন্যদিকে সরকারের ডাক্তার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরেও বারবার শূন্যস্থান পূরন হয় না কারন সরকারি চাকুরীর প্রতি ও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পরিষেবা দিতে ডাক্তারদের বৃহৎ অংশ মুখ ফেরান, ঠিক সেই রকম পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর থেকেও কম বেতনে পঞ্চায়েত, আর বি এস

কে আয়ুশ ডাক্তারবাবুরা গ্রামীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সুদৃড় করতে সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নিত্যদিন কাজ করে চলেছেন, মাননীয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রীর তাঁদের জন্য না আছে শ্রদ্ধা, না সম্মান আর না সাম্মানিক।

যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাথে ভারতের চিরাচরিত আধ্যাত্মবাদ, যার সাথে ভারতের হিন্দু সমাজের অস্মিতার বীজ গভীরে নিহিত অবস্থায় সেই ভারতের আয়ুর্বেদ এর মহান সাম্রাজ্যের দিশারী পশ্চিমবঙ্গ আজ দুর্দশার কবলে। আয়ুর্বেদ এর ক্ষেত্রে রাজ্যের-আয়তন, জনসংখ্যা, পরিকাঠামো, পরিষেবার মান সংক্রান্ত বিষয়ে ১০টি রাজ্যের সঙ্গে তুল্যমূল্য আলোচনায় সব থেকে নিচের সারিতে নাম আজ পশ্চিমবঙ্গ. এই ধংসের শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস -বামপন্থীদের হাত ধরেই একের পর কলেজ বন্ধ, উদ্ভ্রান্ত নীতি, স্বজন পোষণ-দুর্নীতির সংমিশ্রনে বঙ্গ আয়ুর্বেদ এর রীতি নীতি নিয়ম-নিষ্ঠা কেই ভুন্ট্রিত করেছেন রাজনৈতিক তাঁবেদার গন। বর্তমান শাসক দল আবার সেসব এর তোয়াক্কা করেন না, নিজেদের গায়ের জোর ও ক্ষমতার দাম্ভিকতাই এনাদের মূল মন্ত্র, রাজ্যের শাস্ত্রীয়, পারম্পরিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ তাই অবহেলিত, উপেক্ষিত, মৃতপ্রায়।

মূল সমস্যা ঠিক কোথায়

সমস্যা গুলি সঠিক ভাবে কোথায় যা পশ্চিমবঙ্গের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপন্থী এবিষয়ে এ কয়েকটি ভাগে আলোচনা করলে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়—

১. স্বাধীনতার পর থেকেই রাজ্যের আয়ুর্বেদ এর প্রতি বিমাতৃ সুলভ আচরণই প্রধান সমস্যা, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান, মন্ত্রীগন, আমলারা নিজেদের বা পারিবারিক প্রয়োজন এ আয়ুর্বেদ ডাক্তার এর দ্বারস্থ হোন কিন্তু পলিসি তৈরিতে অনেক সময় এনারাই বাধা দেন, এই দ্বিচারিতাই মূল সমস্যা, আজও পূর্ণ স্বাধীন দপ্তর তৈরী নয়, বর্তমান শাসকের রাজত্বের প্রথমভাগে ২০১৪ সালে আলাদা রাজ্য আয়ুষ দপ্তর ও মন্ত্রী তৈরী করলেও দ্বিতীয় অর্ধে সেটি তুলে দিয়ে এক প্রশাসনিক সংকট ঘটে যায়, পূর্বতন শাসক দলের আশীর্বাদ ধন্য দাম্ভিক, নীতিহীন, এক চিকিৎসকআধিকারিক এর ১৩বছর এর প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদ দপ্তরটি পদলেহন ও চামচা পরিবেষ্টিত দপ্তরের জন্ম দেয় - সেই ট্রেডিশান আজও সমানে চলছে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ব্রতী হয়ে ২০১১ সাল থেকে আয়ুষ এর সব ডাইরেক্টার এক জন ঢক্ষ্ছ অফিসার, যাদের প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক ভাবে স্পষ্ট ধারণা নেই, ফলস্বরূপ বর্তমান প্রশাসনিক কাজকে তলানিতে নিয়ে গেছেন এনারাই।

২. **উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব:** ১৯১৬ সলথেকে মাত্র সরকারি একটি আন্ডার গ্রাজুয়েট কলেজ ও আলাদা ১টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, দীর্ঘদিন ধরে মাত্রা ২৯৪টি আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারি ও নিয়মিত নিয়োগ না করা বা এই সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা না করা একটি ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবেই পরিলক্ষিত হয়।

৩. **আয়ুর্বেদ শিক্ষায় মানোন্নয়ন এর অভাব:** স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এর প্রতি নজর না দেওয়ায় শিক্ষা আজ তলানিতে।

৪. **গবেষণার উপযুক্ত অভাব**- পশ্চিম বঙ্গের কোনো আয়ুর্বেদ কলেজ এই গবেষণার পরিবেশ ও পরিকাঠামো নেই, উপযুক্ত পরিকাঠামো অভাব এ গবেষণার মান কিছুই নেই, মাস্টার মসাইদের গুনগত মান অধিকাংশের ই প্রশ্নাচিহ্নের মুখে, বহুজন মেডিকেল অফিসার কে তার যোগ্য সম্মান বা সাম্মানিক না দিয়ে মাস্টার মাসাই বানিয়ে দিচ্ছেন আবার কোনো মাস্টারমশাইকেই ইচ্ছে খুশি মেডিকেল অফিসার বানিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের 'সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে' পাঠিয়ে দিচ্ছেন, গবেষণা করবে কে ?

৫. **ঔষধ প্রস্তুতির পরিকাঠামো:** নাদিয়ার কল্যাণীর গয়েশপুর এ রাজ্যের একমাত্র আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুত কারখানা ধুকছে, কর্মী সংকট এ, কোটি কোটি টাকা প্রতি বাঁচার কেন্দ্র সরকাররের সাহায্য পেলেও গবেষণাগার খোলেই না সেখানে, কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্চে,

৬. **জনসচেতনতার অভাব:** গ্রাম পঞ্চায়েত, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক স্তর, জেলাস্তর এ সাকার এর কোনো প্রয়াস এ লক্ষে পড়েনা আয়ুর্বেদ প্রসারের প্রতি, কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের প্রকল্প এ টাকার অনুদান এলেও টাকা সেভাবে খরচ ই করতে পারছেননা রাজ্য সরকার।

৭. **ঔষধি গাছের চাষ ও সংরক্ষণ এর অভাব:** পশ্চিমবাংলা কৃষিপ্রধান রাজ্য, নদী, পাহাড় গঙ্গানদীর অববাহিকা বিশাল অঞ্চল ঔষধিগাছ চাষ, রপ্তানি সম্ভব যে ক্ষেত্রে সরকারের উদাসীনতা লক্ষণীয়।

৮. **স্বাস্থ্য পরিষেবায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের প্রতি অবহেলা:** যেখানে পঞ্চায়েতে কর্মরত একজন আয়ুশ বিভাগের ডাক্তারকে সদ্যজাত থেকে শুরু করে প্রায় অধিকাংশ রোগের সু-চিকিৎসার দায়িত্ব বহন করতে হয় এবং পাশাপাশি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয় এলাকাটি কোনও সংক্রামিত রোগের প্রকোপে পড়ছে কিনা সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসের চতুর্থ শনিবার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে সচেতন করা থেকে রোগ প্রতিরোধে যা যা করনীয় প্রায় সমস্তকিছুর দায়িত্ব নিয়ে চলেছেন। ঝুঁকির কথা বললে বলতেই হয় প্রায় প্রত্যেককেই নূন্যতম ঔষধ ও পরিকাঠামো গত ত্রুটি কে সাথে রেখেই পুঁথিগতবিদ্যার বাইরে অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে গ্রামীন স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সচল রাখার চেষ্টায় ব্রতী। যেমন কোনক্ষেত্রে হয়তো একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা যথেষ্ট জরুরি বা রোগী রেফার হওয়া উচিত অথচ রোগীটি একেবারেই সহায়সম্বলহীন, নিয়মিত জেলা হাসপাতালে যাওয়ার পয়সাও তার নেই সেইরকম পরিস্তিতিতে দাঁড়িয়ে একজন পঞ্চায়েত ডাক্তারবাবুকে সবকিছুর উর্ধে গিয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে

যেতে হয়। অথচ রাজ্য সরকারের এইরকম (ডাক্তারের জন্য হা-পিত্যেশ)পরিস্থিতিতে যারা এতটা বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে থেকে ২০১৯ এর সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও প্রতন্ত্য অঞ্চলে মাত্র ষোল হাজার টাকা মাসিক বেতনে প্রতহ কাজ করে চলেছেন যা বর্তমানে ডাক্তারদের কাজ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে চরম অসামঞ্জস্যপূর্ন।

অন্যদিকে সরকারী উদাসীনতায় সুদীর্ঘদিন যাবৎ এ রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক এস.এ.এম.ও ডাক্তারবাবুদেরও অবস্থায় অথৈবচ। আবার অন্যদিকে সি.এইচ.ও (কমিউনিটি হেল অফিসার) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগে কেবলমাত্র নার্স নিয়োগ করে কোনও এক অজ্ঞাত কারনে বি.এ.এম.এস ডাক্তারদের বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা রাজ্য সরকারের একপেশে মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

অথচ সরকার এইসকল চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগত বঞ্চনা ও প্রতিশ্রুতির অনুদান দিয়ে চলেছেন। এই চিকিৎসকদের না আছে চাকুরীর স্থায়ীত্ব, না আছে সম্মানজনক মাইনে, না সময়মতো পর্যাপ্ত ওষুধের যোগান। তথাপি পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সরকারের প্রতি আশাবাদী আয়ুশ চিকিৎসকগন সাধ্যমতো পরিষেবা দিয়ে গ্রাম অঞ্চলের মানুষের সেবায় আজও তৎপর।

**পশ্চিমবঙ্গের আয়ুর্বেদ উন্নতি কল্পে কেন্দ্র সরকার কতটা তৎপর?**

সম্প্রতি তথ্য জানার অধিকার আইন এ রাজ্যের একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক জানতে পারেন যা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন এ তোলপাড় ও পরে যায়, যে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রলায় জাতীয় আয়ুষ মিশন খাতে ৯৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কিন্তু ৩০সে জুন ২০২০ এর পরেও দেখা যাচ্চে রাজ্য সরকার ৪৮কোটি ১৭লক্ষ ৩৮হাজার টাকা খরচ ই করতে পারেন নি। এটা কি গাফিলতি না রাজ্যে আয়ুষ দপ্তরের উদাসীনতা নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবে এ নিয়ে কাজ করতে দেয়া হয় না রাজ্যের আমলাদের এ প্রশ্ন জাগছে আয়ুর্বেদ চিকিতক থেকে আয়ুর্বেদে ভরসা রাখা জনগণের। বাংলার ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার ) আয়ুষ চিকিৎসক এর কাছে রাজ্য সরকার কি জবাব দেবে?

প্রশ্ন হচ্ছে আয়ুর্বেদ নিয়ে সত্যিই কি রাজ্য সরকার উদাসীন, নাকি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যভবনে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকার ফলে আমলাতান্ত্রিক গেরোয় আটকে পড়ছে আয়ুর্বেদ এর উন্নতি। নাকি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পূর্বে আয়ুশের সমস্যাসমূহ তুলে ধরার সাহস দেখতে পারছেন না উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উত্তর যাইহোক সরকারের বোঝা উচিত স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার উন্নতিতে রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের যেমন প্রয়োজন আছে সেভাবেই জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও ব্লকস্তরে চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিপুষ্ট করতে সর্বাগ্রে গ্রামীন স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার উন্নতি ঘটানো ও আয়ুর্বেদ সিস্টেমকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে এও বলপ্রয়োজন যে, রাজ্যে কুকুরের ডায়ালিসিস নির্দেশ নামা খ্যাত এলোপ্যাথি চিকিৎসক আয়ুষ চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সর্বময় কর্তাব্যক্তি হন বা তাদের কাছে কি আর কাম্য? আবার অন্যদিকে এলোপ্যাথিক সংগঠন এর এক জাতীয় নেতা ও মাননীয় সাংসদ আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের হাফ বেকড কোয়াক বলার পরেও বাংলার আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা তাদের পদলেহন করেন সেই রাজ্যের শাসককুল কোনোদিন কি ভাববেন আয়ুর্বেদ এর উন্নতির কথা?

**(লেখক প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক)**

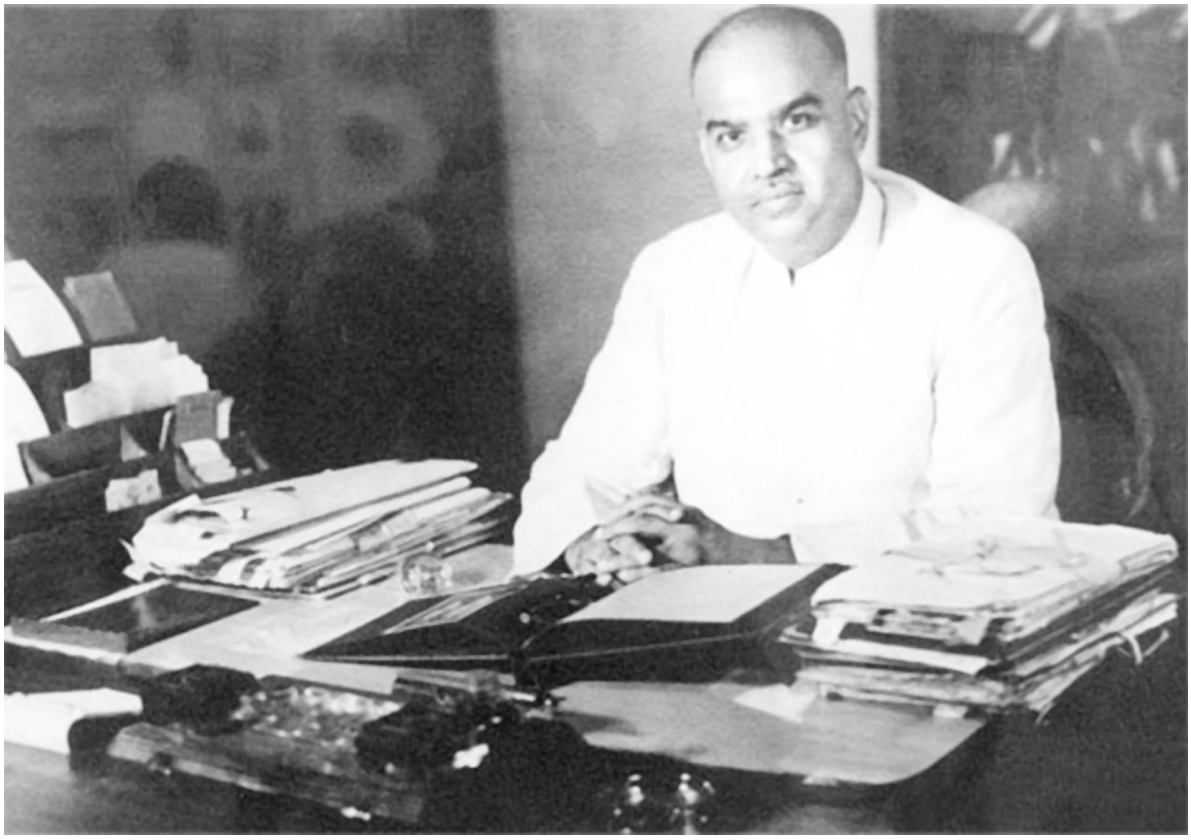

# পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৬ এর ১৬ই অগাস্ট শুক্রবার পাকিস্তানের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ('Direct Action Day') হিসাবে পালন করার কথা বলেন। অবিভক্ত বঙ্গে তখন ছিল সুহরাওয়ার্দি-র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সরকার। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে ১৬ই অগাস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের গুন্ডারা হিন্দুদের ওপর এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা নামিয়ে আনে। কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যাকে করা হয়, হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা হন এবং হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। ১৭ই অগাস্ট হিন্দুরা মুসলিম হামলা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। ১৮ তারিখ বাঙ্গালীর নেতৃত্বে শিখ ও বিহারীরা কলকাতার মুসলিম মহল্লাগুলোতে এক বীভৎস প্রতিহিংসা নামিয়ে আনে এবং প্রথম দিনের ক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে নেয়। কলকাতা দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়

নোয়াখালিতে। বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা নিয়ে মেঘনার বাম তীরে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি জেলা। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের এই জেলাতে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন উৎসবমুখর হিন্দু বাড়িগুলিতে এক ভয়ংকর বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। গণহত্যা, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ব্যাপকহারে নারী ধর্ষণ, মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা গোলাম সারওয়ার ছিলেন এই গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড। প্রায় দশহাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয় নোয়াখালিতে। এর থেকেও বেশি মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়। গোটা জেলায় এমন কোন বাড়ি ছিল না যার অন্তত একজন মহিলা ধর্ষিতা বা অপহৃতা হননি।

কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির গণহত্যার অভিজ্ঞতা থেকে কলকাতার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও শুভবুদ্ধিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেন যে, হিন্দুরা শত চেষ্টা করলেও মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব- বিশেষত যেখানে মুসলিমরাই দুই বঙ্গ মিলিয়ে সংখ্যাগুরু। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব প্রথমে কলকাতাসহ সমগ্র বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসি নেতৃত্বও এই বিষয়ে কিছু মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দু জনমত প্রবল থাকায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব অন্য চাল দেয়।

সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব বুঝে মুসলিম লীগ নেতা কট্টর ধর্মান্ধ সুহরাওয়ার্দি হঠাৎ বাঙ্গালী-র ভেক ধারণ করলেন। তিনি বললেন- দুই বাংলা নিয়ে অখণ্ড বঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক- যা কিনা ভারত-পাকিস্তান কোন পক্ষেই যোগদান করবে না। কিন্তু অখণ্ড বাংলাতেও বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যালঘু হত। জিন্নাহও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে হয়ত এই অখণ্ড বঙ্গ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে যোগদান করত। যাই হোক, সুহরাওয়ার্দির পাতা ফাঁদে পা দিলেন কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়। কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালি গণহত্যায় সুহরাওয়ার্দির ভূমিকার কথা তাঁরা ভুলে গেলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে ভাগ করা, সেই সময় থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন বাঙ্গালী হিন্দুদের বিষয়টি বুঝিয়ে জনমত তৈরি করার জন্য। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তিনি প্রচণ্ড বেগে সারা বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন এবং বড় বড় জনসভায় ভাষণ দিয়ে মানুষকে বাংলা ভাগের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে লাগলেন। তিনি কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখলেন যে, তারাও যেন এই দাবীকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭-এর ১৫ই মার্চ কলকাতায় হিন্দু মহাসভা একটি দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে লর্ড সিনহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান, হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকা বহু মানুষও উপস্থিত হন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে বাংলা প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হবে। এই সভায় একটি কমিটিও গঠিত হল যাদের কাজ হবে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা যা সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-র ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লেখা হয় - "সম্প্রতি বাংলার কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী- কারণ বাংলার লীগ শাসনাধীনে, বাঙ্গালী হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি, ডঃ প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।"

বাংলা ভাগ করা উচিত কিনা এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৪৭-এর ২৩-এ মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত একটি জনমত সমীক্ষা করে। ফলাফল ঘোষিত হয় ২৩-এ এপ্রিল। এতে মোট ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৯ টি উত্তর আসে। এর মধ্যে ১.১% উত্তর বাতিল হয়। বাকি উত্তরের মধ্যে ৯৮.৩% বাংলা ভাগের পক্ষে ও ০.৬% বিপক্ষে মত দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০.৪% ছিল মুসলমান। অর্থাৎ, এ সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন তা বোঝা যায়।

১৯৪৭-এর ২৩-এ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কেন বাংলা ভাগ করা দরকার। এই পরিকল্পনা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ এবং মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলি বড়লাটের আপ্তসহায়ক লর্ড ইসমে-র কাছে দিয়ে আসেন। ১৯৪৭-এর মে মাসে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস একত্রে জনসভা ডাকে যার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যর যদুনাথ সরকার। ১৯৪৭-এর ২ রা মে শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই তথ্যনির্ভর পত্রে তিনি বাংলাভাগের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। এই চিঠিতে বাংলা ভাগের দাবী করে শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে, "Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan."

কলকাতার ব্রিটিশ মালিকানাধীন দৈনিক 'The Statesman' ১৯৪৭-এর ২৪-এ এপ্রিল "Twilight of Bengal" শিরোনামে একটি সংবাদে লেখে, গত ১০ সপ্তাহের মধ্যে বাংলা ভাগ করার আন্দোলন একটি ছোট মেঘপুঞ্জের আকার থেকে একটি বিশাল ঝড়ের আকার নিয়েছে এবং এই ঝড় পুরো প্রদেশ জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যদিও এর কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কলকাতা। এই ঝড় আরম্ভ করেছিল হিন্দু মহাসভা।

ইতিমধ্যে শরৎ বসু ও আবুল হাশিম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করেন। বর্ধমানের মানুষ এই আবুল হাশিম ছিলেন বাংলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি- যিনি কলকাতা দাঙ্গার আগে খুব স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু খুন করতে উস্কানি দিয়েছিলেন। এই খসড়া সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সবসময়েই হবেন একজন মুসলিম এবং সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সমিতি থাকবে তাতে ৩০ জনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (১৬ জন) হবেন মুসলমান। অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখার একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে রাখা হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এইসময় চেষ্টা করছিলেন "সুহরাওয়ার্দি-শরত বসু-হাশিম" এই ত্রয়ীর এই ভয়ংকর পরিকল্পনাকে বানচাল করতে। ১৯৪৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে গান্ধী ও নেহরু-কে তিনি বাংলা ভাগের পক্ষে বললে তাঁরা খুব একটা নির্দিষ্ট করে কিছু জানান নি। ১৯৪৭-এর ১৩ই মে শ্যামাপ্রসাদ সোদপুরে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সুহরাওয়ার্দির যুক্তবঙ্গের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। গান্ধী বলেন, তিনি এখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি। শ্যামাপ্রসাদ যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে পারেন কি না? স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গান্ধী এর কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল খুব দৃঢ়ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠিতে জানান জানান যে, শ্যামাপ্রসাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। বাংলার হিন্দুরা যতদিন নিজেদের স্বার্থ বুঝছে এবং সেই অবস্থান থেকে না সরছে ততদিন ভয়ের কোন কারণ নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার ডাক মুসলিম লীগের পাতা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বাংলাকে কখনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবী নিয়ে সোচ্চার হতেই কংগ্রেসিরা দেখল তাদের ভোটার যারা- সেই হিন্দুরা (বাংলার মুসলিমরা প্রায় সকলেই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল) তাদের নপুংসকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। তখনই বাংলার কংগ্রেস দল নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবী তোলে ১৯৪৭-এর ৪ঠা এপ্রিল। বাংলার আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য পূরণের জন্য ৭৬ টি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৫৯ টির আয়োজন করে বাংলার কংগ্রেস কমিটি, ১২ টির আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং পাঁচটি যৌথভাবে আয়োজিত হয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭ এর ২০-এ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের পশ্চিম অংশের সদস্যরা বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ করে বাঙ্গালী হিন্দুর হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই কীর্তি (পশ্চিমবঙ্গ গঠনে) তাঁর জীবনীকার তথাগত রায়ের মতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। নেহরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, "আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।" উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।" কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তী লিখেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেন এবং দেশভাগের ভিতর আরেকটা দেশভাগ করিয়ে দিলেন।

**(লেখক- ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)**

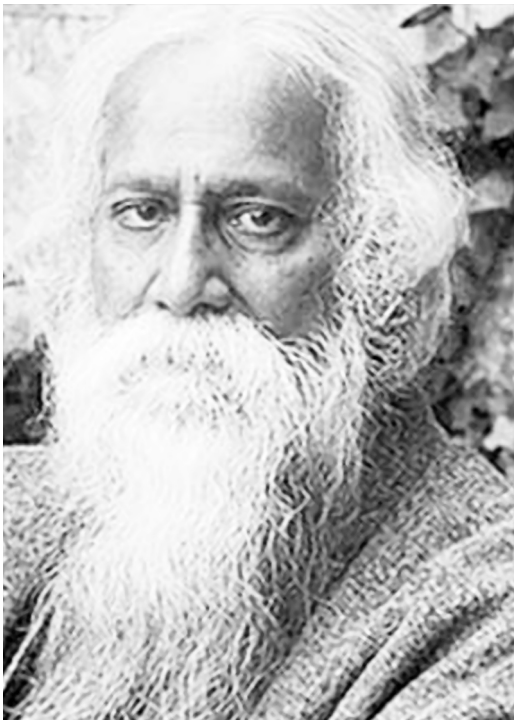

# বিজেপি-র হিন্দুত্বের "আইকন" রবীন্দ্র-নজরুল

ইন্দ্র উপাধ্যায়

কেউ বিরক্ত হন, কারও বা সত্যি অসুবিধা তবু মন্ডপ থেকে গলিগর্ধবে গান ভেসে না এলে কেমন যেন পুজো হচ্ছে বলে মনেই হয় না। সে গানের কত না প্রকারভেদ। কোনওটা পছন্দের, কোনওটা বা নয়। মাঝেমধ্যে শোনা যায় কিছু ভক্তিগীতিও। "বল রে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণ তল", "মহাকালের কোলে এসে", "শ্মশান কালীর নাম শুনে রে ভয় কে পায়", "আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন" এমনই কয়েকটি বহুশ্রুত মধুর মাতৃ সংগীত কম বয়সে এসব শ্যামাসংগীত যখনই শুনেছি, ভেবেছি হয়ত রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বা তাঁদেরই মতো কোনও কালীসাধকেরই রচনা। বড় হয়ে যখন জেনেছি কোনও কালীসাধকের নয়, এমন সব কালোত্তীর্ণ গানের রচনাকার কাজী নজরুল ইসলাম।

স্বভাবতই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লেগেছে। প্রশ্ন জেগেছে, একজন মুসলমান কী করে হিন্দু দেবতা মা কালীর এমন মাহাত্ম্যকীর্তন করতে পারেন? নিরাকার সাধনপথের পথিক কেমন করে এমন পৌত্তলিক ভক্তিসংগীত লেখেন? একটা-দুটো নয়, প্রচুর। শুধু মা কালীকে নিয়ে নয়, দেবী দুর্গাকে নিয়ে আগমনী ও বিজয়া গান, নানা দেবদেবীকে নিয়ে বন্দনামূলক ভক্তিগীতি কতইনা লিখেছেন তিনি। "এলো রে এলো রে ওই রণরঙ্গিনী শ্রী চণ্ডী", "তাপসিনী গৌরী কাঁদে", "শিব অনুরাগিণী গৌরী", "জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা", "মাগো আজও বেঁচে আছি তোরই প্রসাদ

পেয়ে”— এ ধরনের অজস্র তাঁর গান বেঁচে আছে জনগণের কাছে লেখক তথা সুরকারের পরিচয় ছাড়াই। “গরজে গম্ভীর গগন কম্বু”, “জাগো ভৈরব”, “সৃজন ছন্দে আনন্দে”, “কে শিব সুন্দর শরৎ-চাঁদ-চূড়”, ইত্যাদি অনেক শিবসংগীতও লিখেছেন নজরুল। শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণকে নিয়ে গান বেঁধেছেন—“জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী”, “জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী”, “কারা পাষাণ ভেদী জাগো নারায়ণ”, “ফিরে এল সেই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি” ইত্যাদি। পদাবলী কীর্তন লিখেছেন—“আমি কেন হেরিলাম নব ঘনশ্যাম একি অপরূপ রূপের কুমার”, “ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরায়”, “মোর মাধবশূন্য মাধবী কুঞ্জে”, “সখি যায়নি শ্যাম মথুরায়”। হিন্দুস্তানী ভজন সংগীতের প্রভাব তাঁর বহু গানে— “ওগো নন্দদুলাল নাচে ছন্দতালে”, “নাচো শ্যাম নটবর”, “নীল যমুনা সলিল কান্তি চিকন ঘনশ্যাম”, “ভেঙো না ভেঙো ধ্যান” ইত্যাদি।

স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় বঙ্কিমের মতো নজরুলও দেশের সঙ্গে দেবী দুর্গাকে মিলিয়েছেন নির্দ্বিধায়। আবদুল আজিজ আলআমান সম্পাদিত “নজরুল রচনা সম্ভার (হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৯)-এর তালিকা অনুযায়ী ইসলামি গান বাদে নজরুলের লেখা ৫৪১টি ভক্তিগীতি পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৭৫ টি হল শাক্তপদাবলী। শাক্ত বলতে ধরা হয়, দুর্গা, উমা, শ্যামা, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীকে নিয়ে রচনা।

মুসলমান হয়েও নজরুলের এহেন আচরণ আপাত বিস্ময়ের হলেও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বরং ভারতের শাশ্বত, সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে তা একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ। এটাই ভারতের বিশিষ্টতা। ভারত নামক এই দেশটা সদ্য গজিয়ে ওঠা কোনও ভূখণ্ড নয়, এর সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন অনেক প্রাচীন। অনেক সভ্যতার উত্থান ও বিনাশ সে প্রত্যক্ষ করেছে। বৈদেশিক শত ঘাত-প্রতিঘাত তাকে বিনষ্ট করতে পারেনি, এমনই তার আন্তরিক শক্তি। সেই শক্তি মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটায়, বিচ্ছেদ নয়। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসভায় তাই নিজেকে এমন দেশের ও ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করেছিলেন, যেখানে ইংরেজি “এক্সক্লুসন” শব্দটির কোনও স্থান নেই। অর্থাৎ এমন এক সনাতন ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা যা কাউকে বাদ দেয় না, সব কিছুকেই আত্মস্থ করে নেয়। তাই “সনাতন”, “হিন্দু”, “ভারতীয় সর্বপ্রাচীন” যে বিশেষণই ব্যবহার করি না কেন, ভারতে ধর্ম বলতে কোনও বিশেষ উপাসনা পদ্ধতিকে বোঝায় না, বোঝায় এক এক জীবন দর্শনকে, যা সর্বজনীন, যা সকলকে এক সূত্রে বেঁধে দেয়। এই জীবনদর্শনকে যে উপলব্ধি করতে পারে, আন্তরিক সমস্ত সংকীর্ণতা তার দূর হয়ে যায়, ব্যক্তিজীবনে ঈশ্বর-উপাসনার কোনও বিশিষ্ট পথের অনুসারী হলেও জাতীয় জীবনের মূল ধারা থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় না।

কাজী নজরুল ইসলাম এরকমই ছিলেন বলে নিজে মুসলমান হয়েও ইসলাম ধর্মের প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি, আনুগত্য রেখেও হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা গান লিখতে, কবিতায় হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের নাম ব্যবহার করতে তাই তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয়নি, পরোয়া করেননি কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনার। যদিও ইসলামি গানও তিনি লিখেছেন অসংখ্য।

ইসলামের মতোই ব্রাহ্মও পৌত্তলিকতাবর্জিত ঈশ্বর সাধনার পদ্ধতি। একসময় ব্রাহ্মসমাজের তাবড় তাবড় নেতা হিন্দু সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে জাহির করতেই অতি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। নিজে ব্রাহ্ম হয়েও রবীন্দ্রনাথ এহেন আচরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। “পরিচয়” প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘ব্রাহ্মসমাজকে আমি হিন্দু সমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি।’ ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির অনুসারী হওয়ার অর্থ যে জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, নজরুলের মতো রবীন্দ্রনাথও তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বহু রীতি-নীতির কঠোর সমালোচক হয়েও তিনি ওই প্রবন্ধেই বলেছেন, ‘আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?’

আবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, ‘তবে কি মুসলমান অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার?’ ‘নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্র নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন অর্থাৎ জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে... তাহারা প্রকৃতই হিন্দু মুসলমান।’

ইংরেজি “রিলিজিয়ন” শব্দের ঘেরাটোপে যে হিন্দু ধর্মকে বাঁধা যায় না, হিন্দু সে অর্থে কোনও সম্প্রদায়গত ধর্ম নয়, হিন্দু বলতে বোঝায় একটা জীবনাদর্শনকেই, সে কথা রবীন্দ্রনাথও সুস্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন। ওই প্রবন্ধেই লিখেছেন, ‘হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বোঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতপরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টান হইয়াছিলেন বলিয়াই এক সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক অন্তরতর, মত পরিবর্তন হইলে জাতির

পরিবর্তন হয় না।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭২, ১৭৪-৭৫)।

নিজের ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কেও তাই একথা বলতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হননি যে, 'আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়া চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই— এই বিশেষত্বের মধ্যে বহু শত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে।' (ওই, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

হিন্দুত্বের এই ব্যাপ্তিতে তাঁর বিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এই "পরিচয়" প্রবন্ধে সংকীর্ণমনা যেসব হিন্দু অহরহ অন্য সম্প্রদায় ও উপাসনা পদ্ধতিকে আপন বলতে অস্বীকার করে এবং সেইসঙ্গে যারা ওতপ্রোতভাবে হিন্দু ঘরানার হয়েও নিজেদের তা থেকে ভিন্ন দেখতে ব্যস্ত হয়, তাদের বিদ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। হিন্দুদের মধ্যে একটা "ঐক্যজাল"-এর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা (ঐক্যজাল) আমাদের সকলকে বাঁধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে, তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাঁদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা খায় না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং স্ববর্ণে বিবাহ করে সেই হিন্দু, তবে বড়ো সত্যকে ছোট করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।'

হিন্দুত্বের এই "বড়ো সত্য"টাকে ধরলে মুসলমান হয়েও নজরুল শ্যামাসংগীত লিখেছেন বলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। তেমনি এ ধরনের লেখার জন্য সেদিন তাঁর নিজের ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই যাঁরা তাঁকে "কাফের" আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরাও নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। নজরুল অবশ্য এজন্য কিছুমাত্র বিচলিত হননি, নিজের বিশ্বাসেই সারা জীবন অটল থেকেছেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার মুসলমান সমাজ (আমাকে) কাফের খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না।... হিন্দুরা লেখক অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন তাঁদের সেই ঋণকে অস্বীকার যদি করি তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

নজরুল মনেপ্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। ইংরেজি "সেকুলার" শব্দের যথার্থ পরিভাষা যদি "সর্বধর্মসমভাব" হয়, তাহলে বলতে হয়, নজরুল ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক। 'হিন্দু মুসলমানদের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে পোড়ো দেশের কিছু হবে না' এবং 'একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এই অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে' বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি। এব্যাপারে তাঁর নিজের মুসলমান সমাজ থেকে তেমন সাড়া পাননি বলে যথেষ্ট বেদনা ছিল মনে।

১৯৩৪ সালের "সওগাত" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতে বলেছেন, 'হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কী না কষাঘাত করেছেন সমাজকে—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি, কিন্তু এই হতভাগ্য মুসলমানদের দোষত্রুটির কথা পর্যন্ত বলার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়তো ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দু জাতি যে এক নব বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে তার কারণ, তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।'

নজরুল ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে ভারতের চিরন্তন সমন্বয়বাদী মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সব পথের শেষে যে "সত্য"-এর অধিষ্ঠান, তার প্রতি দৃষ্টি একান্তভাবেই নিবদ্ধ ছিল বলেই নজরুল কোনও বিশেষ পথে নিজেকে বাঁধেননি, হয়েছেন সর্বত্রগামী। তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষাতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে— আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না, আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির ঊর্ধে যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম' তাঁরই দান হয়ে। শাশ্বত ভারত চেতনার মূর্ত প্রতীক হয়ে তাই তিনি চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। বিজেপি'র হিন্দুত্বের যে ধারণা, যাতে এক জাতিত্বের মধ্যে উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত, কাজী নজরুল তার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন, আধুনিক ভাষায় "আইকন"। রবীন্দ্রনাথের মতোই।

**(লেখক- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)**

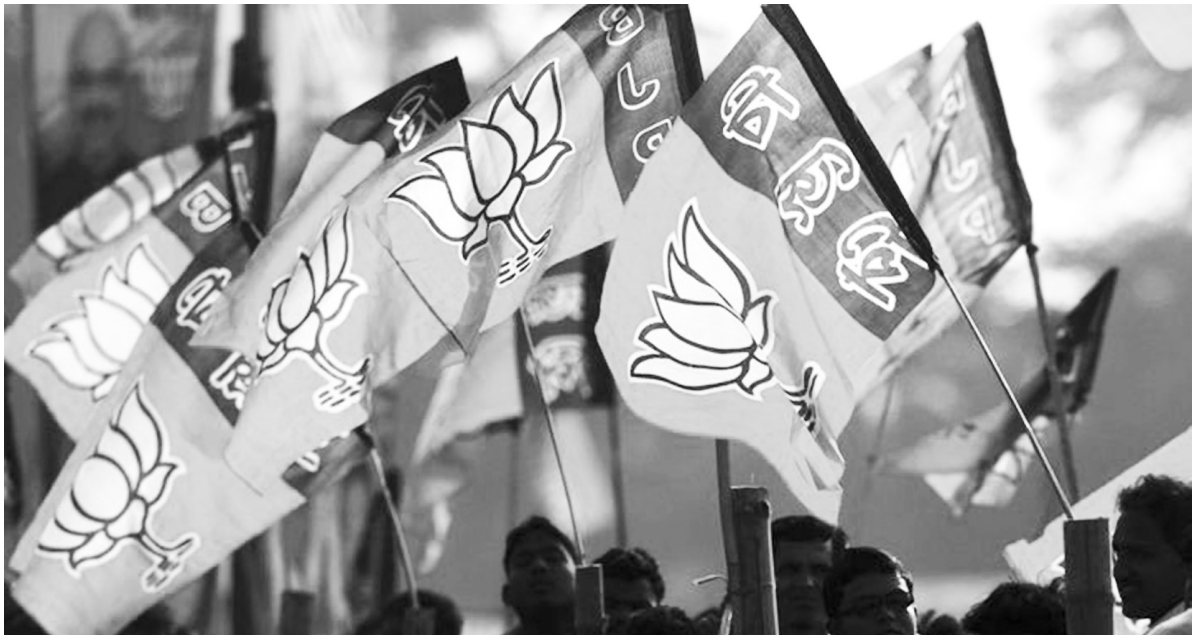

# বিজেপি কি বাংলা বিরোধী

## বিনয়ভূষণ দাশ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বিরোধী দলগুলি এক নতুন ধুয়ো তুলেছে, বিজেপি দল বাংলাভাষা এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিরোধী দল।বিজেপির সংস্কৃতিতে বাংলার কোন স্থান নেই! সমবেত এই হুঙ্কারবে যোগ দিয়েছে বামপন্থী দলগুলো, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর দল।কিন্তু ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই দলগুলির প্রত্যেকটির ডি এন এ তেই আছে ভারত তথা বাংলা বিরোধী রাজনীতির ঐতিহ্য। কংগ্রেসের সৃষ্টিই করেছিলেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালান অটাভিয়ান হিউম। উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসদলের ভেতরে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয়দের আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়া, হাল্কা করে দেওয়া। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ভুমিকা থেকেই সেটা স্পষ্ট; ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিভাজন থেকেই তা স্পষ্টতর। আর এহেন কংগ্রেসের দলছুট গোষ্ঠীই হল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। এই দলটি তার মূল দল কংগ্রেসের নীতি, আদর্শ এবং নেতাদের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত। মূলত এই দলের নেত্রীর উদগ্র ক্ষমতালিপ্সাই এই দলগঠনের মুল কারণ। জওহরলাল ও ইন্দিরার আদর্শের উত্তরসূরি এই দল। ফলে এই দলও কংগ্রেসের মতই বিদেশী ভাবধারায় প্রাণিত; তার সাথে যোগ হয়েছে চরম মুসলিম তোষণ কারী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সোচ্চার ঘোষিত সমর্থক ও অনুপ্রেরনাদাতা। বিজাতীয় আরবীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালিত এই দল পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন ইসলামী বাংলা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। এদের ভারতের পরম্পরার প্রতি আনুগত্য এমনি যে এরা ইসলামের ভারতীয়করণ করতে রাজী নয় বরং ভারতের ইসলামীকরণের সোচ্চার সমর্থক।

বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে আরবীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে এই দল। বাংলাভাষার মধ্যে উর্দু ও আরবীভাষার শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এক বিচিত্র বাংলাভাষার আমদানি করেছে এই দল। আর পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তথা দুটি যুক্তফ্রন্টের রাজত্বের আরও কয়েক বৎসর রাজত্ব করা বিভিন্ন ব্রান্ডের বামদল গুলির সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মতই এঁদের নানান অবতার! কখনো মহম্মদ হাদি, কখনো করতলব খাঁ, আর কখনো বা মুর্শিদকুলী খাঁ ! সিপিআই, সিপিআই(এম), সিপিআই(এম এল); আবার এই এম এল গোষ্ঠীর মধ্যেও নানান উপগোষ্ঠী! কিন্তু সব গোষ্ঠীরই আদর্শের টিকি বাঁধা আছে হয় রাশিয়া, নয় চিন, ভিয়েতনাম, কিউবা বা অন্য কোন দেশের কাছে।

এই দলগুলির প্রথম অবতারের সৃষ্টিই হয়েছিল দেশের বাইরে, মূলত রাশিয়ার অনুপ্রেরণায়। সৃষ্টিকর্তাদেরপ্রায় সবাই ছিল বিদেশী।বাংলা তথা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধিতা এঁরা শুরু থেকেই করে আসছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের সর্বনাশের মূল কারণ এই বামপন্থী দলগুলি এবং তাঁর একদা চরম শত্রু তথা বর্তমান অভিন্নহৃদয়দোসর কংগ্রেসীরা। বর্তমান বাংলা এবং বাঙ্গালীর দুর্দশার মূল কারণ নিহিত আছে এই কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূলের দীর্ঘ রাজত্বে। মজার ব্যাপার হল এই দলগুলিই আবার বিজেপিকে বাংলা এবং বাঙ্গালী বিরোধী হিসেবে দেগে দেবার সমবেত চেষ্টায় রত। কোন বিজেপিকে ? না সেই বিজেপিকে যার আদি প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের অন্যতম প্রধান পুরোধা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।বিজেপির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। তাঁরই আদর্শ এবং অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে বিজেপি এগিয়ে চলেছে। ভারতে একমাত্র দল বিজেপি যারা একই সঙ্গে তিন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আদর্শকে পাথেয় করে, সম্পূর্ণ 'ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির' উপর ভিত্তি করে বিদেশী প্রভাবমুক্ত এক নতুন ভারত গঠনে এগিয়ে চলেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের উপাচার্য থাকাকালে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ কবি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলায় ভাষণ দান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করে বাংলায় তাঁর ভাষণ দান করেন। শ্যামাপ্রসাদ উচ্চশিক্ষা প্রসারে মাতৃভাষা বাঙ্গলাকে গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বাংলায় বানানের সমতা আনয়ন এবং বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে তিনি একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। আবার কাছাকাছি সময়ে তিনি বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে অনেক কার্যকর ভুমিকাও গ্রহণ করেছিলেন।

চল্লিশের দশকে বাংলায় এ কে ফজলুল হক বাঙ্গালী মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁর তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেলেও সাধারণভাবে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির নীতি জিন্নাহর লীগপন্থী নেতারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাঁরা নানা অছিলায় তাঁকে বাঙ্গালি মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় প্রতিপন্ন করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এজন্য তাঁরা বাঙ্গালি মুসলমানদের কাছে প্রচার শুরু করল যেবাংলাভাষা এবং সংস্কৃতি ইসলাম-বিরোধী। সুতরাং প্রকৃত মুসলমানদের কাজ হবে উর্দুভাষা ব্যবহার করা এবং আরবীয় ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণ করা। মুসলিম লীগের এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বাংলার নানা প্রান্তে ' উর্দু অ্যাকাডেমি' গড়ে তুলে বাংলাভাষা বিরোধী প্রচার শুরু হল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ জিন্নাহ ও তাঁর লীগপন্থী সাগরেদদের এই বাংলা বিরোধী প্রচার মেনে নিতে পারলেন না। উল্লেখ্য যে, তখন তিনি শিক্ষা জগতেই বিরাজ করছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি বাংলাভাষা ও বাঙ্গালির উন্নতিতে আস্থাশীল এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ফজলুল হকের পাশে দাঁড়ালেন। তাঁদের দুজনের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠল 'বেঙ্গলি প্রোটেকশন লীগ' নামে এক সংস্থা। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর। এইভাবে তৎকালীন বাংলার দুই সুপরিচিত রাজনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাবিদ ব্যক্তিত্ব পরস্পরের কাছাকাছি এলেন, বাংলার রাজনীতি- সংস্কৃতি এক নতুন মাত্রা পেল। তাঁরা উভয়ে প্রচার করলেন, বাঙ্গালি মুসলমানেরা যেন উর্দুভাষীদের এই চক্রান্তমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হন। তাঁদের এই উদ্যোগ সফল হয়েছিল; উর্দুভাষীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভাষা ও সংস্কৃতির পরিস্থিতিও একই রকম। দাঁড়িভিটের স্কুলে জোরকরে উর্দুশিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে উর্দু সম্প্রসারণবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। কলকাতা, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে নামফলক লেখা হচ্ছে উর্দুতে, বাংলা এবং বাঙ্গালির ভাষা বাংলা থাকছে না ওই সমস্ত নামফলকে। কলকাতার ৪৪ নং ওয়ার্ড, রাজাবাজার ইত্যাদি অঞ্চলেও বোধহয় পরীক্ষামূলকভাবে সাইনবোর্ড বাংলা বাদ দিয়ে উর্দু এবং ইংরাজিতে লেখা হয়েছে। আর এগুলি সবই হচ্ছে উর্দু তথা আরবীয় ভাষা ও সংস্কৃতিপ্রেমিক তৃণমূল দলের নেতানেত্রীদের প্রত্যক্ষ মদতে। অথচ, বিজেপিকে দেগে দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ও বাংলাভাষা বিদ্বেষী হিসেবে।

এঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, বিজেপিই একমাত্র দল যার আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠাতা এক বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিপ্রেমিক, উচ্চশিক্ষিত, বিদ্বান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আবার গণিতবিদ আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ এই দলের পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘের দুবারের নির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনিও বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধাব্যক্তিত্ব। আজও দাড়িভিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষা এবং বাঙ্গালি স্বাভিমানের আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে ভারতীয় জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি বিজেপির নেতারাই। যে দলের নেতারা প্রতিদিনের প্রাতঃস্মরণ বা ভারতভক্তি স্ত্রোত্রম অনুশীলনের মাধ্যমে উচ্চারণ করে থাকে শ্রীচৈতন্যদেব, জগদীশচন্দ্র বসু,শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের নাম; উচ্চারণ করে "রামকৃষ্ণ দয়ানন্দ রবীন্দ্র রামমোহনঃ। রামতীর্থোহরবিন্দশ্চ বিবেকানন্দ উদ্যশাঃ।।" অথবা "সুভাষঃ প্রনবানন্দঃ ক্রান্তিবীরো বিনায়কঃ। ঠক্করো ভীমরাওশ্চ ফুলে নারায়ণো গুরুঃ।।"— সেই দল বা তার নেতাদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিবিরোধী বলে দেগে দেওয়া এক চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়! এই মিথ্যাচার দিয়ে কি বাংলার মানুষের বিজেপির প্রতি এ 'জলতরঙ্গ' রোধ করা যাবে?

**(লেখক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক ও প্রাবন্ধিক)**

# পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস: ২০শে সেপ্টেম্বর

## মোহিত রায়

বাংলা ভাষা নিয়ে সংগ্রাম আন্দোলনের কথা এলেই ২১শে ফেব্রুয়ারি চলে আসে যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন যোগ নেই। ভাষা দিবস বা বাঙলা ভাষা প্রেমের সবটা বাহবাই বাংলাদেশকে দেওয়া হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ঢাকায় ঘটা বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ৪ জন মুসলমান যুবকের নিহত হবার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে অতি পরিচিত। এই ভাষাপ্রেমের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। পাকিস্তান সরকার তা মেনেও ছিল ফলে পাকিস্তানের টাকা থেকে ডাকটিকিট — সবেতেই উর্দু, ইংরাজীর সঙ্গে বাংলাও থাকত। ১৯৭২ এ বাংলাদেশ গঠিত হবার পর এই ঘটনার প্রচার হয়েছে আকাশচুম্বী। যদিও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ গঠনের সঙ্গে বাংলা ভাষা আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। একটু শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিই সালাম-বরকত-আবুল-জব বারের নাম জানে। কিন্তু ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে অসমের শিলচরে বাংলা ভাষার জন্য ১১ জন আত্মবলিদানকারীদের কথা খুব কম বাঙালি হিন্দুই জানে। এমনকি পশ্চিমবাংলার নামিদামি সাহিত্য পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী সবাই এ ব্যাপারে নীরব। এই আত্মবলিদানকারীদের একজন নারী - কমলা ভট্টাচার্য। আরো একটা বড় কথা এই ১১ জন আত্মবলিদানকারীদের মধ্যে ৯ জনই হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু। হিন্দু বাঙালিকে কেন বাংলা নিয়ে গর্বের স্থান পূর্ব পাকিস্তান / বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ হতে হয় এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চুপ। এই আত্মবলিদানকারীদের নামে কলকাতায় বা অন্যশহরে কোন রাস্তা নেই, কোন স্মারক স্তম্ভ নেই। আসলে বাংলাভাষী হলেই সে বাঙ্গালী হয় না, তাঁকে পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার স্বীকার করতে হয়। সেজন্য বাংলাদেশী মানেই বাঙ্গালী নয় একথাটা আমাদের আজ বোঝার দরকার। অথচ ঢাকার ২১শে ফেবরুয়ারির ভাষা-শহীদ স্মারকের অনেক নকল এখন কলকাতা ও অন্যান্য শহরে দেখতে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে এটা তৃণমূল জমানার অবদান। এই অবস্থায় আজকের বামপন্থী সেকুলার বুদ্ধিজীবী কন্টকিত ও তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামী মৌলবাদী তোষণের পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃ হয়ে উঠছে পশ্চিম বাংলাদেশ - জনসংখ্যা, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার বিকৃতিতে।

এরকম একটি পশ্চিমবঙ্গে ২০১৮-র ২০শে সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার দাড়িভিট হাইস্কুলে চলল গুলি। দাড়িভিট হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের দাবী ছিল বাংলা ও বিজ্ঞান শিক্ষকের। এই স্কুলে উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রী নেই। স্থানীয় মুসলিম তৃণমূল নেতার তৎপরতায় সরকারের বিদ্যালয় দপ্তর পাঠালো বাংলা ও বিজ্ঞান শিক্ষকের জায়গায় উর্দু শিক্ষক এবং সংস্কৃত শিক্ষক। অবাঞ্ছিত উর্দু শিক্ষকের নিয়োগকে একটু সহনশীল করার জন্য সম্ভবতঃ সংস্কৃত শিক্ষককের নামটাও যুক্ত করা হয়েছিল। ছাত্ররা মানে নি, প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিলেন গ্রামবাসীরা। অতএব পুলিশ, সামান্য উত্তেজনাতেই গুলি এবং দুই প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মনের মৃত্যু। এর প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ সপ্তাহখানেক উত্তাল হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংঠন মিছিল মিটিং করে। বিজেপি ২৬ শে সেপ্টেম্বর বাংলা বন্ধ ডাকে। এই বনধকে সফল করতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির তৎকালীন যুবমোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার দাড়িভিট গেলে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর উপর পুলিশ অত্যাচার চালায় যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে জামিনে মুক্তি পান। পাশাপাশি মৃতদের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানায় এবং মৃতদেহদুটির সৎকার করতে দেয় না। শবদেহ দুটি মাটি চাপা দিয়ে গ্রামেই রেখে দেওয়া রয়েছে।

দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়টি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত। পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উত্তর অংশ নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা গঠিত হয় ১৯৯২ সালে। এর সম্পূর্ণ পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৮১ সালে এই জেলার (১৯৯২ পরবর্তী জেলাটির অঞ্চলের) হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৬৩.২৬%, মুসলমান ৩৫.৭৯%। জ্যোতি বসুর কমুনিস্ট রাজ একদশকের মধ্যে এই জেলায় মুসলমান অনুপ্রবেশের ঢল নামিয়ে মুসলমান জনসংখ্যা অভাবনীয় বাড়িয়ে দেয় ৯.৫%। ১৯৯১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা কমে হয় ৫৪.২%, মুসলমান বেড়ে ৪৫.৩৫%।

তৃণমূলের দোয়ায় ২০১১ সালে সবুজ নিশান উড়িয়ে উত্তর দিনাজপুর মুসলমান প্রধান জেলা হয়ে যায়। ২০১৮ তে অবস্থা যে আরো ভয়ানক তা বলাই বাহুল্য।

এহেন জেলার গ্রামগুলির অবস্থা আরো ভয়ানক। উত্তর দিনাজপুরের শহরগুলিতে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ভালো হলেও গ্রামাঞ্চলে তা যথেষ্ট কম। দাড়িভিট স্কুলটি ইসলামপুর মহকুমায়। ইসলামপুর শহরে হিন্দু জনসংখ্যা ৬৭% (২০১১) হলেও ইসলামপুর মহকুমায় গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা মাত্র ২৭% (২০১১)। দাড়িভিট স্কুলটি থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব সামান্য, ২ কিলোমিটার মাত্র। এই হল স্থান।

## উত্তর দিনাজপুর জেলা

| | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|
| হিন্দু % | ৬৩.২৬ | ৫৪.২০ | ৫১.৭২ | ৪৯.৩১ |
| মুসলমান % | ৩৫.৭৯ | ৪৫.৩৫ | ৪৭.৩৬ | ৪৯.৯২ |

সূত্র - ভারত সরকারের জনগণনা রিপোর্ট

এই স্থান ও কালের ভয়াবহতাকে অগ্রাহ্য করে উর্দু ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় স্কুলের ছাত্ররা ও গ্রামবাসীরা।

## উর্দুর বিরুদ্ধে এবং হিন্দু বলেই কি গুলি ?

পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ এর জনগণনা অনুযায়ী উর্দুভাষির সংখ্যা ২ শতাংশ মাত্র। উর্দুর বিরুদ্ধে এবং হিন্দু বলেই কি গুলি চালাল তৃণমূলের পুলিশ? এরকম একটা কথা কি সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যায় না ?

তবে দেখা যাক কখন তৃণমূলের পুলিশ গুলি চালায়।

১ ডিসেম্বর ২০১১। সবে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। মগরা থানার মুসলিম অধ্যুষিত নৈনান গ্রামে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আধিকারিকেরা যান বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে। গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ কর্মীদের আটকে রাখে। পুলিশ তাদের উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে আক্রমণ করে গ্রামবাসী। পুলিশ গুলি চালালে ২ জন মুসলিম মহিলা মারা যান। সব দোষ চাপল পুলিশের ঘাড়ে। ৩ জন পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড হলেন, মৃতেরা ক্ষতিপূরণ পেলেন। ব্যস, পুলিশ বুঝে গেল তৃণমূল জমানায় কোথায় গুলি চালাতে হবে না।

২০ অক্টোবর ২০১২। রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে বাস চাপা পরে মারা যান স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আকিল। শুরু হলো তাণ্ডব। ৮৬টি বাস, ১১টি গাড়ি, ২টি ট্রাম ভাঙচুর করা হয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ট্রাম ও বাস ডিপোটি। পুলিশ গুলি চালায় নি, কিছুই করে নি।

২৮ নভেম্বর ২০১৪। জামাতে উলেমা হিন্দের নেতা (পরে মন্ত্রী) সিদ্দিকুল্লার নেতৃত্বে ময়দানে জনসভার নাম চলে সন্ত্রাস। ৩ জন আইপিএস অফিসার সহ ১১ জন পুলিশ আহত হন, পুলিশের ১১টি গাড়ি ভাঙচুর হয়। পুলিশ গুলি চালায় নি।

১৭ জানুয়ারী ২০১৭। মুসলিম অধ্যুষিত ভাঙড় অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিবহন কেন্দ্র (পাওয়ার গ্রিড) নির্মাণ নিয়ে বিরোধিতায় সেখানকার মানুষ পথ অবরোধ করে। তা সরাতে গেলে পুলিশের উপর প্রবল আক্রমণ হয়। ১০টি পুলিশের গাড়ি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অনেক পুলিশ আহত হন, অনেকে তাঁদের উর্দি খুলে পালান। পুলিশ গুলি চালায় নি, কিছুই করে নি।

১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯। CAA এর বিরোধীতায় তিনদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী জনতা অনেক রেল স্টেশন আগুনে পুড়িয়ে দেয়, জ্বালিয়ে দেয় কয়েকটি রেলগাড়ী, জ্বালিয়ে দেয় গোটা পঞ্চাশ বাস। পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে। পুলিশ কোথাও গুলি চালায় নি।

তাহলে দাড়িভিট স্কুলে কি এমন হয়েছিল যে পুলিশ গুলি চালায় ? দাড়িভিট স্কুলের বিক্ষোভে ছিল ছাত্র ও ছাত্রীরা। কিছু গ্রামবাসী। কারো কাছে কোন অস্ত্র ছিল না, কোন বোমাও ফাটে নি। পুলিশও সে দাবী করে নি। কিছু ঢিল ছোড়া হতেই পারে। কোন পুলিশের আহত হবার খবর নেই। তবু পুলিশ গুলি চালালো কেন ? কারণ একটাই, পুলিশ জানে যে তৃণমূল জমানায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের মারলে কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। পুলিশের লোকেরাতো সমাজেরই মানুষ। তাঁরা দেখছেন ইমাম ভাতা থেকে ফিরহাদ হাকিমের কলকাতার মেয়র হবার ঘটনা। দেখছেন কালিয়াচক, খাগড়াগড়, ধুলাগড়। সুতরাং তারা কোথায় গুলি চালাতে হবে বা হবে না তা ভালোই বোঝেন।

দাড়িভিটের রাজেশ তাপস, গ্রামবাসীরা এরকম প্রতিকূল অবস্থায় একটি ভাষা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিলেন প্রাণের বিনিময়ে। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল তার নিজস্ব ভাষা আন্দোলনের নান্দীমুখ। ইসলামী মৌলবাদী দাপটের বিরুদ্ধে উত্তর দিনাজপুরের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতে সেখানে বাঙালি হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা, গ্রামবাসীরা উর্দুর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার শিক্ষকের জন্য, বিজ্ঞান পঠনপাঠনের জন্য প্রাণ দিলেন রাজেশ, তাপস। এ শুধু একটি ভাষার আক্রমণের বিষয় নয়, এর সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী মৌলবাদের আক্রমণাত্মক নীতি।

দাড়িভিট আমাদের সুযোগ দিয়েছে বাংলা ভাষা ও বাঙালির নতুন পরিচয়কে সবার সামনে তুলে ধরতে,। দাড়িভিটের ঘটনা থেকে শুরু হতে পারে রাজ্য জুড়ে মাদ্রাসা বন্ধের আন্দোলন, মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা বন্ধের আন্দোলন। দাড়িভিটের প্রতিবাদ জন্ম দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব ভাষা আন্দোলন। সেজন্যই ২০শে সেপ্টেম্বর কে বলা চলে "পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস"।

**(লেখক- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, পরিবেশ বিজ্ঞানী ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা)**

# ভাষা কি শুধুই ভাষা, না এক সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি?

## সমু দেব

একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ বাঙালি আমলা কর্মসূত্রে চেন্নাইতে থাকতেন। পরিবার সাথে ছিল না। উনি মাঝে মাঝেই একটা আপাত অদ্ভুত কাজ করতেন। শহরের একটি নির্দিষ্ট অংশে রাতের দিকে একা একা যেতেন শুধুমাত্র একটি ভিক্ষুকের সাথে কথা বলতে। না উনি পাগল হয়ে যান নি। আদ্যোপান্ত একজন সৎ এবং কর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি। তাহলে একজন ভিক্ষুকের সাথে রাতে কী করতে যেতেন উনি? না , উনি বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করতেন সেখানে কারন ভিক্ষুকটি ছিলেন বাঙালি। কয়েক বছর আগে এক ভাগ্যবিপর্যয়ে সে এই শহরে এসে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রাম থেকে। অনেক শিক্ষিত বাঙালি চারপাশে থাকা সত্ত্বেও সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি এক নিঃস্ব মানুষের কাছে দুদণ্ড সময় কাটাতেন কারন বাঙলার নির্ভেজাল মাটির স্পর্শ উনি অনুভব করতেন সেই তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষটির সান্নিধ্যে। বাঙলা ভাষা বা মাতৃভাষাই আপাত-বিস্ময়কর এই অসম সম্পর্কের প্রেরণা।

ভাষা কখনোই শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়। ভাষা একটি সংস্কৃতির প্রতীক, একটি চলমান সভ্যতার স্পন্দন অনুভব করা যায় ভাষার গতিশীলতায়, একটি প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি ভাষার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় অতীত থেকে ভবিষ্যতে। বাঙলা এরকমই একটি ভাষা। প্রতিটা ভাষার মত বাঙলা ভাষারও নিজস্ব ইতিহাস আছে। এই সত্য যখন আমরা অস্বীকার করতে শুরু করব বা সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে আমাদের গ্রহন করতে বাধ্য করা হবে চরম অসত্য তখনই বাঙলা ভাষার অস্তিত্ব হবে বিপন্ন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে আসছে। এক তেলেগু সহকর্মীর সাথে কথা চলাকালীন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে সে আলাদা করে তামিল, কন্নড় বা মালয়ালি জানে কিনা। সে বলল কোন ভাষাই সে বিশেষ ভাবে জানে না, কিন্তু যেমন করে একজন বাঙালি অসমীয়া বা ওড়িয়া বুঝতে পারে সেভাবেই একজন তেলেগুভাষী দক্ষিন ভারতের অন্যান্য ভাষা বুঝতে পারে। সাধারন কথার মাধ্যমে একটা বড় সত্য বেড়িয়ে এল। দক্ষিন ভারতের ভাষাগুলোর মতোই বাঙলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার মধ্যে যোগসূত্র পরিস্কার এবং উৎপত্তিগত গভীর মিল রয়েছে।

ভাষাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বাঙলা ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত হলেও বাঙলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া, এই তিন ভাষাই মাগধী অপভ্রংশ থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয়। তিনটি ভাষার আপাত সাদৃশ্যের পেছনে রয়েছে এই উৎপত্তিগত সত্য। অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য আছে বলেই এই তিন ভাষার অবস্থান কাছাকাছি। অবিভক্ত বাঙলার বা স্বাধীনতা পূর্ব পূর্ব বঙ্গের বেশ কিছু জেলার ভাষার সঙ্গে অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য ভাষার অসংখ্য মিল পাওয়া যায়। এখানে অসমের ভাষা বলতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথাই বলা হচ্ছে, বরাক উপত্যকা সবসময়ই ঐতিহাসিকভাবে বাঙলার থেকে আলাদা ছিল না। একই ভাবে, মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত ভাষা আর ওড়িয়া ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙলা ভাষা প্রাথমিক বা মূল চরিত্রগত বিচারে পৃথক হলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ভাষার সাথে স্পষ্ট মিল কি করে পাওয়া যায়।

যে কোন ভাষার মতো বাঙলা ভাষাতেও বিভিন্ন সময়ে কালের স্বাভাবিক গতিতে অনেক বিদেশী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। কত আরবি, ফার্সি, ইংরিজি, পর্তুগিজ শব্দ বাঙলার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। কখনোই তাতে বাঙলা ভাষা বিপন্ন বলে কেউ মনে করে নি কারন ভাষার কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনভাবেই আক্রান্ত হয়নি।ভাষা অনেকটাই নিজস্ব স্রোতে বয়ে চলেছিল। ইংল্যান্ডে নর্মান জাতিগোষ্ঠী যখন স্যাক্সনদের পরাজিত করে রাজত্ব শুরু করে, তখন ফরাসি শব্দ ব্যাপকভাবে তৎকালীন ইংরিজি ভাষাতে প্রবেশ করে। কিন্তু কখনোই মনে হয়নি যে এই শব্দগুলো যা আদতে ফরাসি তা ইংরিজি ভাষার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বিপন্ন করে তুলছে। ফরাসি শব্দগুলো দীর্ঘমেয়াদী বিচারে ইংরেজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, বৃহত্তর ইংরেজ সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।প্রকৃত বিপদ তখনই উপস্থিত হয় যখন ভাষার মূল চরিত্রই অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে থাকে। সাম্প্রতিককালে সুপরিকল্পিত ভাবে বাঙলা ভাষাকে যেন তার মূল থেকেই উৎপাটিত করার প্রচেষ্টা চলছে। পিতা-মাতার পরিচয় বিকৃত করে, মিথ্যা জন্মপরিচয় চাপিয়ে দিয়ে ব ভাষাকে সমৃদ্ধ করা যায়? বাঙলা ভাষার উৎস সংস্কৃত এটা ভুলিয়ে দিতে পারলে

বাঙলা ভাষার ভবিষ্যত যাই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র ভারত থেকে প্রাথমিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাবে , এটা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি ? উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হওয়ার তো কথা নয়। তামিল ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি হয়েছে এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে H.T.Colebrooke একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করেন। এই লেখার মাধ্যমে দাবি করা হয় যে ভারতবর্ষের সব ভাষাই সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত। ঔপনিবেশিক শাষনে এরকম অন্তর্নিহিত ঐক্যের সত্য প্রকাশ হয়ে গেলে বিপদ। তাই ১৮১৬ সালেই তাই Campbekk এবং Ellis তাদের বই Grammar of The Teloogoo Language এ লেখেন যে তামিল এবং তেলেগুর উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে নয়। Ellis দাবি করেন যে তামিল হিব্রু ভাষার সাথে, এমনকি প্রাচীন আরবি ভাষার সাথেও সংযুক্ত। পরবর্তী সময়ের দ্রাবিড়-আর্য তথা উত্তর-দক্ষিন বিভাজনের সূচনা হয় এই সময়েই। কাকতালীয় হলেও সত্যি এটাই যে তামিল ভাষার সাথেও আরবি ভাষার যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা হয়েছিল। আর বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে সেটা গর্বের সাথে দাবি করা হচ্ছে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে বিপদ অনেক বেশি, কারন প্রতিবেশি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম বাঙলাদেশ এবং সেখানেই সক্রিয়ভাবে বাঙলা ভাষার আরবিকরনের কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও পড়েছে সেই প্রভাব। ভাষাকে secularise করার নামে এমনভাবে বিকৃত করা হচ্ছে যে ভাষার মূল চরিত্রই নষ্ট হয়। ভাষাকে মূল সংস্কৃতি, জীবনপ্রবাহ থেকে পৃথক করে secularise কিভাবে করা সম্ভব?

বাঙলার মঙ্গলকাব্যগুলো কি ধর্মবিবর্জিত ছিল? চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল,ষষ্ঠীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল- ধর্মকে দুরে সরিয়ে রেখে এই কালজয়ী বাঙলা সাহিত্যকীর্তি কিভাবে রচিত হত? সহজিয়া জীবনধারা, যা সনাতনী চেতনার অংশ, প্রকাশিত হয়েছিল বাঙলার চর্যাপদের মাধ্যমে। ধর্মকে বিযুক্ত করে এই সাহিত্য সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব ছিল? জীবনযাপনের সাথে ধর্ম যখন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, ধর্মকে অস্বীকার করার অর্থ তো একটিই- জীবনকেই অস্বীকার, সত্যকেই অস্বীকার। সামাজিক জীবনে, পারিবারিক পরিসরে, পদে পদে রামের নাম উচ্চারন করে বা তাঁকে স্মরণ করে চলি আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা। শত সহস্র প্রচেষ্টাতেও তো মহান কবি কৃত্তিবাসের রামায়নকে আমরা আমাদের সমষ্টিগত বাঙালি স্মৃতি থেকে বাদ দিতে পারি না। আমাদের গর্বের ইতিহাসের অঙ্গ এই কৃত্তিবাসকৃত বাঙালির রামায়ন। কাজেই 'রামধেনু' বদলে 'রংধনু '' ভাষার অংশ হলে ভাষার মূল চরিত্রই যে অস্বীকৃত হচ্ছে সেটা এখন না বুঝলে কবে আমরা বুঝব ?

বাঙলা ভাষার যিনি প্রাণপুরুষ, যিনি বিশ্বসংসারে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় আমরা কি দেখতে পাই? 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শাপমোচন' -শব্দচয়নে এবং সামগ্রিক আবহে সংস্কৃতের প্রভাব নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ আছে কি? বাঙলা ভাষার সম্পদ হিসেবে আমরা তুলে ধরি তো এই নৃত্যনাট্য হিসেবে অনন্য বিশিষ্টতার অধিকারী শিল্পকে? নাকি সংস্কৃত প্রভাবিত বলে বর্জন করব?

আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

উপরের গানটি রবীন্দ্রনাথ রচিত বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীতের অংশ। এখানে ব্যবহৃত 'আকাশ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে আগত তৎসম শব্দ, সোনা শব্দটির উৎস সংস্কৃত শব্দ স্বর্ণ, 'চিরদিন' এর চির শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। বাঙলা ভাষাকে স্বীকার করলে তার উৎস সংস্কৃতকে অস্বীকার করা যায় না।

ইতিমধ্যে, বিশ্ব জুড়ে দুটো বাঙলা স্বীকৃতি আদায় করেছে। একটি হল উর্দু-আরবী-ফার্সি প্রভাবিত বাংলাদেশি বাংলা, আর অন্যটি সংস্কৃত প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গলা।

যারা Google এর Unicode এর বাঙলা COMPUTER এ load করতে গেছেন তারাই জানেন বিষয় টি। অর্থাৎ, কম্পিউটারে ভাষার অপশন চালু হয়েছে যেদিন থেকে সেদিন থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে।

ইংরেজি ভাষাতে যেমন 'ইউকে ইংলিশ' (UK English) আর 'ইউএস ইংলিশ' (US English) আছে। ঠিক তেমনি আছে বাংলা ভাষাতেও দুটো পৃথক ধারা। একটি বাংলাদেশের 'ইসলামিক বাংলা' অপরটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 'হিন্দু বাংলা'!!

নামে বাংলা হলেও দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক। উদাহরণ হিসাবে নিচের অংশটিকে বাংলাদেশের 'বাংলা' থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 'বাঙ্গলা' তে বঙ্গানুবাদ করলেই বোঝা যাবে-

(BD Bengali)

'পরবের দিন ফজরে উঠে, কলের পানিতে গোসল করে, তারপর আন্ডা দিয়ে নাস্তা সেরে আপার সাথে দোস্তের বাসায় গোস্তের দাওয়াতে যাচ্ছিলাম। আসমানে তখন মেহমান রংধনু।'

(এটিই IND Bengali তে হবে)-

'উৎসবের দিন ভোরে উঠে কলের জলে স্নান করে, তারপর ডিম দিয়ে জলখাবার খেয়ে দিদির সাথে বন্ধুর বাড়িতে মাংস খাওয়ার নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলাম। আকাশে তখন অতিথি রামধনু।'

আর এখানেই ভয়, এখানেই সচেতনতা প্রসারের কথা ভাবা। ২০ সেপ্টেম্বর দাড়িভিটে রাজেশ-তাপসের বলিদান হয়তো সেটাই ইঙ্গিত করছে। তাই হয়তো ঘরপোড়া গরুর মত সামান্য সিন্দুরে মেঘে আমরা ভয় পাচ্ছি। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি বাঙ্গলা কে বাঁচাতে গেলে আমাদের বাংলা নয় বরং বাঙ্গলা বলতে হবে। বাঙ্গলা লিখতে হবে এবং বাঙ্গলার প্রচার করুতে হবে। তবেই আসল বাঙ্গলা টিকবে। আর বিশ্বজুড়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা দেশের বাংলা দিবস থাক, কিন্তু ২০ সেপ্টেম্বর হয়ে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব বাঙ্গলা দিবস। আমাদের বাঙ্গলা র দিন।

**(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষক)**

# বাংলা ভাষার ইসলামীকরণের রাজনীতি

## মনোজ দাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনেক কৃষ্ণচূড়া গাছ। যখন সেসব গাছে ফুল ফোটে, তখন চারদিক রঙের বন্যায় ভেসে যায় একেবারে। সে বড় নয়নাভিরাম দৃশ্য। কিন্তু সাংবিধানিক মতে সেকুলার, অথচ রাষ্ট্র ধর্ম যে দেশের ইসলাম, সেই বাংলাদেশ কেমন করে হিন্দু দেবতার নামে রাখা এত সুন্দর গাছটিকে সহ্য করতে পারে? বিশেষ করে সে গাছ যদি দেশের প্রধানতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিপার্শ্বকে ঐশ্বরিক সৌন্দর্যে প্লাবিত করে রাখে? অতএব দেশের ইসলামী পণ্ডিতরা দাবী তুলল, কৃষ্ণচূড়া গাছের নাম থেকে হিন্দুর দেবতা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যোগ করা হোক পরম করুণাময় পয়গম্বর মহম্মদের নাম। কৃষ্ণচূড়ার নতুন নাম হোক মহম্মদচূড়া। কৃষ্ণচূড়ার পাশে বেশ কিছু রাধাচূড়া গাছও ছিল। তাদের হলুদ ফুলের শোভাও কম ছিল না। জানা যায় না, রাধাচূড়ার নাম পাল্টে আয়েশাচূড়া রাখার প্রস্তাব হয়েছিল কিনা! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মহম্মদচূড়া নাম রাখার দাবী এগোয়নি, কারণ, একদল পাগলের এই দাবী মানতে হলে এবং হিন্দুর ঠাকুর দেবতাদের নাম পুরোপুরি বিসর্জন দিতে হলে রামছাগলের নাম পাল্টে যা দাঁড়াবে সেটা নিতে পারবে তো বাংলাদেশের ইসলামিক পণ্ডিতরা। বলা বাহুল্য, এরপর আর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে হাত পড়েনি।

বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলমানরা সে যাত্রায় হেরে গেলেন বটে, তবে এদেশের ইসলামী মৌলবাদীদের নেত্রী ব্রাহ্মণ বংশজাত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু রামধনু পাল্টে রংধনু করে দিলেন রামনামের ভূত তাড়াতে। তিনি শুধু যে রামধনুর ওপর কোপ দিলেন তা নয়, কোপ দিলেন আরও বহু শব্দের ওপর। দেবভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বহু তৎসম ও তদ্ভব

শব্দকে বিসর্জন দিয়ে নিয়ে এলেন আরবী-ফার্সী শব্দ। নীলের বদলে গৃহীত হল আসমানী ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন তাঁর এই আরবী-ফার্সী প্রেম, তাই বাহুল্যবোধে বেশি উদাহরণ দিলাম না। শুধু যে বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দাবলী নিয়ে এসে তিনি ক্ষান্ত হলেন, তা নয়, বাংলা সাহিত্যের ইসলামীকরণেও ব্যস্ত হলেন। বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত কবি- সাহিত্যিকদের রচনাকে অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়ে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে আমদানি করলেন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মুসলমান লেখকদের রচনা। ইসলামী সমাজ-সংস্কৃতিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে থাকলেন। এই ভাবনার অন্তর্বর্তী হয়েই দুর্গাপূজার বিসর্জন আটকে দিয়ে মহরমের মিছিলের ব্যবস্থা। যা সামলাতে শেষমেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয় হিন্দুদের। অথচ, মজার ব্যাপার, মহরম যাদের শোকের উৎসব, সেই শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ কলকাতার মুসলমানদের মোট ৫ পর্যন্তও নয়।

তবে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের গুরুত্ব দেওয়ার এই প্রবণতার শুরু এই বঙ্গের সব নষ্টের মূল বামপন্থীদের শাসন থেকে। মুসলমানদের নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ভাবনা থেকেই রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মদিন একসঙ্গে পালন করার পরিকল্পনা তাদের মাথায় প্রথম আসে এবং শুরুও করে তারা। সাহিত্য বিষয়ে সামান্যতম ধারণা আছে যাদের, তারা জানেন যে সাহিত্য-কৃতীতে রবীন্দ্রনাথের কয়েক হাজার যোজন দূরে অবস্থান নজরুলের এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য আরো কয়েক লক্ষ যোজন দূরে। অন্তত সাহিত্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার মত নাম নয় এদুটি। তবে রাজনীতির বিচারে অবশ্যই নজরুল ও সুকান্তের গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী বই তো কম নয়। একজন মুসলমান (নজরুলের ইসলামী গান কবিতা নিবন্ধ দয়া করে দেখবেন একবার), আর একজন সাম্যবাদের প্রচারক, যাদের রাজনীতি শুরু হয় রুটির টোপ দিয়ে। আর এসবের ওপর বাম-ঐসলামিক মেলবন্ধনের একটা বিশ্বজনীন সমঝোতা তো আছেই।

আগেই বলেছি, বঙ্গের রাজনীতিতে মুসলমান তোষণের ইতিহাসের শুরু মুখ্যত বাম আমলে। তার আগে এখনকার কংগ্রেস দলের মত ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে মুসলমান তোষণের রাজনীতি বিধান রায়- প্রফুল্ল সেনরা করেননি। এমনকি, সিদ্ধার্থ বাবুও নন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে তখন হিন্দুরাই কেবল এদেশে আসত। শরণার্থী হয়ে। রুটি-রুজির আশায় এদেশে আসা এবং ওপারে নিজেদের সম্পত্তিকে ফিক্সড ডিপজিট হিসেবে রেখে দিয়ে ভারতের সম্পদে ভাগ বসাতে বাংলাদেশী মুসলমানদের এদেশে আসার শুরু বাম আমলে। বামেরা এই কাজে মদত দিয়েছে ভোটব্যাংকের লোভে। যারা দেখেছেন সেই আমল, তাঁরা জানেন, মুসলমানরা ছিল বামেদের সবচেয়ে বড় ভোট ব্যাংক। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভাল ফল করে। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে পায় ১৯টি আসন। সেই নির্বাচনে তার জোটসঙ্গী কংগ্রেস পায় ৬টি আসন এবং এস ইউ সি পায় ১টি আসন। বামেরা ১৫ আসন। তাদের ১৫টি আসন লাভের পিছনে মুসলমান ভোটের বড় ভূমিকা ছিল। মুসলমানদের একটা বড় অংশের বামফ্রন্ট-প্রেম ২০০৯ সালে কমে গেলেও মোটামুটি খারাপ ছিল না। যদিও তখন থেকেই মুসলমানদের বাম-প্রেমে ধস নামতে শুরু করেছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে বামফ্রন্টকে গদিচ্যুত করল তৃণমূল। এর পর ২০১৪ সালের লোকসভা ভোট। এই নির্বাচনে মুসলিম ভোটের ৪০% পেল তৃণমূল। বামেদের পক্ষে গেল ৩১%, আর কংগ্রেসের পক্ষে ২৪%। বঙ্গের রাজনীতিতে তেড়েফুঁড়ে নামা বিজেপির পক্ষে মুসলমান ভোট আদৌ উল্লেখ করার মত নয়। ২০১১-তে ক্ষমতায় এসেই তৃণমূল দল তাই বুঝেছিল মুসলমান ভোটের মাহাত্ম্য। বুঝেছিল, মুসলিম ভোট একমুখী, এই ভোটের চরিত্র বিভিন্ন দিকে ধাবিত সূর্যের সাত ঘোড়ার মত হিন্দু ভোট নয়। অতএব ভোট বাক্সের মুখ চেয়ে মুসলিম তোষণে মন দিলেন মমতা। ফলও মিলল হাতে গরম। ২০১৯-এর ভোটে মুসলমান ভোটের ৭০% গেল তৃণমূলের পক্ষে। বাম-কংগ্রেসের রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ নেই। সামনে ২০২১-এর বিধানসভা ভোট। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে ১০০% মুসলমান ভোট দখলের লক্ষ্যে মরিয়া মমতা ব্যানার্জি বিগত লোকসভা ভোটের পরে ডাকা এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'আমি মুসলমান তোষণের রাজনীতি করি। এক শ বার করব। কারণ ওরা আমার সঙ্গে। যে গরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়াও ভাল।'

ক্ষমতায় এসেই তিনি চালু করেছিলেন ইমামদের ভাতার ব্যবস্থা। তারপর মুসলমানদের সামান্য কিছু শ্রেণী ছেড়ে বাকী সবাইকে যুক্ত করে ছিলেন Other Backwards Class (OBC-A)-এর মধ্যে। যারা একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্যান্য সরকারী চাকরির সিংহভাগ বর্তমানে মুসলমানদের ঝুলিতে যাচ্ছে। সরকারের সাফাই, ব্যাকলগ ক্লিয়ার করার ফলেই নাকি মুসলমানরা এত চাকরি পাচ্ছে। এরকম আরো বহু উদাহরণ আছে তোষণের রাজনীতির। এই তোষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, চুরি ডাকাতি ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধিক কর্মে জড়িত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তবে তাকে পাকড়াও করে আইনের অধীনে আনার আগে একবার নয় দশবার চিন্তা করতে হয় পুলিশকে।

তোষণের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মমতার অন্যতম সংযোজন হল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইসলামিকরণ। অর্থাৎ বাঙালীর, কিংবা আরো স্পষ্ট ভাবে বললে হিন্দু বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলার শরীরে যথেচ্ছ পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এই ভাষাটি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা। সংস্কৃত থেকে জাত বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাসটিকে যথাসম্ভব দুর্বল করে দিয়ে বিজাতীয়

ইসলামী ভাষা ও সংস্কৃতির খোলস পরিয়ে দেওয়া। এই অপচেষ্টা যে এই প্রথম শুরু হল, তা নয়।

খুব বেশি বছর আগের কথা নয়, উনিশ শতকের শেষার্ধেও বাংলার মৌলবীরা বাংলা ভাষাকে বলত হিন্দুর ভাষা বা কাফের জুবান। বাংলাদেশের নামী প্রাবন্ধিক গোলাম মুরশিদ তাঁর "হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন, বিশ শতকের গোড়াতেও বাংলার শিক্ষিত- অভিজাত মুসলমানরা বাংলাকে তাদের মাতৃভাষা বলে স্বীকার করতেন না। বাড়ির মধ্যে তাঁরা কথা বলতেন উর্দু ভাষায়। বাঙালী বলতে তখন কেবল হিন্দুদের বোঝানো হত এবং বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের মুসলমান পরিচয়েই সন্তুষ্ট থাকত। ক্রমশ ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার ফলে, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ ধর্মীয় রাজনীতির আবরণে নিজেদের জন্য এক মনগড়ন জাতিসত্তার আইডেন্টিটি খুজতে শুরু করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুত্বের শিকড় ছিঁড়ে, দেবভাষা সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্মের নাড়ির বাঁধন কেটে তাঁরা আশ্রয় খুঁজলেন কোরআনের আরবী ভাষায়। তার সঙ্গে উর্দু এবং কিছু পরিমাণে তুর্কি ভাষার মধ্যে। কেন আরবী ভাষার শব্দ আসবে বাংলায়? তার পিছনের ভাবনাটি হল, আরবী ভাষাতে লেখা হয়েছে কোরআন, পয়গম্বর মহম্মদকে এই ভাষাতেই আল্লাহ তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন এবং স্বয়ং পয়গম্বরের মুখের ভাষা ছিল এটি।

বাংলা ভাষার শরীরে এই বিদেশীয় ও বিজাতীয় শব্দ অনুপ্রবেশের স্রোতে কিন্তু গা ভাসিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও। তিনিও বাংলা ভাষার শরীরে আরবী-ফার্সী-তুর্কী ভাষার শব্দ জুড়ে দিতে লাগলেন অবিশ্রান্ত ভাবে। এবং এমনই সেই জুড়ে দেওয়া যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। নজরুল তাঁর কবিতায় রক্ত অর্থে "খুন" শব্দটি ব্যবহার করলে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে বেখাপ হয় না; বাংলার সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি, তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা।' (মক্তব মাদ্রাসার বাংলা প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৪১)। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন 'আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজ ভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। সেটা বাঙালী জাতির পক্ষে যতই দুঃখকর হোক না, বাংলা ভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিপীড়িত করলে সেটা বেশী শোচনীয় হবে।'

অথচ, এই ব্যাপারটিই ভয়ঙ্কর ভাবে করা হচ্ছে বর্তমানে। স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমান পণ করে বসেছে, বাংলা ভাষাকে পুরোপুরি মুসলমানী বাংলায় পরিণত করতে হবে। ওপার বাংলা এপার বাংলা মিলিয়ে যত বাংলাভাষী মানুষ আছে বিশ্বে, তার প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলমান। এই সত্তর শতাংশের সিংহভাগ বাংলাদেশী। আর এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবিধা নিয়ে, রাষ্ট্রীয় ভাষার সুযোগ নিয়ে এক নব্য বাঙালী আইডেন্টিটি তৈরিতে ব্যস্ত তারা। নতুন এক চেহারা দিতে ব্যস্ত বাংলা ভাষাকে, যার মূলে আছে ধর্মীয় বিস্তারবাদ।

বাংলাদেশ তাদের ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় বাংলা ভাষা নিয়ে যা করছে, সেই একই কাজ ২৭% (অনেকের মতে আরো অনেক বেশি) মুসলিম ভোট দখল করার প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গে করে যাচ্ছেন মমতা। আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কী করতেন বা বলতেন, সেটা অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী যে লেখক-বুদ্ধিজীবীরা আলো করে বসে আছেন বঙ্গের সংস্কৃতি জগৎ, তাঁরা সেকুলারী চিন্তায় এতটাই আচ্ছন্ন, মুসলিম তোষণের রাজনীতিতে এতই নিবেদিতপ্রাণ ও হিন্দুত্বের বিরোধিতায় এতই উদগ্র যে, বাংলা ভাষার এই লজ্জা ও অপমানের বিরুদ্ধে একটি শব্দও নেই তাদের মুখে। তবে সান্ত্বনার কথা এটাই যে, সত্যিকারের মুক্তমনা বিবেকবান বুদ্ধিজীবী এপার বাংলায় নেই বটে, তবে ওপার বাংলায় আছেন, যারা ঠিক ধরেছেন ধর্মীয় রাজনীতির নোংরা খেলার আড়ালে বাংলা ভাষার ধর্মান্তরের এই পরিকল্পনা।

প্রয়াত (সম্ভবত নিহত) খ্যাতনামা সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ আইডেন্টিটি খোঁজার নামে বাংলা ভাষার গায়ে মুসলমানী জোব্বা পরাবার বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, 'এদেশের মুসলমান একসময় মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিল। এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি এবং মুসলমান বাঙালি থেকে মুসলমান হচ্ছে।'

কিন্তু এভাবে ভাষা দখলের মধ্যেই আবদ্ধ নয় ইসলামী মৌলবাদীরা। তাদের সামনে আছে আরও বড় লক্ষ্য। আর সেটা হল, হিন্দুত্বের ছাপ মোছার পর ইসলামী বাংলা নিয়ে এক বৃহত্তর ইসলামী বাংলাদেশ গঠন করা। যে ভাবনার কথা সেই একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের অব্যবহিত পরে বলেছিলেন মৌলানা ভাসানী 'আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।'

এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালীকে এই শপথ নিতে হবে যে, বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা, হিন্দু বাঙালীর ভবিষ্যৎ, বাংলা ভাষার শুদ্ধতা, বাঙালীর সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বাম-ঐসলামিক শক্তিকে পরাস্ত করে একুশের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে এরাজ্যে। ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর দেরী হলে বাঙালীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সেটা হলে আরো একবার দেশান্তরী হওয়ার অনিবার্য সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

**(লেখক- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)**

# বেকারত্বের ভারে নিমজ্জিত বঙ্গ

## ড রাজলক্ষ্মী বসু

কলম ধরতেই 'গোরা' উপন্যাসের কটা ছত্র মনে আনাগোনা করল, বিনয় সুচরিতাকে বলেছিল '...আমাদের দেশের জন্য, সমাজের জন্য, আমাদের কিছুই আশা করবার নেই, চিরদিনই আমরা নাবালকের মতো কাটাব... আমাদের কোথাও কোনো উপায় মাত্র নেই' পরে গোরার একটা কথা আরো তাৎপর্যপূর্ণ '... না গভর্নমেন্টের চাকরি তুমি কোনোমতেই করতে পারবে না'। খুব পরিচিত এখন এই পরিস্থিতির সাথে পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়। এ রাজ্যে তৃণমূল আমলে চাকরি বলতে সম্ভবত কিছু সিভিক ভলান্টিয়ার। যারা বেতন টাও ঠিক মতো পাননা। চাকরি পেতে এবং রক্ষা করতে জড়িয়ে আছে তৃণমূলের অতিপ্রিয় একটি প্রকল্প যার নাম 'কাটমানি'। রাজ্যে বিনিয়োগ মুখ ফিরিয়েছে প্রায় এক দশক আগেই। বেকারত্ব আর যুবসমাজের গ্লানিতে একরাশ লজ্জা এখন পুঞ্জীভূত এ রাজ্যে। এই তো কদিন আগেই দেখছিলাম ন্যাশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যেখানে ৭.৮ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা ১৪.৯ শতাংশ! এই বুঝি এগিয়ে বাংলা-র নিদর্শন? যেখানে কর্ণাটক গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশে সেই সার যথাক্রমে ০.৫ শতাংশ, ১.৬ শতাংশ এবং ৫.৮ শতাংশ। মমতা ব্যানার্জির সরকার অনেক ভুয়ো তথ্য পরিবেশন করে রাজ্যের বেকারত্বকে আব্রু করতে চাইলেও এই না—পাওয়ার যন্ত্রণায় যুব সমাজ ছটফট করছে। ২০১৪ সালেই এ রাজ্যে এক বছরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৬.৭১ লক্ষ। চাকরি পান মাত্র ১৫০০ জন। দুর্নীতি ভারাক্রান্ত এ রাজ্যে অনেক রফাদফার পরেও দেশের মাত্র ০.৪ শতাংশ যুবক চাকরিতে নিযুক্ত হন এ রাজ্যে।দলে দলে মেধাবী ছাত্র রাজ্য ছাড়া। বেকারত্বের পরিসংখ্যার যাদুখেলায় তাই মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি প্রদর্শন করতে পারেন 'বেকারত্ব কমছে' বলে। রাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিক দিনকেদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে দশ জনেরও কম শ্রমিক কার্যরত এমন অসংগঠিত ক্ষেত্রে রাজ্যের ৮১ শতাংশ শ্রমিক নিযুক্ত। তাদের অনেকে আবার গ্রাজুয়েট। এতোটাই নিদারুণ এ রাজ্যের পরিস্থিতি যে, ২০১৯ এর কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রকের তথ্যানুযায়ী এই রাজ্যে ৩৩ হাজারেরও বেশি স্কুলছুট চাকরিপ্রার্থী। সমাজের প্রতি যদি সত্যিই কোনও দায়বদ্ধতা তৃণমূলের থাকত, তাহলে এভাবে যুব সমাজের দীর্ঘশ্বাসকে প্রশ্রয় দিত না। তাহলে তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে হাত পাকাতো না। যে সরকার যুবসম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড ভঙ্গুর করে ক্লাবে টাকা দানখয়রাতি করে, তারা যে ভবিষ্যত সমাজকে এই পুঁতি গন্ধে পরিপূর্ণ করতে চায় তা নিয়ে আশা করি দ্বিমত থাকে না। ঠিক করোনা পরিস্থিতির প্রাক্কালের একটা দিন মনে করি, ১৩ই মার্চ। তৃণমূল আশ্রিত ক্লাব গুলিকে বুঝি ১৩০০ কোটি টাকা অনুদান করেছে স্বয়ং রাজ্যসরকার! কলকাতা ইন্দোর সেটডিয়ামে এক রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী এমন ঘোষণা যখন করেন তখন তার চেয়ে নিরাশার আর কিই বা হতে পারে। ২০১৯ এর পর থেকে ক্লাবে র ওপর অনুদানের বর্ষণ প্রায় ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অথচ দেখি, এখনও শিক্ষাবন্ধু পদের কর্মীরা নায্য বেতনের জন্য লড়াই করছেন। পথে নামছেন আশা কর্মীরা। চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষকরা আর্থিক দিক থেকে অপমানিত। প্রাপ্য সম্মান উদ্ধারে বা বলা ভালো ছিনিয়ে নিতে আজ পশ্চিমবঙ্গের বিচক্ষণ শিক্ষত যুব সমাজ বদ্ধপরিকর। এই তুষ্টিকরণ আর আশু পাইয়ে দেওয়ার যত্ন কিছুদিন করা গেলেও তা কখনওই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। চটজলদি কিছু প্রাপ্তি যুবসমাজের তাৎক্ষনিক মুখরোচক লাগলেও তারা বুঝতে পারছেন তাদের বঞ্চনার হিসেব। যখন একটা রাজনৈতিক দলের প্রতি যুব সমাজ প্রতিবাদী হয় তখন তার বিদায়ের ঘন্টা আসন্ন।এই অপ্রাপ্তির সন্ধান আজ সবাই করছেন, তাই তৃণমূল তার কদর্যতা আড়াল করতে অক্ষম।

**লেখিকা: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক**

# বাংলার ছাত্র রাজনীতি: বামপন্থার অপ্রাসঙ্গিকতা—কিছু কথা

## সৌমক পোদ্দার

ভারতবর্ষে মার্কসবাদী আন্দোলন বিশেষ করে কমিউনিস্ট ছাত্র আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে তার সময় অতিবাহিত করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তার যৌক্তিকতা কতটা তা নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি রাশিয়ায় অনেকদিন আগেই তার মতবাদ পরিত্যাজ্য হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে যে কাল্পনিক দৃশ্য আবহ তারা তৈরি করেছিল এবং সারা পৃথিবীর কাছে একধরনের প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিল, তার বহুকিছুই আজ নস্যাৎ হয়েছে। এমনকি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, পৃথিবীর যে সব বড় বড় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকরা একসময় এই মত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে তারাই সেইসব মতকে পরিত্যাগ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, রোজার গারৌদি (Roger Garaudy) নামে এক প্রখ্যাত ফরাসী কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকের নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি পরবর্তীকালে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং Islamic Fundamentalist হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। প্রখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ' গ্রন্থে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেখানে তিনি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্রী, কর্তাভজা,আমলাতান্ত্রিক চরিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু এতদসত্বেও বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদের প্রোপাগাণ্ডা সুকৌশলে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল,যে বাঙালি মননে বা মানসচক্ষে তার ভুলভ্রান্তি কখনোই ধরা দেয়নি। সেগুলিকে তলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইতিহাসের অতলে। কিন্তু হাত দিয়ে যেমন সূর্যের আলোকে ঢাকা যায় না,মাছের পচন যেমন মাথা থেকেই শুরু হয়, তেমনি ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতির পচন শুরু হয়েছিল মাথা থেকে। প্রথমে উপরতলায় Corruption হয়েছিল,তারপর আস্তে আস্তে নীচুতলা Corrupted হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির আগাগোড়াই সবচেয়ে বড় ভিত্তি হচ্ছে তার ছাত্র আন্দোলন। প্রথম থেকেই ছাত্র-যুব আন্দোলনের উপর তারা ভিত্তি করেই ক্ষমতায় এসেছিল। একথা বলতে বাধা নেই যে,কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সবচেয়ে ব্যাপকতা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে '৬০ ও'৭০র দশকের ছাত্র আন্দোলন এবং ছাত্ররাজনীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে পার্টি ওয়াকিবহাল ছিল। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ঘৃণ্য রাজনীতি,ছাত্রদের মধ্যে ভুয়ো আন্তর্জাতিকতা প্রচারের দিকনির্দেশনা ও তার সংস্কৃতি থেকে

ছাত্রদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বহুযোজন দূরে। প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিজমের প্রচার করতে গিয়ে তারা ভারতবর্ষের স্বরূপ বোঝার বা জানার শিক্ষা কোনদিনই পায়নি এবং এর ফলে তারা ভারতাত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিস্মৃত থেকে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পতনের পর রামচন্দ্র গুহ লিখিত একটি ছোট্ট গ্রন্থ 'পতনের পর কমিউনিস্টরা কি বদলাবে', তাতে কমিউনিস্ট মতবাদ বিশেষ করে leftismর অনেক কাছাকাছি নেহেরুপন্থী রামচন্দ্র গুহও এই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও পরিশেষে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তার আস্থা রেখেছিলেন এবং আশার বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন যে,পতনের পর হয়তো তারা তাদের ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরে নেবে কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র গুহের মধ্যে দুটি বিপরীতমুখী চিন্তা কাজ করেছিল।

পথমত, তিনি ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে বিশেষত ভারতীয় জনতা পার্টির দ্রুত উত্থানকে ভয়ের চোখে দেখেন এবং তার মেকী left liberal দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই পার্টির আদর্শ খুব স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে ভুয়ো বলে পরিগণিত হয়েছে এবং তার জন্যই তিনি সমস্ত কিছু ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের উপর আস্থা রেখেছেন। কিন্তু আস্থা রাখার সাথে সাথে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল তিনি প্রকাশ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির ভুল-ভ্রান্তিগুলিকেও তার সেই ছোট্ট গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ছাত্রদের মাধ্যমেই। ছাত্রদের মধ্যে গ্রুপ থিয়েটার,অলস চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার,মেকী আদর্শের প্রচার করে তারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাতেন এবং সেই দেউলিয়াপনা কমিউনিস্ট বিপ্লব মানুষকে তার দেশ,তার সংস্কৃতি,তার ঐতিহ্য, তার জাতীয়তাবাদ থেকে একটু একটু করে মুখ ফিরিয়ে বিদেশের ছাঁচে ঢালা একটি কৃত্রিম সমাজব্যবস্থায় আস্থাশীল করে তুলত। তাইজন্যই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন তাদের কাছে 'বুর্জোয়া', বিবেকানন্দ হয়ে উঠতেন 'Hindu Reactionist',নেতাজী হয়ে উঠতেন 'জাত সাম্রাজ্যবাদের দালাল' এবং ক্ষুদিরাম বসু একসময় হয়ে উঠেছিলেন 'Terrorist',যিনি কোনো মতাদর্শের চিন্তা ছাড়াই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এক আগ্নেয় বিপ্লবের পথে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলে দেখবেন,ভারতবর্ষে যতবার জাতীয় রাজনীতির বৃত্তে উথাল-পাথাল সময় ও পটপরিবর্তন হয়েছে,তখনই এই মেকী রাজনৈতিক কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলি বেইমানি করেছে এবং পিছন থেকে ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

প্রথমত,বলা যায় যে,ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা যারা কমিউনিস্ট পার্টি দলভুক্ত ছিলেন সেই জন্মলগ্ন থেকেই, পরবর্তীকালে তাদের আর কোনো বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। আন্দামান জেল থেকে ফিরে আসা একাধিক বিপ্লবী,যারা কমিউনিস্ট ছিলেন,তারা কিন্তু আর পরবর্তীকালে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেননি। এইভাবেই ব্রিটিশের camouflage হওয়া একটি Political Party একটু একটু করে ব্রিটিশের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল এবং তার সবচেয়ে বড় মুখোশটি খুলে পড়েছিল ১৯৪২সাল থেকে। ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ব্রিটিশদের তাঁবেদার বানানোর জন্য যে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মেকি ঐতিহাসিকরা চেষ্টা চালিয়ে যান। তারা এইটা বেমালুম চেপে যান যে,একাধিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্রিটিশের সাথে কিভাবে হাত মিলিয়েছিলেন। ১৯৪১সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ধাপে ছাত্র আন্দোলনে তারা স্লোগান দিয়েছিল 'ন এক পাই,ন এক ভাই,নাহি দিব সমরে'। কিন্তু রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তা করতে সেই রাজনৈতিক দলই স্লোগান দিয়েছিল যে'টাকা দাও, সোনা দাও,সেনাদলে ঠেলে দাও'। এমনকি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা বলে যে ছাত্রসমাজকে তারা ভুলপথে চালিত করে ১৯৪১-৪২ সালে সেই কমিউনিস্ট পার্টির গণসংঘ (IPTA)গান বেঁধেছিল 'জনগণ তোলো হাতিয়ার, সাথে আছে ইংরেজ দুর্জয় মহাচীন, নির্ভীক সোভিয়েত বিপ্লবী মার্কিন'। সেদিন কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছিল তাদের কাছে বিপ্লবী। কারণ রাশিয়া তাদের পিতৃভূমি, সমাজতন্ত্র আক্রান্ত। তাই তার সাথে মিত্রপক্ষে থাকা মার্কিন সেদিন বিপ্লবী। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঠান্ডাযুদ্ধ শুরু হলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জুজু ও ভীতি দেখিয়ে তারা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের উপরে একটি মেকী চিন্তাভাবনার আচ্ছাদন চাপিয়ে দিয়ে গেল এবং নিজের দেশ ও সমাজ থেকে ধীরে ধীরে ছাত্রসমাজকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। পরবর্তীকালেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র আন্দোলনকে ব্যবহার করল মূলত Axis Power এর বিরুদ্ধে। কিন্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনকে তারা ব্যবহার করল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক যুগান্তকারী মুহূর্তেই তারা ইংরেজপক্ষে চলে গেল এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বেইমানি করল।

ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে গণতন্ত্র রক্ষার সবচেয়ে বড় সংগ্রাম, ১৯৭৫ সালে মধ্যরাত্রে জারী হওয়া জরুরী অবস্থার সময়ও এই মেকি বিপ্লবী দলটির মুখোশ সবার সামনে ঝরে পড়ল। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যখন অটলবিহারী বাজপেয়ীসহ একাধিক জনসংঘের নেতা গ্রেপ্তার হলেন এবং ভারতবর্ষকে ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত থেকে মুক্ত করে আবার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জেল খাটলেন, তখন এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন এবং জরুরী অবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেদিনকেও তাদের মুখের উপর থেকে মুখোশ খসে পড়েছিল এবং তারা জেলে যাওয়ার ভয়ে ইন্দিরা

গান্ধীর সঙ্গে হাত মেলাতেও পিছপা হলেন না। ১৯৭০র দশকে মেকি যুক্তফ্রন্ট সরকারের জারজ সন্তান হিসাবে জন্ম নিল নকশাল আন্দোলন। একাধিক ছেলেকে পার্টি ভাঙার নকল রাজনীতি করে যখন তারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তারাই পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ আন্দোলন থেকে ছাত্র আন্দোলনে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র আন্দোলনের ফলে ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল তখন বোমা,গুলি,রাজনীতির কেন্দ্র। যে বাঙালিকে গোখলে একসময় বলেছিলেন যে 'what Bengal thinks today, India thinks tomorrow', সেই বাঙালির কলকাতা শহর হয়ে উঠল 'মিটিং মিছিল নগরী'। সেখানে কককাতা শহরে কোনো ছাত্র পরীক্ষা দিতে যাবে কিনা তা নিয়েই ভয় পেত। পর পর দুটি বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাচ্ছিল না, না করনা ভাইরাসের জন্য নয়, তাদের বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতির জন্য। হাজার হাজার ছাত্রগোষ্ঠীকে ভয় দেখিয়ে, বন্দুকের নল দেখিয়ে এমনকি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিতরে এক নিরপরাধ ছাত্রকেও হত্যা করা হয়েছিল এই সময়। এইভাবেই তারা ক্যাম্পাসে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসগুলিকে রাজনীতির আখড়া তৈরী করেছিল। আজকের গৈরিক সন্ত্রাসের ভয় দেখিয়ে যারা বড় বড় বুলি আওড়ান, তারাই সেদিন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আজকে যাদের মনে গৈরিক পতাকা দেখলেই ফ্যাসিবাদের উদয় হয়, সেদিন স্ট্যালিনীয় কায়দায় একাধিক ক্যাম্পাস দখল, বিরোধী ছাত্ররাজনীতির কণ্ঠরোধ করার জন্য হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে একটি ছাত্রপরিষদের মহিলা নেত্রীর হাত কেটে নেওয়া- এইসব ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির একান্ত প্রয়োজনীয় ছাত্ররাজনীতির অঙ্গ, যা পরবর্তীকালে তাদের দিকেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও ছিল প্রকট, যার ফলে সারা কলকাতার ছাত্রসমাজ দ্বিধাবিভক্তও ছিল। তবে এরা ছাত্রদের মধ্যে আত্মঘাতী রাজনীতির বীজ বপন করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। কমিউনিষ্ট রাজনীতির দিক থেকে মোহভঙ্গ হওয়া একজন বিখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ পান্নালাল দাশগুপ্ত, যিনি ষাটের দশকে নিজে গান্ধিবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিতর্ক, বিকল্প ও স্বাধীনতা'য় বলেছেন যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ধ্বংস করার জন্য কমিউনিস্টদের জুড়ি মেলা ভার। একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতার মুখে এহেন কথা শুনে চমকে উঠতে হয়। কিন্তু একথা যে তীব্র সত্যি কথা!

পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করল তখন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক গান্ধিবাদী নেতা অন্নদাশঙ্কর রায় কিংবা বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবতারা প্রমথনাথ বিশীকে এই কমিউনিস্ট ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যেভাবে অপমানসূচক কটূক্তি করেছিল, তার ফলে তীব্র অপমানিত অন্নদাশঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি আর কোনোদিনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে পা রাখবেন না এবং তিনি তার কথা রেখেও ছিলেন। অম্লান দত্তের প্রকাশিত আত্মজীবনী কিংবা শিবনারায়ণ রায়ের লেখা প্রবন্ধগুচ্ছে সেইসময়কার ছাত্ররাজনীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য উঠে এসেছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে কিভাবে ধীরে ধীরে মার্কসবাদের নামে প্রতিটি ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট রাজনীতির আখড়া এবং আখের গোছানোর জায়গা। কমিউনিষ্ট পার্টির সবচেয়ে ভয়াবহ সময়কাল ছিল '৭০র দশক। যে সময় প্রতিটি কলেজে কলেজে শ্লোগান উঠেছিল 'চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান', প্রকাশিত হয়েছিল 'পিকিং রেডিও' নামক মুখপত্রের মতো উদ্ভট আজগুবি কিছু খেয়ালের। নিজেদের জাতীয় চিন্তা, জাতীয় সত্বা, জাতীয় চেতনার থেকে ছাত্রদেরকে আস্তে আস্তে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পায়ে বলি দেওয়ার যে নোংরা চেষ্টা কমিউনিস্ট পার্টি চালিয়ে গিয়েছিল এইসময় তা আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। নিজেদের চিন্তাচেতনা,জাতীয় শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাত্রসমাজ এইসময় এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়েছিল। নিজেদের আত্মসত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে পরাণুকরণ করেছিল। পরবর্তীকালে কারাবরণ করে আসার পর বহু কমিউনিস্ট ছাত্রনেতার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের শিক্ষাজীবনে ইতি টানা হয়। এদের খবর কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চনেতৃত্বের কেউ রাখে না। এরা রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে অতি নিম্নমানের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শুরু করে বাংলার প্রতিটি কলেজকেই তারা দলীয় আখড়ায় পরিণত করেছিল, যেখানে ক্যান্টিন ক্লাস বেশি হতো। আসল শ্রেণিকক্ষে তাদের পোষা শিক্ষকরা কিছু বাধাগতের বুলি আওড়ে চলতেন। যে বুলিগুলি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিল খুবই মেকী এবং fishy. ছাত্রদের মধ্যে ছড়ানো মেকী বিপ্লবের তত্ত্ব এবং ভুল বোধশক্তির চিন্তায় তারা আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে অস্বীকার করতে থাকেন। তারই একটি অদ্ভুত নজির আমরা দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে ছিল দীর্ঘদিন কম্পিউটার, ইংরাজি শিক্ষায়। কিন্তু একইসময়ে প্রায় কমিউনিস্ট রাজনীতির অন্যতম তীর্থক্ষেত্র কেরালায় কিন্তু কমিউনিস্ট সরকার ইংরেজি শিক্ষা কিংবা কম্পিউটার বর্জন করেনি, তথ্য প্রযুক্তিতে তারা এগিয়ে গেল আর এখানকার কমিউনিস্টরা রাজনীতি করে পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ তথা সাধারণ সমাজকে কয়েক শত ধাপ পিছিয়ে দিল। এমনই ছিল এদের দ্বিচারিতা।

বাংলা থেকে বহু বিখ্যাত কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা উঠে এলেও কমিউনিস্ট রাজনীতির পাঁকচক্রে তাদের কোনোদিনই কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়নি। তাই জন্য যে কমিউনিস্ট পার্টি আজ বিজেপিকে বা ABVP কে বিদেশীদের দল বলছে, বহিরাগত হিন্দুস্তানীদের দল বলে অপমান করছে,তাদের স্মরণে রাখা উচিৎ যে এই রাজনৈতিক দলের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন

বহু বাঙালি নেতা। ভারতকেশরী ড়শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যার চিন্তা ও চেতনায় আমাদের রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে। তিনি বাঙালির একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ও তাঁর পিতাও ছিলেন বাঙালির একজন শ্রেষ্ঠতম আইকন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির আজপর্যন্ত সেক্রেটারিদের মধ্যে কজন বাঙালির নাম আপনি খুঁজে পাবেন? এই বামপন্থীরাই একসময় বাংলায় ছাত্ররাজনীতির সর্বনাশ করে, হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মুখের গ্রাস কেড়ে তাদের নোংরা রাজনীতি চালিয়ে গিয়েছে। এরও পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনের সবচেটে বড় অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল এই বাংলাকে। একটি সরকারী তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছিল যে,এইসময় বাংলা ছাত্রমহলে ব্যাপক হত্যার ফলে বাঙালির দুটি প্রজন্ম পিছিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে রুণু গুহ নিয়োগীর লেখা 'সাদা আমি কালো আমি'তে দেখা যায় কিভাবে বাংলার প্রতিটা কলেজে কলেজে কমিউনিস্ট নেতারা ছাত্রদের মধ্যে জন্ম দিয়েছিল মিথ্যা বিশ্বাসের। কোনো ছাত্র তাদের সেই মিথ্যা চিন্তাভাবনার আবরণ উন্মোচিত করলে তাদেরকে প্রতিবিপ্লবী চিহ্নিত করে নিজেরাই গুলি করে মারতেন তারই সতীর্থ বন্ধুর হাত দিয়ে। এক বন্ধুর হাত দিয়ে অপর বন্ধুকে হত্যা করার এই নৃশংস প্রবণতা একমাত্র এই নকশালবাড়ি আন্দোলনই শিখিয়ে দিয়ে গেছে। যা ABVP বা অন্য কোনো জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন শেখায় নি। যে ঐক্য,বিশ্বাস,আত্মবলিদান ও দেশপ্রেমের তত্ত্বে আমরা বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে সহমর্মিতা, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের আদর্শে আমরা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে যাই প্রতিনিয়ত,যা কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সততই অনুপস্থিত। ভারতের সমন্বয়বাদী দর্শন আমরা মানুষের মধ্যে প্রোথিত করতে চাই। যা এক অনন্য মানবতাবাদে আখ্যায়িত হয়। আর সেদিক থেকে দেখলে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বিখ্যাত নেতা মুজফর আহমেদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'তে বলেছেন,মনে রেখো বন্ধুত্বের থেকে পার্টি বড়। এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি বন্ধুত্বের থেকেও পার্টিকে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছেন এবং তারই চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে যে ডাঙ্গের হাত ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একসময় প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, '৮০র দশকে সেই ডাঙ্গেকেই তারা ব্রিটিশের দালাল বলে অভিহিত করেছে। ডাঙ্গের ব্রিটিশ সরকারকে প্রদত্ত মুচলেকা এইসময় জ্যোতিবাবুর হাত দিয়ে সর্বসমক্ষে উত্থাপিত হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট নেতারা নিজেরাই একেকজন ফ্রাংকেনস্টাইন হয়ে একে অপরের মৃত্যু ডেকে এনেছিল। আবার ডাঙ্গে তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বহু প্রামাণ্য নথি সর্বসমক্ষে পেশ করেছিলেন। মুজাফর আহমেদ,পি সি যোশীর একাধিক চিঠিপত্র লেখা থেকে জানা যায় কিভাবে তারা ব্রিটিশকে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক চিঠি লিখেছিল। বিপ্লবী সাভারকর সম্পর্কে আজ যারা বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মিথ্যা প্রচার চালায় তারা কি তাদের কলঙ্কময় ইতিহাস ভুলে গেছে?একসময় তাদের পিতা কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে,যার হাত ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম বোম্বেতে ১৯২৫সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ডাঙ্গেকে নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি ছড়া বেঁধেছিল এককালে 'ডাঙ্গে,ভোট নেই তোর বঙ্গে'। এবং ছাত্র রাজনীতির হাত ধরে উঠে আসা ডাঙ্গেকে সেই কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রনেতারাই কলকাতার কলেজস্ট্রীট অঞ্চলে এমন চূড়ান্ত অপমান করে যার ফলে ডাঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,আর কোনোদিনই তিনি কলকাতায় কোনো মিটিং-মিছিল করবেন না।

এইসমস্ত ছাত্র-রাজনীতির ভ্রান্ত পথপ্রদর্শন পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলন এবং এখনো পর্যন্ত স্থানে স্থানে Urban Naxal শ্রেণি গড়ে তুলছে। ছত্রিশগড় সহ বিভিন্ন খনি অঞ্চলে এইসকল নকশালদের দৌরাত্ম্যে স্বাভাবিক জনজীবন ও ব্যবসা-বানিজ্য ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন বহিরাগত শক্তি ও ভারতবিরোধী সংগঠনগুলি এই নকশাল বা Urban Naxal দের ব্যবহার করছে ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে। যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে প্রকৃত উন্নয়নের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে এবং 'ভারতবর্ষ তোমাদের দেশ নয়, তোমাদের আলাদা জাতিসত্ত্বা আছে'-এই তত্ত্বের মাধ্যমে এক দেশ, এক জাতি এবং বৃহত্তর মানবতার দর্শনের উপর তারা আঘাত হানছে প্রতিনিয়ত। এককালে আমরা যেমন সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম, তেমনি দেশের এই আভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে না লড়তে পারলে ভবিষ্যত ফলাফল হবে ভয়াবহ এবং একাজে আমাদের ছাত্র-যুবদেরই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যতের কান্ডারী। তাদের হাত ধরেই দেশের জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি, জাতীয়তাবোধ বজায় রাখা সম্ভবপর হবে।

**তথ্যসূত্র :**

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ, দে'জ পাবলিকেশন।
২. সেলিনা জাহান, ধূসর মস্কো, একুশ শতক।
৩. রামচন্দ্র গুহ, পতনের পর কমিউনিস্টরা কি পাল্টাবে! সূত্রধর পাবলিকেশন।
৪. পান্নালাল দাশগুপ্ত, বিতর্ক, বিকল্প ও স্বাধীনতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন।
৫. এস.এ. ডাঙ্গের বিভিন্ন রচনা, সংগৃহীত চিঠিপত্র।
৬. ই.এম. এস নাম্বুদ্রিপাদ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।
৭. মুজফফর আহমেদ, আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
৮. চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, মনীষা পাবলিকেশন।

**লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক**

# ইসলামিক জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ

রামানুজ গোস্বামী

এই লেখাটির কোনও ভূমিকার প্রয়োজন আর আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ এটাই যে, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনায় এটা বুঝতে একেবারেই অসুবিধা হয় না যে, এই রাজ্য অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ একেবারে নিঃসন্দেহেই মুসলমান জঙ্গিদের নিরাপদ বাসস্থানে (Safe Heaven) পরিণত হয়েছে। সারা ভারত তথা সারা পৃথিবীর কাছেই এই তথ্য তথা এই খবর পৌঁছে গিয়েছে এবং আবারও একবার বাঙালি হিসেবে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অবশ্য এত সবের পরও পশ্চিমবঙ্গের শাসককুল এই ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ এবং তাদের পক্ষ থেকে বরং BSF এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তব্যে গাফিলতির বিষয়ে নানা অভিযোগ ইত্যাদি শুরু হয়েছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে একটা কথা আজ আর না বললেই নয়; তা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জঙ্গি কার্যকলাপ একদিনে বেড়ে যায়নি। বারে বারে বহু নিরপেক্ষ সংবাদপত্র ও নিরপেক্ষ টিভি চ্যানেল নানাভাবে সরকারকে এই বিষয়ে সজাগ করেছিল। দেশের স্বার্থে ও মানুষের স্বার্থে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব (প্রধানতঃ ভারতীয় জনতা পার্টি বা BJP নেতৃত্ব) বারে বারে সরকারের ভ্রান্ত সংখ্যালঘু-তোষণের নীতির সমালোচনা করেছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব খবর বা সমালোচনার কোনও তোয়াক্কাই করেনি ও সংকীর্ণ ভোট-রাজনীতিতে ব্যস্ত থেকেছে। স্বয়ং মহামহিম মাননীয় রাজ্যপালও নানা সময়ে এই বিষয়ে

রাজ্যকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা, রাজ্যের শাসকদল উল্টে তাঁকে নানাভাবে কটূক্তি ও অপমান করেছে। তাই আজ এই রাজ্য শুধুমাত্র জঙ্গিদের safe corridor নয়, বরং safest shelter হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি NIA বা National Investigation Agency তল্লাশি চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা থেকে মোট নয় জন মুসলমান আল-কায়দা জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ছয় জন ও কেরালার এর্নাকুলাম থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা (কোনও বিদেশী নয়)। সুতরাং বোঝাই যায় যে, কিভাবে এইসব জঙ্গি সংগঠন ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের (বিশেষতঃ মুসলমান যুবকদের) মাধ্যমে এইদেশে জঙ্গিহানা ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এইসব জঙ্গিদের মধ্যে একজনের বুলেটপ্রফ জ্যাকেট পরিহিত একটি ছবি পাওয়া গিয়েছে। আবার আর একজনের বাড়িতে একটি সুরঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। আলকায়দা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ৯।১১ হামলার মাধ্যমেই তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এইসব জঙ্গিরা পাকিস্তানের আল-কায়দার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং অস্ত্র সংগ্রহ সরবরাহ, জেহাদী প্রচার, অকস্মাৎ হামলা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব ছিল এদের উপরে। খবরে প্রকাশ যে, ভারতের রাজধানী দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অকস্মাৎ হামলা চালানোর এক ভয়ঙ্কর ছক কষেছিল এরা, যা NIA গোয়েন্দারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন যে সর্বৈব ব্যর্থ, এতে কোনও সন্দেহই নেই এবং এই বিষয়ে মহামহিম মাননীয় রাজ্যপাল যে মন্তব্য করেছেন, তা একেবারেই যথার্থ। তিনি টুইট করেছেন যে—''State has become home to illegal bomb making that has the potential to unsettle democracy. Police@ Mamata Official busy in carrying out political errands and taking on the opposition. Those at helm@WB Police cannot escape their accountability for this alarming decline in law and order.''

—স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের নিরাপদ মনে করছে কারণ এই টুইট অনুযায়ী, রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে এই জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করতে। বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য প্রশাসনের দুর্বলতার কথা এখন এই রাজ্য বহুচর্চিত বিষয় ও বিভিন্ন বিরোধী দলনেতানেত্রীদের বক্তব্যেও উঠে আসছে। ২০১৪ সালে ভয়াবহ খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড (বর্ধমান জেলা), ২০১৮ সালে বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরণ ও তার চক্রীর এই রাজ্যে ধরা পড়া, কয়েক মাস আগে তানিয়া পরভীন নামক এক উচ্চশিক্ষিতা ছাত্রীর উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়া থেকে গ্রেফতার হওয়া এবং বর্তমানে এই সকল আল-কায়দা জঙ্গিদের ধরা পড়া এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, এই রাজ্য ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের শক্ত খাঁটিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কয়েক মাস আগে নৈহাটীতে এক ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ড ঘটে যায়—যার অভিঘাতে গঙ্গার অপর তীরবর্তী ঘরবাড়ীও কেঁপে ওঠে। এই বিস্ফোরণের যে চিত্র সমস্ত টিভি চ্যানেলে তথা সমস্ত সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অতি ভয়ঙ্কর কোনও বোমা বিস্ফোরণই সেদিন ঘটেছিল। এর পিছনেও কোনও নাশকতামূলক কাণ্ড ছিল বলেই সন্দেহ আর যে রাজ্য বোমা তৈরীর কারখানা রূপে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেখানে যে এমনটা ঘটবেই, এটাই তো স্বাভাবিক।

CAA পাশ হওয়ার পরেই মুর্শিদাবাদে শুরু হয়ে যায় ভয়ানক জেহাদী কার্যকলাপ। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, রেলের লাইন উপড়ে ফেলে দেওয়া, রেলের বগিতে অগ্নিসংযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্যকলাপ সেই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাজ্য সরকারের দ্বারা নানাভাবে সমর্থন না থাকলে এত ভয়াবহ কাণ্ড ঘটানো সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রাজ্য সরকার যেহেতু CAA-NRC বিরোধী, তাই এই সকল কাণ্ড যারা ঘটিয়েছিল, সেইসব জেহাদীদের কখনই দেশবিরোধী বা রাষ্ট্রদোহী বলে চিহ্নিত করেনি। কিন্তু, এটা তো আজ প্রমাণিত যে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল আল-কায়দার ডেরায় পরিণত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মুসলমান যুবকদের এইসব ভুল পথে নিয়ে যায়। তাই প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে খারিজি মাদ্রাসার কথাও; যে সব স্থানে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু, একটা কথা এই ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতেই হবে—তা হল এই যে, এমন কোথাও তো শোনা যায়নি যে, অশিক্ষিত বা শিক্ষিত দরিদ্র, বেকার হিন্দু যুবকেরা নানা জঙ্গি সংঘটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদী হামলা করে বেড়াচ্ছে! এর কারণ, হিন্দু ধর্ম সন্ত্রাস-শিক্ষা দেয় না। যারা বলেন যে, সব মুসলমানই জঙ্গি নয়, তাদের বোধ হয় এটা স্মরণে নেই যে, সব জঙ্গিই কিন্তু মুসলমান। তাছাড়া, এই ইসলামী সন্ত্রাস কোনও রকম দারিদ্র্য বা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই কলেজের শিক্ষিত ছাত্র, কম্পিউটার সায়েন্সের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রও জঙ্গি দলে নাম লেখায়। মনে রাখতে হবে যে, ওসামা বিন লাদেন নিজেও একজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জঙ্গিসর্বাধিনায়কই ছিল। আসলে এটি হল ইসলামী মৌলবাদী উগ্র মানসিকতা যা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গু জ্বাধঙ্ক বা আল-কায়দার নাম ধরে উপস্থিত হয়েছে। যে সকল কথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখনও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে চান, তাদের প্রতি করুণা জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম প্রসঙ্গে কি বলেছেন, তা

এই ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করি ঃ "লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।" (Complete Works, Vol IV, P. 125-126)

স্বামীজী আরও বলেছেন যে—"হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল।" (বাণী ও রচনা ৯।৪৩৯)

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সতর্কবাণী এই যে—"মুসলমানগণ সর্বজনীন 'ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব' করে, কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না—তাহার গলা কাটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক।" (৩।১৫৪)

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণী এই যে—"মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না।.... অতএব ওঠ, জাগো—পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।" (৫।৩৪০)

যে সকল হিন্দুধর্মবিদ্বেষী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এত সবের পরেও উগ্রপন্থাও মুসলমান ধর্মকে সমার্থক বলে মানতে রাজী নন, তাদের প্রতি স্বামীজী বলেছেন যে—"জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু।.... ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।" (৯।৪৪৭)

স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় এইকথাই জানিয়েছেন যে—"বর্বর জাতির আগ্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না যে প্রতিমুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে।" (৫।২৭১)

—তাই আজ একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়ানক ইসলামিক মৌলবাদ তথা জঙ্গিবাদ ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে, তার মূলে রয়েছে অকথ্য সংখ্যালঘু তোষণ, মহামহিম মাননীয় রাজ্যপালের কথায় তোয়াক্কা না করা, যে কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর ক্ষেত্রে জমি দেওয়ার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনও ভাবেই সহায়তা করে নি। তাই আজও কয়েক হাজার কিলোমিটার বেড়া দেওয়া বাকীই রয়ে গিয়েছে। আসলে দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি এই রাজ্যে উপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছে। আজ একথা মনে রাখতেই হবে যে, এই রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠেছে, তা একেবারেই যথার্থ। ছদ্ম ধর্ম-নিরপেক্ষতা যে কতদূর ভয়ানক হতে পারে, বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যে একের পর এক ঘটনা তা আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এর পরেও যদি ইসলামী জঙ্গি বা মুসলমান-সন্ত্রাসবাদ (যে বিষয়ে আজ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশই চিন্তিত) প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন না হয়, তবে ভয়াবহ বিপদ তথা ভয়ঙ্কর জঙ্গিহানা যে কোনও সময়েই ঘটে যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নমস্তে ট্রাম্প অনুষ্ঠানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও তাঁর বক্তব্যে এই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে বলেছেন। জঙ্গিরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হামলার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি সবই বদলাচ্ছে। তাই দেশের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের আজ ভারত সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে ও সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে। ভারতের প্রকৃত নাগরিক মুসলমানরা, যারা মনে-প্রাণে ভারতকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে মনে করে, সেই সব মুসলমান নাগরিক নিশ্চয়ই ভারতে থাকবে—কিন্তু, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশের স্বার্থবিরোধী ও জঙ্গিদের মদতপ্রদানকারী সংখ্যালঘু তোষণ একেবারেই চলবে না। তাই, পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তার স্বার্থে, এখানকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, সর্বোপরি ভারতের স্বার্থে আজ অবিলম্বে ভারত সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তবেই এই রাজ্যের কল্যাণ সাধন সম্ভব।

**লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক**

# বাঙলায় সংবাদ মাধ্যমে ‘মড়ক’ লেগেছে

## সুজিত রায়

তিন কলামের খবরের কাগজ। ১২ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি মাপের সাকুল্যে চারটি পাতা। ছাপায় পারিপাট্য নেই। লে-আউট বা অঙ্গ সজ্জাও ছিরিছাঁদহীন। প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ Bengal Gazette or The Original Calcutta General Advertiser। শিরোনামের নীচে লেখা ঃ A weekly Political and Commercial Paper open to all parties but influenced by none.

এই হল ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র Bengal Gazette -এর চেহারা। স্বত্তাধিকারী এবং সম্পাদক জেমস অগস্টাস হিকি। জাতে ব্রিটিশ। রোক বাঙালিদের মত।

১৭৮০-র ২৯ জানুয়ারি যে খবরের কাগজের মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জগতের উন্মেষ তার জন্মস্থান বাঙলার কলকাতা শহর। আর তার ইতিহাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধের। প্রতিবাদী এক আন্দোলনের। সাহসী এবং প্রত্যয়ী এক দুর্জয় অভিযানের।

জেমস অগস্টাস হিকির সেই অভিযানের শরিক হয়েই এই বাঙলাদেশই গোটা ভারতবর্ষের সংবাদ মাধ্যমে ইতিহাসের রূপরেখাটি তৈরি করে দিয়েছিল। বাঙলার মাটি থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় সংবাদপত্র ইন্ডিয়া গেজেট তৃতীয় সংবাদপত্র ক্যালকাটা গেজেট, প্রথম ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র (বাঙলা) সমাচার দর্পণ, ভারতীয় মালিকানায় প্রথম ভারতীয় ভাষা (বাংলা)-য় প্রকাশিত সংবাদপত্র বঙ্গাল গেজেটি, প্রথম দৈনিক সংবাদ প্রভাকর, প্রথম সান্ধ্য দৈনিক সন্ধ্যা, প্রথম উর্দু পত্রিকা নাম-ই-জাহাননুমা, প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র উদন্ত মাতর্ন্ড, প্রথম বহুভাষিক সংবাদপত্র বেঙ্গল হেরাল্ড, প্রথম সচিত্র বাঙলা পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিন্দু প্যাট্রিয়ট, প্রথম দ্বিভাষিক পত্রিকা সমাচার সুধাবর্ষণ, প্রথম বাণিজ্যিক সংবাদপত্র মহাজন দর্পণ, প্রথম মহিলাদের জন্য মাসিক পত্র সুগৃহিনী (হিন্দি), প্রথম মফস্বল সংবাদপত্র মুর্শিদাবাদ নিউজ, প্রথম বামপন্থী সংবাদপত্র জনযুদ্ধ এবং এই বাঙলাই উপহার দিয়েছিল প্রথম ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট মাইকেল মধুসূদন দত্তের।

যে বাঙলা এমন একাই ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক বাহক সেই বাঙলাই আজ প্রতিদিন একটু একটু করে সংবাদ মাধ্যমের কবর খুঁড়ছে। Changing Role of News Media-র দোহাই দিয়ে সংবাদ সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের সংজ্ঞাটাই বদলে দিয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। একদা যে সংবাদ মাধ্যম স্বাধীনতার দাবিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, রাজ্যবাসী এবং শাসক দলকে চিনিয়েছে উন্নয়নের পথ, যে সংবাদমাধ্যম জন্ম দিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের, নীল বিদ্রোহের, সিপাহী বিদ্রোহের আগুনকে সামাজিক আন্দোলনের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যে সংবাদ মাধ্যম, আজ সে মৃত্যুপথ যাত্রী। কারণ মালিক বিকিয়ে গেছেন। সংবাদ মাধ্যমের পরিচালকরা বিকিয়ে গেছেন। বলি দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের এক হতাশার যুপকাষ্ঠে।

চিরাচরিতভাবে সংবাদপত্রের মুখ্য ভূমিকা হিসেবে ভারতীয় সাংবাদিকরা দুটি কর্তব্যকে মেনে এসেছেন—বিশ্বস্ততা আর সমালোচনা, অনুসন্ধানী এবং প্রতিবাদী ভূমিকা। আজ সেই সব ধারণাই মুছে গেছে। আর্থার মিলার, বিখ্যাত মার্কিন নাট্যকার বলেছিলেন, "A good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself." আজকের বাংলার ২।৪টি সংবাদপত্র ছাড়া প্রায় সব বড় দৈনিকই মাথা নুইয়েছে শাসক দল আর রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের যুপকাষ্ঠে। মালিকানা কিনছেন প্রাইম প্রাইসে শাসকদলের পোষ্য পুঁজিপতিরা। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে যাঁরা বসছেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাভজা। যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার প্রশ্ন সেকেণ্ডারি।

সংবাদ মাধ্যমে খবর নেই, প্রচার আছে। সংবাদ মাধ্যমে সাংবাদিক নেই দালাল আছে। সংবাদ মাধ্যমে সম্মান নেই চাবুক আছে। আর আছে কুলহীন, দিশাহীন এক ভবিষ্যৎ যেখানে কোনও আলোর ফুলকিও দেখা যাচ্ছে না। এভাবেই কি চলবে সংবাদ মাধ্যম? গত দশ বছরের সর্বনাশা এক অঘোষিত নীতি এভাবেই বাঙলা সংবাদমাধ্যমের কফিনে প্রতিদিন ঠুকে যাবে পেরেক?

আমরা খাদ্যের অভাবে মন্বন্তর দেখেছি। কিন্তু খবরের এমন সড়ক-মৃত্যুর শরিক হইনি কখনও। এখন হচ্ছি। আরও হব যদি না একটা পরিবর্তনের ঢেউ তোলা যায়।

**(লেখক বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক)**

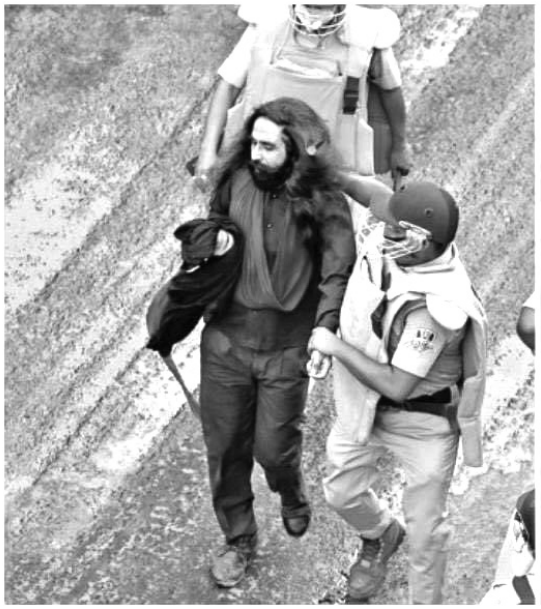

# সোশাল মিডিয়া: মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমের কাছে আয়না

রাহুল আদক

সংবাদ মাধ্যামকে গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভ বলা হয়। এবং ভারতীয় সাংবাদিকতার প্রেক্ষাপটে বাংলা সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ আজ তাদেরই যে একপেশে রূপ দেখা যাচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। অভিজ্ঞতা বলছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্রের বিশেষ কানও কাজে লাগেনি মূল ধারার সংবাদ মাধ্যম। সামাজিক ন্যায় বিচার ও প্রান্তিক মানুষের সশক্তিকরণের বেহাল দশা দেখলে, সংবাদ মাধ্যমের ব্যর্থতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। যখন দেখা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন ঘটে গিয়েছে। তখন এদের ব্যার্থতা আরও প্রকটভাবে ধরা পড়ে। বাংলায় মূল ধারার সংবাদ মাধ্যম দীর্ঘদিন ধরেই পুঁজি ও রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে গেছে। টেলিভেশন চ্যানেল বা সংবাদপত্র প্রকাশনা ও পরিচালনার জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন। এই অর্থের যোগান কেবল কোনও বৃহৎ পুঁজিপতিই দিতে পারেন। তার কাছে ব্যবসাই মূল লক্ষ্য। সত্যনিষ্ঠ খবর পরিবেশন, তার কাছে অপেক্ষাকৃত একটি গৌণ বিষয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিকদলকে খুশি করে তাকে ব্যবসা চালাতে হয়। বিজ্ঞাপন থেকে পরিমাণ মত রোজগার না এলে খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপন, দুটোই আসে শাসকদলের অঙ্গুলি হেলনে। পুঁজিপতি, রাজনৈতিক শক্তি ও সংবাদ মাধ্যম, এই তিন বিন্দুর মধ্যে, দেওয়া-নেওয়া এক বিসম ত্রিভুজ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে এই বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে, নিরপেক্ষ খবর পরিবেশন করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার।

টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল ও খবরের কাগজকে গণ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হলেও এতে জনগণের অংশগ্রহণ কতটুকু? পুঁজিপতির বেঁধে দেওয়া রাজনৈতিক লাইন মেনে, শাসকদলের আশীর্বাদধন্য কোনও সম্পাদক মশাই, মাইনে করা কিছু সংবাদ কর্মী দিয়ে খবর বিক্রি করেন! সাধারণ মানুষের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা দর্শক ও পাঠকরা ঠিক ততটাই জানতে পারেন, সম্পাদক মশাই যতখানি দেখাতে চান। সম্পাদক মশাই ঠিক সেই খবর দেখান বা ছাপেন, যা রাজনৈতিকদলকে খুশি করে।

মুক্ত চিন্তা ছাড়া নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশ কখনই সম্ভব নয়। আর সেখানেই স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন ও

সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সোস্যাল মিডিয়া এক চমৎকার ভূমিকায় মাঠে নেমেছে। কারণ, ব্যক্তি বিশেষ বা কোনও সমষ্টি, গোষ্ঠী বা দলকে খুশি করা নয়। কেবল মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সত্যনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে এখানে।

তবে, অনেকে যুক্তি দেন, সোস্যাল মিডিয়ার কারণে সহজে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারছে। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলে। ভারতবর্ষে সোস্যাল মিডিয়া আসার আগে পর্যন্ত যে পরিমাণ দাঙ্গা হয়েছে, তার তুলনায় গত ৭-৮ বছরে অশান্তি কম হয়েছে। যে কানও দাঙ্গার পিছনে, সমাজবিরোধী মৌলবাদী সংগঠনের উস্কানি থাকে। সাম্প্রতিক কয়েকটি দাঙ্গায় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম জড়িয়েছে। সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতেই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা জঙ্গি সংগঠনের যোগসাজোসের কথা দ্রুত জানতে পেরেছে। এইসব সংগঠনের বেশ কয়েকজন চাঁইকে, জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে অপপ্রচার ও অসত্য খবর ছড়ালে, দেশের আইনে শাস্তির বিধানও রয়েছে। সঠেক যেমন ভাবে বলা যেতে পারে যে, ছুরি, বন্দুকে প্রাণহানি ঘটতে পারে কিন্তু তাই বলে, অস্ত্রের উতাদন বা ব্যবহার বন্ধ করা যায়না।

ভারতবর্ষের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে এর অর্ধেক সংখ্যাক মানুষ সোস্যাল মিডিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ, প্রায় ৪০ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা, বিনোদন, পরিবেশ, প্রভৃতি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। মূলধারার সংবাদ জগতে সর্ব সাকুল্লে প্রায় ৫ লক্ষ সংবাদকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। ৫ লক্ষ সংগঠিত সংবাদকর্মীর মতামত বনাম ৪০ কোটি অসংগঠিত সংবাদ পরিবেশকের চিন্তাভাবনা। গণতান্ত্রিকতার নিরিখে সোস্যাল মিডিয়ার ভিত অনেক বেশি প্রশস্ত এবং তা ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। তবে, মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সোস্যাল মিডিয়ার প্রতিযোগিতা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে হাত ধরাধরি করে উভয়ে এগিয়ে চলুক।

সম্প্রতি সুশান্ত সিং রাজপুত ও দিশা শালিয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে মূলধারার এক সংবাদ সংস্থা। তাকে যথার্থ সঙ্গত দিয়েছে সোস্যাল মিডিয়া। সোস্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনমত তৈরি হয়। সেই উদ্দীপনা আবেগকে কাজে লাগিয়ে, অভিনেতা মৃত্যু রহস্যর তদন্তকে, ইতিবাচক গতিপ্রকৃতি দিতে সমর্থ হয় সংবাদ মাধ্যমটি। প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে মাফিয়ারাজ কায়েম করা এক দুষ্ট চক্র, এই অপরাধের ঘটনাকে প্রায় ধামা চাপা দিয়েই ফেলেছিল! কিন্তু সোস্যাল মিডিয়ায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে বিপুল জনমত গড়ে ওঠে। সোস্যাল মিডিয়ার চাপে পড়ে, জাতীয়স্তরের সমস্ত সংবাদ মাধ্যম, ন্যায় বিচারের দাবিতে সিবিআই তদন্তের পক্ষে জোরাল সওয়াল করতে শুরু করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই মামলার তদন্ত চলছে এবং নিত্যদিন হাড়হিম করা অপরাধের তথ্য উঠে আসছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হল এমন একটি রাজ্য যেখানে সামান্য স্কুল নির্বাচন ঘিরে গোলাগুলি চলে, মানুষ খুন হয়। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় কয়েক মাসে অন্তত শতাধিক মানুষ খুন হয়েছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন অন্তত ৫০জন বিজেপি নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে, ৭ দফার এমন একটি দিন নেই, যেদিন বিজেপি নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত ও খুন হয়নি। শাসকদলের নেতা-নেত্রীর অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে আক্রান্তদেরই পুলিশ গ্রেফতার করছে। মিথ্যা মামলায় ফাঁষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশি জুলুম, তৃণমূলি গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচার, বাম জামানায় হার্মাদবাহিনীর কথা মনে করাচ্ছে। তৃণমূল সরকারের মুষলমান তোষণের কারণে, ইসলামিক মৌলবাদীদের দৌরাত্ম অসহীয় হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় দাঙ্গা বাধিয়ে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তেহট্ট, ক্যানিং, কালিয়াচক, ধূলাগড়, উলুবেড়িয়া,বাদুড়িয়া, আসানসোল, সন্দেশখালি, মালদা, তেলিনিপাড়া প্রভৃতি স্থানে বড়সড় দাঙ্গা সংগঠিত করেছে জামাতির মদতপুষ্টরা। পুলিশ প্রশাসন সদ্বর্থক ভূমিকা পালন না করে চুপ থাকছে। ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য শাসকদল প্রশাসনকে ঠুটো করে রেখেছে। সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য রক্ষার নামে, চাটুকার সংবাদ মাধ্যম হিন্দুদের আক্রন্ত হওয়ার খবর চেপে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সম্পত্তি ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, মা-বোনদের লাঞ্ছণা ও অত্যাচারের খবর দেশের অন্য প্রান্তের মানুষ যেটুকু জানতে পেরেছে তা কেবল সোস্যাল মিডিয়ার মধ্যামে। তৃণমূলি নেতাদের কাটমানি ও তোলাবাজির দাপটে সাধারণ মানুষ অতিষ্ট। গরীব মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, আম্ফান ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা, কোভিড-১৯ ভাইরাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো রেশন সামগ্রী, কোনও কিছুই বাদ দেয়নি তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। গরীব মানুষের টাকা ও রেশন সামগ্রী লুটপাট করছে। মূলধারার অধিকাংশ বাংলা সংবাদ মাধ্যম, যতটুকু এই খবর দেখাচ্ছে, তা সোস্যাল মিডিয়ার চাপে পড়ে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, শাসকদলের নির্বাচিত জনপ্রতিধিনিদের ঘর বয়ে এসে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আর সেই ছবি নিমিষে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে সাস্যাল মিডিয়ায়। রাজ্যের এই বেহাল পরিস্থিতি, যেখানে প্রশাসন বলে কিছু নেই। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই অবনতি হয়েছে যে পুলিশকে বিক্ষুব্ধ মানুষ ঘিরে মারছে। এরকম অবস্থায় রাজ্যবাসীর মৌলিক অধিকার রক্ষা ও রাজ্যের গণতান্ত্রীক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আগামী দিনে সোস্যাল মিডিয়া আরও বড় ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা যায়।

# নারী কল্যাণ: নারীবাদ নয়, নারীবোধ এর জাগরণ

## সুলতা মন্ডল

'আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র' ( স্ত্রীরপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

সত্যিই নারীর সামনে আজ বিস্তর বিশালতা। যেমন-আছে অনেক সম্ভাবনা তেমনি আছে অনেক প্রতিবন্ধকতা। নীলসমুদ্র যেন আজ সত্যি নারীর সামনে প্রবাহিত। সেই সমুদ্রের গভীরতা এতটাই বেশি যে পুরান থেকে বর্তমানের যুগ পরিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে "নারী"কেই তুলে ধরা হয়। দ্রৌপদী থেকে সীতা একের পর এক উদাহরণ। আর এই দুটি উদাহরণ এতটাই চরম যে, ভয়েই হোক বা সম্মানে "সীতা আর দ্রৌপদী"র নাম কোন বাবা মা-ই নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে রাখতে সাহস করে না।

নাম দুটি সত্যি খুব সমস্যার। ঘরে ঘরে সবার মুখেই প্রচলিত সমস্যার মূলে সেই নারী। উদাহরণ দেবার তো আছেই- 'মহাভারত আর রামায়ণ- যেন দুই ভাই, একে অপরের পরিপূরক।' সেই দ্রৌপদীর সময় থেকে আজও মেয়েদেরই সমস্যার কারণ বলা হয়ে থাকে। এখানে দুর্যোধন, দুঃশাসন, যুধিষ্ঠির, ভীম, ভীষ্ম এদের কোন দোষ থাকতেই পারে না। কারণ- সমস্যা তো মেয়েতে। দুর্যোধন শোষণ করুক আর ভীম-ভীষ্ম তাকিয়ে দেখুক এতে কোন সমস্যাই নেই। আর এই ঘটনা দেখার পরেও মেয়েরা বুঝতে পারেনি যে, সবসময় সমাজের কেউ বা স্বামী-ভাই-পুত্র আমাদের বাঁচাতে পারবে না। তার জন্য আমাকে নিজে শক্তিশালী হতে হবে। দ্রৌপদীতো নিজের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারেনি। কারণ- যুদ্ধক্ষেত্রে তো নারীদের প্রবেশ নিষেধ। তুমি সম্রাজ্ঞী হতে পারো কিন্তু রণভূমির যোদ্ধা হতে পারবে না।

সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত পরিবারের মেয়েরা আজও রাণী। তুমি সাজতে পারবে, মহলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে পারবে কিন্তু পাশের বাড়ির মেয়ের অসুবিধায় তুমি এগিয়ে যেতে পারবে না। কারণ- মেয়েরা আবার বাইরে বেড়িয়ে প্রতিবাদ

করবে? এতে পরিবারের সম্মানহানী হবে না? কিন্তু সেই রানীর অসুবিধায় তার পরিবার হয়তো কোন সংগঠনের কাছে গিয়ে সাহায্য নিতে পারে। তবে নিজের মেয়েকে প্রতিবাদী করে তোলা যাবে না। তাকে বাঁচার উপায় না শিখিয়ে পরজীবী করে রাখতে থাকে পরিবার। তারজন্য লড়বে রাজনৈতিক পার্টি কিং বা সংগঠন। নারীবাদীদের চারিদিকেবড় বড় পোস্টার লাগিয়ে খুব আন্দোলন করতে দেখা যায়। কোন মেয়ে ধর্ষিত হলে মোমবাতি জ্বালিয়ে লাই নেই আগে তাদেরইদেখা যায়। সত্যি কি নারীবাদীরা নারীদের জন্য ভাবে? ভাবলেও কতটা ভেবেছে?

খুব ছোটবেলা থেকে একটা গল্প শুনছি- ভগবান রামচন্দ্র সীতামাকে গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করেছিলেন এবং অগ্নিপরীক্ষাও নিয়েছিলেন। নারীবাদীরা এই কারণে ভগবান রামচন্দ্রকে ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু নারীবাদীরা যদি সত্যিই নারীদের জন্য ভাবে তাহলে এখানে রামচন্দ্রের কাজ দেখে ঘৃণা প্রকাশ করলেও সীতামায়ের শক্তিদেখে কেন গর্ব অনুভব করছেনা? সীতা মা নিজের পবিত্রতার গুনে, নিজের শক্তির গুনে জীবনে আর কখনও পিছন ফিরে তাকাননি। নারীবাদীরা কেন সীতা মায়ের এই শক্তির কথা মেয়েদের সামনে তুলে না ধরে লুকিয়ে রাখে? একজন নারী নিজেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণা সীতামাকে দেখে এই শিক্ষা নিয়ে কেন সেটা মেয়েদের সামনে তুলে ধরে না?

নারীবাদটাও আসলে ব্যবসা বাদ। একজন মেয়ের শক্তিকে একজন মেয়ের সামনে তুলে না ধরে মেয়েদের ক্ষমতা লুকিয়ে রেখে মেয়েদের দূর্বল করার চেষ্টা। নারীবাদীদের যদি সত্যি মেয়েদের জন্য কিছু করার ইচ্ছে থাকে তবে অত্যাচারিত মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর সঙ্গেসঙ্গে মেয়েদের এমনভাবে ছোটবেলা থেকে তৈরী করার শিক্ষা দিতে হবে যাতে মেয়েরা আর কোনদিন অত্যাচারিত না হয়। কেউ যেন কোন সমস্যার মূলে একটা মেয়ে আছে বলতে না পারে।

আমাদের সব পরিবারে এখনও জন্মগ্রহণ করলে তাকে পরিবারের লক্ষ্মী বলা হয়। এবার হয়তো ভাবার সময় এসেছে বাড়ির মেয়েদের মহামায়া বা চন্ডী বলার। সমগ্র দেবদূতকে রক্ষা করার জন্য যদি মহামায়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে পরিবার বা সংসারের রক্ষাকর্তী হিসেবে পরিবারের মেয়েকে মহামায়া বলা যাবে না কেন? আসলে আমাদের পরিবার মেয়েকে পুতুলের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেওয়া শেখালেও পুতুলের সঙ্গে পুতুলের মল্ল যুদ্ধ শেখায়নি।

রাজনীতিতেও নারীকে সেভাবে এগিয়ে আসতে দিতে চায়না ভারতের অনেক রাজনৈতিক দল। যেভাবে কিছুদিন আগে নির্বাচনে মহিলা সংরক্ষণ ইস্যুতে লালু-মুলায়মের মত দল বিরোধ করেছে বুঝতে পারি না এই দলগুলোকে কোন মেয়ে রা ভোট দেয়। আসলে এবাবেই হয়তো মেয়েরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছে। দুর্গাবাহিনীর মত বাম বা কংগ্রেস শিবিরের তেমন তো কোনসংগঠন দেখি না যারা মেয়েকে আত্মনির্ভরশীল করতে কিংবা Self defence শেখানোর উদ্যোগ নেয়। বরং তারা কোন মেয়ে ধর্ষিত হলে সেই মেয়ের জন্য মোমবাতি আর কালো ঝান্ডা নিয়ে বিচার চাই, শাস্তি চাই, জবাব চাই বলে রাস্তায় দাড়িয়েই তাদের দায়িত্ব খালাস মনে করে। আমাদের মেয়েরা কি এতেই খুশি?তাই যদি না হয় তাহলে তারা নিশ্চই আগামীতে যে দল তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডাতেই বেটি বাঁচাও — বেটি পড়াও এর শপথ নেয়, যে দল একাধিক মহিলাকে তাদের উচ্চ পদে প্রজেক্ট করে তাদের পাশেই দাঁড়াবে।

# নিত্যদার চা'র আড্ডা আজকের বিষয়: পার্টি ক্লাস

## দেবাশিস আইয়ার

করোনার কারণে নিত্যদার চায়ের ঠেক প্রায় বন্ধ। আনলক ৫ এর পর একটু একটু সাহস টা এসেছে। তাই ৭ ভাই চম্পা ও বোন পারুলের আড্ডা আজ আবার বসেছে। এদের এক একজন এক এক পিস। বাঙালির চায়ের ঠেক মানেই রাজনীতি মাস্ট। কেউ সিপিএম, কেউ কংগ্রেস, কেউ টিএমসি তো কেউ বিজেপি। এমনকি নোটা এবং সিভিল সোসাইটিও আছে। আর এদের মেন্টর কার্তিক জ্যেঠু। আজ সবাই ঢুকে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বিবেকদার পাত্তা নেই। সবার দু খেপ চা হয়ে যাওয়ার পর হন্তদন্ত হয়ে বিবেক দা ঢুকল। রামু দা খেপে ব্যোম। ওই এতদিন পর আজ বসছি, তুই এত দেরী করলি কেনো রে? বিবেক দা সাফাই এর ঢঙে, আজ পার্টি ক্লাস ছিল। জানিস ই তো, সামনে বিধানসভা। এবার একটু এদিক টাও সামলাতে হবে। ২১ শে এসে যাই, তারপর আবার জমিয়ে আড্ডায় ফেরা যাবে। আর রামু তুই তো আচ্ছা, তোরও তো যাওয়ার কথা ছিল। গেলি না কেন ?

রামু দা বলল, দ্যাখ আমায় তো কেউ জানায়নি।

বিবেক দা- কিন্তু তুই তো শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ। মন্ডলের পার্টি ক্লাসে তোর তো যাওয়ারই কথা। আর তাছাড়া আমিও তোকে জানিয়েছিলাম। তোকে কে জানালে যাবি ? স্বয়ং জেলা প্রেসিডেন্ট না কি নাড্ডা জী। ভাই রে এত ইগো নিয়ে চললে আর ২১ শে আসতে হবে না। ঘরের মান অভিমান পরে করবি, আগে তো পর কে হারা।

কার্তিক জ্যেঠু এবার মুখ খুললেন। দ্যাখ রামু, তোরা এত সহজেই এত মান অভিমান করিস। একটু গুরুত্ব হারালেই হতাশ হয়ে পড়িস। তোদের জন্য কিন্তু বিজেপির মত পার্টি না। বিজেপির ইতিহাস-ভূগোল-অঙ্ক কিংবা রসায়ণ কিন্তু একটু আলাদা। এখানের মূল বিষয়ই হল 3D–Dedication, Devotion & Discipline অর্থাত, নিষ্ঠা-সমর্পণ-অনুশাসন। মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে দলের প্রতি আণুগত্য ও সমর্পণ এবং সাংগঠনিক গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করার অনুশাসন। এটাই কিন্তু একজন কার্যকর্তা তথা নেতা তৈরি করে।

কার্তিক জ্যেঠু দীর্ঘদিন বাম শিবিরে থাকার পর পুটকি লাগিয়ে রাম হয়েছেন। তাও হয়ে গেল বহু বছর। অযোধ্যার কর সেবার সাক্ষী। কার্তিক জ্যেঠুদের গ্রুপ টার সবার একসে বড়কর এক অভিজ্ঞতা। আমরা মুখিয়ে থাকি কখন জ্যেঠু মুখ খুলবেন।

পারুল দি এই সুযোগে টিপ্পনি কাটল। জ্যেঠু আপনি বললেন বিজেপির ইতিহাস-ভূগোল এক বিশেষ ধরণের। এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

জ্যেঠু বললেন, দ্যাখ আমি ঘটনার ক্রোনোলজি টা বলি, তাহলেই বুঝবি ভারতের রাজনীতির ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে কি ভাবে আবর্তিত হয়েছে। তুই তো ঢক্ষ্ছ এর প্রস্তুতি নিচ্ছিস, তোর এগুলো জেনে রাখা উচিত। সংক্ষেপে একে বলতে পারিস, জনসংঘ থেকে বিজেপির ইতিহাস।

১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীনের পর পরই পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ। নেহেরুর অদূরদর্শীতার কারণে পাকিস্তানের দ্বারা জম্মু-কাশ্মীরের এক অংশ দখল। ১৯৪৮ এ গান্ধীজীর হত্যা। এই সময় কংগ্রেসে নেহেরুর রাশিয়া পন্থী সমাজ ভাবনার সাথে মেলাতে পারছিলেন না অনেক কংগ্রেসী। কেউ কেউ মন্ত্রীসভার লোভে নেহেরুর সাথে মন কষাকষিতে গেলেও বিদ্রোহ করতে সাহস দেখায়নি। কিন্তু দেখিয়েছিলে বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জীর সেরা রত্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ১৯৫১ র ২১ অক্টোবর স্থাপন করলেন জনসংঘ (JS)। RSS এর ততালীন প্রধান, ওদের ভাষায় সরসংঘচালক গুরুজী গোলওয়ালকর শ্যামাপ্রসাদ জীকে কয়েকজন স্বয়মসেবক দিয়েছিলেন। তারা হলেন- দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, নানাজী দেশমুখ, বলরাজ মাধোক, কুশাভাউ ঠাকরে, সুন্দরসিং ভান্ডারী, জগদীশ প্রসাদ মাথুর প্রমুখ। ১৯৫২ এর প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জনসংঘ র

লোকসভার ৩ টি আসনে জয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জেতেন। ১৯৫৩ র ২৩ জুন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী র আকস্মিক মৃত্যু। ১৯৫৭- দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এবার ৪ টি সিট। অটলজী জেতেন। ১৯৬২- ভারত —চীন যুদ্ধ। তারপরই সাধারণ নির্বাচন। জনসংঘ ১৪ সিট। ১৯৬৫ - গোয়ালিয়রের প্রতিনিধি সভায় দীনদয়ালজীর একাত্ম মানব দর্শন এর উত্থাপন। ১৯৬৫- ভারত —পাক যুদ্ধ। ১৯৬৬, ১১ জানুয়ারী- তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অকস্মাতমৃত্যু। ১৯৬৭- কালিকট অধিবেশনে দীনদয়ালজি জনসংঘের অধ্যক্ষ/সভাপতি হলেন। ওই বছরই বিহার, উত্ত রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে জোট সরকার হিসাবে ক্ষমতায় আসে জনসংঘ। ১৯৬৭- সাধারণ নির্বাচন। জনসংঘ ৩৫ সিট। ১৯৬৮ র ১১ ফেব্রুয়ারী মোঘলসরাই স্টেশনে হঠাতই পাওয়া গেল দীনদয়ালজীর মরদেহ। যে হত্যা রহস্যের খোঁজ আজও পাওয়া গেল না। এরপর বাজপেয়ী জি সভাপতি হলেন। ১৯৭১- ভারত-পাক যুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন। ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ। ১৯৭১ এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়। জনসংঘ মাত্র ২২ সিট।

৭০ এর দশক। আমেরিকায় হিপ্পি দের সাথে সাথে এই দেশজুড়ে বাম ও নৈরাজ্যবাদীদের দাপাদাপি শুরু। কংগ্রেস দূর্নীতিতে এমন জড়ালো যে এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে গণ অভ্যুত্থানের সূচনা। এরপর ১৯৭৫ - দেশ জুড়ে Emergency। এর প্রেক্ষাপট টি বেশ আকর্ষক। ১৯৭১ এর নির্বাচনে সমাজবাদী নেতা রাজ-নারায়ণ রায়বেরেলী সিট এ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পরাজিত হবার পর ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেন। তার অভিযোগ ছিল ইন্দিরা গান্ধী অসতউপায় অবলম্বন করে ভোটে জেতেন। এই মামলার রায় বের হয় ১৯৭৫ এর ২৪ জুন। কোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর জয় কে অবৈধ ঘোষণা করে। গদি হারানোর ভয়ে ইন্দিরা গান্ধী দেশ জুড়ে Emergency জারী করলেন ২৬ জুন। ১৯৭৭ এর ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত যা বলবত ছিল। এই সময়ে ১৯৭৬ এ ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীতে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) ও সমাজতান্ত্রিক (Socialist) শব্দের প্রবেশ ঘটান। এরপর ১৯৭৭ এর সাধারণ নির্বাচন। জয়প্রকাশ নারাযণের ইন্দিরা হঠাও কে মান্যতা দিয়ে জনসংঘ নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে জনতা পার্টিতে মেশে। জনতা পার্টি ২৯৫ টি আসনে জেতে। (তার মধ্যে ৯৩ টিতেই জনসংঘীরা জেতে)। মোরারজী দেশাই সরকারে বাজপেয়ীজি বিদেশ মন্ত্রী ও আদবানী জি তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হন। সেই সময় RSS এর সদস্য থাকা যাবে না এই মতের বিরোধীতা করে ১৯৭৯ তে জনসংঘের প্রতিনিধিরা জনতা পার্টি থেকে ইস্তফা দেন। জনতা সরকারের পতন হয়।

এরপর সেই বিশেষ দিন। ১৯৮০, ৬ এপ্রিল। দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ হল ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি র।

এই সময় বিজেপির মূল দর্শন হিসাবে নেওয়া হয়- একাত্ম মানব দর্শন। আর মূল নীতি হিসাবে নেওয়া হয়-পঞ্চনিষ্ঠা। এই পঞ্চনিষ্ঠা হল - জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি / গণতন্ত্র / সর্বধর্ম সমভাব / বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি / নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি। ১৯৮৪- বিজেপি হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর প্রথম নির্বাচন। মাত্র ২টি আসনে জিতল বিজেপি। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু। রাজীব গান্ধীর প্রধানমনমন্ত্রী হওয়া। এরপরই বোফর্স কেলেঙ্কারী। দেশে অসন্তোষ শুরু। ১৯৮৯- কেন্দ্রে ভিপি সিং এর নেতৃত্বে জোট সরকার গঠন। ৮৬টি আসনে জিতে বিজেপির বাইরে থেকে ভিপি সিং সরকারকে সমর্থন।

এই সময়ই শুরু হল মন্ডল কমিশনের আড়ে দলিত দের খেপিয়ে রাজনীতির নতুন রমরমা। হিন্দুদের বিভেদ করার আবার চক্রান্ত। হিন্দুদের জোড়ার উদ্দেশ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে রাম মন্দির আন্দোলনের সূচনা। স্লোগান উঠল —"মন্ডল হামে তোড়তা হ্যায়, কমন্ডল হামে জোড়তা হ্যায়।" ১৯৯০- লালকৃষ্ণ আদবানীর রথযাত্রা। সোমনাথ থেকে অযোধ্যা। তখন উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সরকার ও বিহারে লালু সরকার। বিহারে আদবানী জির রথ আটকে ওনাকে গ্রেফতার করলেন লালু। ওদিকে, উত্তরপ্রদেশে করসেবক দের ওপর অন্ধভাবে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন মুলায়ম। কেন্দ্রের সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার বিজেপির। কেন্দ্রের ভিপি সিং সরকার পতন। কংগ্রেসের সমর্থনে কেন্দ্রে চন্দ্রশেখর সরকার গঠন। কিছুদিন পর কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহার। দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচন।

১৯৯১- সাধারণ নির্বাচন। কেন্দ্রে নরসিমা রাও এর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। বিজেপি পেল ১২০ টি আসন। নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন রাজীব গান্ধীর মৃত্যু। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার এল বটে কিন্তু তা হল জোট সরকার। এ বছরই উত্তর প্রদেশে কল্যাণ সিং সরকার ক্ষমতায় এল। ইতিমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। ১৯৯২- অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের সংকল্প নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করসেবা র ডাক। ৬ ই ডিসেম্বর বাবরি ধাচাঁ ধ্বংস। সমস্ত দায় নিয়ে কল্যাণ সিংয়ের পদত্যাগ। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও আরও তিনটি রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ) বিজেপির সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করল। এরপর ১৯৯৬ এর লোকসভা নির্বাচন। ১৬৩ আসনে জয়লাভ করে বিজেপি সর্ববৃহত দল হিসাবে উঠে এল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে এই সরকার মাত্র ১৩ দিন স্থায়ী হল। এরপর কংগ্রেসের সমর্থন দান ও প্রতাহারের নাটকে এক মিউজিকাল চেয়ার চলল ২ বছরের মত। কিছুদিন দেবগৌড়া, কিছুদিন গুজরাল। ১৯৯৮ এর সাধারণ নির্বাচন। ১৮২ টি আসনে জিতে বিজেপির প্রথম ঞ্জঙ জোট সরকার গঠন। ১৩

মাস পর জয়ললিতার সমর্থন প্রত্যাহার। সরকার পতন। ১৯৯৯ এ ফের নির্বাচন। এবার ১৮৩ আসনে জিতে পূর্ণ মেয়াদের সরকার চালালেন অটলজী। ইহাই NDA-1 নামে খ্যাত। ২০০৪- বিজেপি ১৩৮। ক্ষমতায় এল কংগ্রেস সরকার। মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে UPA 1। ২০০৯- বিজেপি ১১৬। UPA 2। ১০ বছর বিরোধী আসনে বিজেপি। বিরোধীরা ভাবতে শুরু করল বিজেপি বুঝি খতম। কিন্তু না। বারবার ফিনিক্সের মত ধ্বংসস্তুপ থেকেই উঠে আসে বিজেপি। পাঁকে যেমন পদ্ম ফোটে তেমনি রাজনীতির পাঁকে বিজেপি নিজেকে কমল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আর অন্যদিকে, কংগ্রেসের সেই এক রোগ। CORRUPTION। দিকে দিকে আন্না হাজারে, বাবা রামদেব ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের নেতৃত্বে শুরু হল MOVEMENT AGAINST CORRUPTION। স্বচ্ছ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত নেতৃত্বের মুখ হিসাবে উঠে এলেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪- একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও (২৮৩ আসন) বিজেপি গঠন করল NDA-2 সরকার। দেশ পেল মোদী-১ সরকার। আর সদ্য ২০১৯ এ তো বিজেপির ই একক আসন ৩০৩। মোদী ২ সরকার গঠন।

ঝড়ের মত পুরো ইতিহাস বলে একটু চুপ করে গেলেন কার্তিক জ্যেঠু। সবাই মন্ত্র মুগ্ধের মত স্পিকটি নট। সবার হাতের চা জুড়িয়ে জল। নিত্য দা বলল, ওটা ফেলে দিন আমি আবার চা দিচ্ছি। আর এবারের চা আমার তরফ থেকে ফ্রি। যা সব জিনিস জানছি মশাই।

ধনা দা বলে উঠল- সে তো হল। কিন্তু এতে পার্টি উইথ ডিফারেন্সের আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা কিন্তু ক্লিয়ার হল না। ধনা দা ইংলিশ মিডিয়াম। তাই বাংরেজী টা ওর জন্মগত অধিকার।

জ্যেঠু বললেন, আজ তো বিবেক পার্টি ক্লাস করেই এল। ওর কাছ থেকেই এটা একটু শুনি। সবাই তাল দিল। খালি কাশী দার কাঠি মারা যাবে না। ও বলল, পার্টি ক্লাসের মগজ ধোলাই টা বল দেখি বিবেক। বিবেক দা পুরো স্ট্রেট ড্রাইভে খেলল। বলল, তা ঠিক বলেছিস কাশী। কাপড় যেমন নোংরা হলে ধোলাইয়ের দরকার পড়ে ঠিক তেমনি আমাদের মাথায় সেকু-মাকু-নেকু র যে আবর্জনা এত বছর জমা হয়েছে তা সাফাই করতে বিজেপির আদর্শবাদের ওয়াশিং মেশিন ই লাগবে। তাহলে শোন কেন বিজেপি বাস্তবিকই PARTY with DIFFERENCE।

মূল কারণই হল সচরাচর অন্যান্য পার্টির কার্য পদ্ধতির সঙ্গে বিজেপির মেলে না। যেমন, বিজেপি মনে করে না দেশপ্রেম একটা হুজুগ বা বাতরিক উতব। বিজেপির কাছে এটা নিত্য অনুশীলন ও চর্চার বিষয়।

বিজেপির সবথেকে গুরুত্বগূর্ণ বিষয়, ভাষা ও ভাবের ভারতীয়করণ। সে অর্থনীতির ভাবনাই হোক বা সমাজনীতি। সে বিচার দর্শনই হোক বা নিত্য অনুশীলনের বিষয়। স্বামীজি বলতেন, ধর্মই ভারত আত্মা। বিজেপিও ধর্মর এই গুরুত্বে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ধর্ম-র যে অর্থে মুসলমান, ক্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় গুলি নিজেদের ধর্ম বলে সে অর্থে হিন্দুকে ধর্ম বলা চলে না। হিন্দু হল ভারতের সংস্কৃতি, জাতীয় পরিচয়। বিজেপিও এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। গান্ধীজির সর্বদয়-এর সমাজ ভাবনাকে পরবর্তী সময়ে একাত্ম মানব দর্শনের রূপে আরও ব্যাপক, সার্বিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন দীনদয়াল জী তাঁর অন্ত্যদয় দর্শনে। সিপিএম বা কংগ্রেস যে সাম্যবাদের কথা বলেছে তার রূপায়ণ করেছে ধনীদের সম্পত্তি কেড়ে তাদের গরীব বানিয়ে। অন্যদিকে বিজেপি ভেবেছে, ধনীদের গরীব না বরং গরীবদের কিভাবে ধনী বানানো যায় বা ধনী হওয়ার পথ দেখানো যায়।

আপাত ভাবে তুচ্ছ জিনিসকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখলে যে কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে তার উদাহরণ ই হল- সোনালী চতুর্ভুজ থেকে ভারতমালা বা সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। জনধন বা উজ্জ্বলা কিংবা আয়ুষ্মান ভারত ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে এটা ভাবার সাহস কেউ দেখায় নি আর মোদীজি সেটাই করেছে। আর একেই বলে Decisive Leadership। MODI মানে যেন Man Of Discipline-Dedication-Devotion-Decisiveness & Integration. Integral Humanism তথা একাত্ম মানব দর্শনের যেন প্রতিরূপ। আর তাই তো প্রথম ক্ষমতায় আসার পর মিডিয়া যেন মুখিয়েই ছিল কোনও controversy র। কিন্তু তার জাগায় শুনল- সবকা সাথ সবকা বিকাশ। দ্বিতীয় বার ৩০৩ তাকে প্রত্যয়ী করল এটা বলায় "সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস"।

এখানে কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ শিবিরের নাম দেওয়া হয় ব্যক্তিত্ব বিকাশ বর্গ। যেখানে অন্য সংগঠন রা করে Leadership Development Camp। এখানে নেতৃত্ব নয়, ব্যক্তিত্বই আসল। আর তাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে অবলীলায় বেরিয়ে যায়—প্রধান সেবক বাক্যবন্ধ। যদি এক কথায় বলা হয় সিপিএম-এর মূল বিচার কি, সবাই বলবে সাম্যবাদ। ঠিক সেভাবেই কংগ্রেস মানে জাতীয়তাবাদ। আর বিজেপি? হিন্দুত্ববাদ? মোটেও না। তবে? আসল হল হিন্দুত্ব-বোধ। বাদ থেকে বোধের এই উত্তরণের ভাবনা জোগায় বলেই বিজেপি সত্যিই একটি আলাদা পার্টি।

সবথেকে বড় কথা হল, ভারতীয় জনতা পার্টি র নামেই লুকিয়ে এর পরিচয়। ভারতীয় কে? জনতা কি? পার্টি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুজলেই পাওয়া যাবে এর বিশদ ব্যাখ্যা। কিন্তু আজ না। আজ আমায় উঠতে হবে। অন্য একদিন।

পল্টু বলল, সত্যি। আমার তো মনে হচ্ছে নিত্য দার চায়ের দোকানটাই আজ বিজেপির "চায়ে পে পার্টি ক্লাস কি চর্চা" হয়ে গেল। কিন্তু গুরু যেটা দিয়ে শেষ করলে সেটা তো আরও INTERESTING মনে হচ্ছে। ওটা জানিয়ে গেলে হত না।

বিবেক দা উঠে যেতে যেতে বলল, অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়েও হল না যে শেষ।

# বিজেপি যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান: আশার আলো পশ্চিমবঙ্গবাসীর

## অচীন চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার ৮ই অক্টোবরের নবান্ন অভিযান বঙ্গবাসীর কাছে নতুন করে আশার আলো দেখালো। রাজ্য শাসকদলের দুর্নীতিতে এমনিতেই ক্ষুব্ধ রাজ্যবাসী। কিন্তু অত্যাচারের কারণে তারা প্রকাশ্যে সে ভাবে মুখ খুলতে পারছে না। নবান্ন অভিযানের সফলতায় তাদের এই ভয় কাটছে। রাস্তায়, চায়ের ঠেকে প্রকাশ্যে তারা তৃণমূলের সমালোচনা করার সাহস পাচ্ছে।

যে যে ইস্যু নিয়ে যুবমোর্চা এই অভিযানের আন্দোলন কর্মসূচী নিয়েছিল, তা সব দিক থেকেই এই মূহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ। বেকারদের চাকরি, কৃষকের ঋণ দানের ক্ষেত্রে কারচুপি, ১০০ দিনের কাজের টাকা সঠিকভাবে না দেওয়া, আমফান-এর টাকা চুরি, রেশনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক চাল, ডাল, গম কম দিয়ে বাকিটা পাচার করা। সরকারি অর্থে শিল্প ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বেআইনিভাবে পুজোর সময় তৃণমূল সমর্থিত ক্লাবকে দান করা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার টাকা থেকে রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করা। আইনশৃঙ্খলার অবনতি, পুলিশকে দিয়ে মিথ্যাচার করে , বিরোধী দলের কর্মীদের হেনস্থা করা। সীমান্তে চোরাচালান কাজে নেতাদের জড়িয়ে ফায়দা লোটা। দুস্কৃতী ও আন্তর্জাতিক জঙ্গি ও গরুপাচারের সঙ্গে কর্মী ও নেতাদের মেলবন্ধন। সব মিলিয়ে এক অগণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এমনই অভিমত রাজ্যবাসীর।

তাই রাজ্য বিজেপির যুব সভাপতি সৌমিত্র খাঁ''র আহবানে নবান্ন অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের আমন্ত্রণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষাধিক যুবক যুবতী উৎসাহিত হয়ে যোগ দিয়েছিল এই অভিযানে। ব্যাঙ্গালোর থেকে সর্বভারতীয় যুবনেতা তেজস্বী সূর্য যোগ দিয়ে উৎসাহিত করেন এখানকার যুব সমাজকে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরাও। এই অভিযান এর ব্যাপকতা নিয়ে বিশেষ গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়ে অভিযানের দিন নবান্ন বন্ধ রাখার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ব্যাপারে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন। কিন্তু এভাবে নবান্ন বন্ধ রেখে রাজ্যকে অচল করে কতদিন চলবে। তার থেকে বরং উনি একেবারে নবান্ন ছেড়ে নবান্নকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা দেখাব রাজ্যকে সুষ্ঠ ভাবে চালানো কাকে বলে।

# হে রাজর্ষি তোমারে প্রণাম

## রুদ্রপ্রসন্ন ব্যানার্জি

মহাষষ্ঠীর পুণ্য লগ্নে আপামর বাঙালির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে ঘিরে শারদীয়ার আকাশে রাজনীতির কালো মেঘ জমতে শুরু করেছিল; সংবাদমাধ্যম থেকে বুদ্ধিজীবীর দল, সবাই অধীর আগ্রহে বসেছিলেন এই ভেবে যে প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপূজার উদ্বোধনী মঞ্চকে রাজনীতির ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন। কিন্তু রাজর্ষি এলেন, দেখলেন এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে সমস্ত বাঙালির হৃদয় জয় করে নিলেন। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি।

সবিনয়ে দেশবাসীর সামনে তিনি স্বীকার করে নিলেন যখনই প্রয়োজন হয়েছে মা ভারতীর সেবায় শাস্ত্র থেকে অস্ত্র সবকিছুতেই বাঙালি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ভক্তি আন্দোলনের জনক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে "যত মত তত পথ" এর প্রবর্তক পরমহংস শ্রী রামকৃষ্ণদেব এবং বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রাণপুরুষ যুগনায়ক বিবেকানন্দকে নত মস্তকে প্রণাম জানিয়েছেন। এইদৃশ্য ভারতবর্ষ আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সহ একাধিক বাঙালি সাহিত্যিকের অবদান আবেগ তাড়িত কণ্ঠে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন তিনি। আধুনিক ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহন রায় কিংবা পঞ্চানন বর্মার মতন ব্যক্তিত্বের অবদান তিনি দেশবাসীকে আরও এক বার মনে করিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালির ভূমিকা উল্লেখ করতে গেলে সময় এবং পাতা দুই ফুরিয়ে যায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্যসেন এবং বাঘাযতীন এই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান তিনি দেশবাসীর সামনে আরো একবার তুলে ধরেছেন।

শুধুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সমাজ গঠনে বাঙালির ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞান চর্চায় বাঙালি ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে, শুধু তাই নয়, বাঙালি গোটা বিশ্বকে বিজ্ঞান চর্চার পথ দেখিয়েছে একথা বললেও তার মধ্যে কোন ভুল নেই। বিজ্ঞানী মার্কনী যে ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি আবিষ্কারের জন্য যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন সেই কাজ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বসে মার্কনীর আবিষ্কারের বেশ কয়েক বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। গবেষণাগারের আবিষ্কারকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষের বুকে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। বোস-আইনস্টাইন

থিওরির প্রবর্তক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নাম কি করে ভুলবে বিশ্ব? এই সকল বিজ্ঞানীদের স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বাঙালির বিজ্ঞান চর্চায় অবদানকে একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু মাতৃশক্তির আরাধনার পুণ্য লগ্নে বাঙালি নারীশক্তিকে উপেক্ষা করা যে কারও পক্ষেই অসাধ্য। মা সারদা, মাতঙ্গিনী হাজরা, রানী রাসমণি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, দেবী চৌধুরানী এবং কামিনী রায়ের দেশ গঠনে ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বাংলার মাতৃশক্তির উদ্দেশ্যে আরো একবার প্রণাম জানালেন। এ যেন এক অনন্য অনুভূতি, রাষ্ট্রনায়ক শ্রদ্ধায় নত মস্তকে প্রণাম জানাচ্ছেন বাংলার মায়েদের। ভারত বর্ষ কি আগে কখনো এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে?

ভরতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থে "অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী" সংলাপের মধ্য দিয়ে সন্তানের প্রতি বাংলার মায়েদের ভালোবাসার যে চিরন্তন সত্য ফুটে উঠেছিল, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ও সেই কথাই উঠে এলো—

আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশিতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগো মনোনীত যাহা চাহ দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।

**লেখক - কানাডার অ্যালবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক**

# সেবাই সংগঠন

## প্রণয় রায়

ভারতীয় জনতা পার্টির যে সংগঠন তার লক্ষ্য নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন এবং সেই ক্ষমতার দ্বারা মানুষের সেবায় সমর্পণ। দেশের প্রধানমন্ত্রী, যিনি নিজেকে জনসাধারণের প্রধান সেবক বলে মনে করেন, মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজীর অকপট স্বীকারোক্তি ''আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সেবার মাধ্যম গণ্য করেছি''—বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য।

বিজেপির জন্মের মূল উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে আমাদের এই দেশ যেন সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়। এই মূল প্রেরণা বুকে নিয়ে ভারতীয়তা আর সেবা ভাবনার সাথে আমরা রাজনীতিতে এসেছি। নিঃস্বার্থ সেবাই চিরদিন আমাদের সঙ্কল্প থেকেছে, সেটাই আমাদের সংস্কার। আমরা যাঁর সেবা করি তাঁর সুখেই আমাদের সন্তুষ্টি। দরিদ্র নারায়ণের প্রতি ''সম ভাব'' আর ''মম ভাব'' নিয়ে আমাদের কার্যকর্তারা দলের ও দেশের কাজে সদাব্রতী থাকবে সেটাই কাম্য।

আমরা বলছি, ''আমার পরিবার বিজেপি পরিবার''। এটি আপামর ভারতবাসীর প্রতি আমাদের দলের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা এই মর্মে যে, পারস্পরিকতা ও সামূহিকতার বন্ধনে দেশমায়ের সন্তান হিসাবে আমরা সকলে একাত্ম। এই বোধে উদ্দীপিত মহতী সংগঠন সাধনার উত্তরাধিকারে একাত্ম মানবতার দর্শনকে আমরা আদর্শ হিসাবে পেয়েছি। আমাদের দলের দৃষ্টান্ত প্রাণপুরুষরা উপযুক্ত শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সংগঠনকে সেবাভাবে পরিচালিত করে এসেছেন। তাঁদের জীবনে আমরা দেখেছি কীভাবে শক্তিমানের মত মাটিতে পা রেখে আদর্শের হাত ওপরে তুলে রাখতে হয়, অর্থাৎ বাস্তবের যাবতীয় সংঘর্ষের মধ্যেও স্বার্থশূণ্যতা, সেবাপরায়ণতা ও প্রেমের আদর্শকে জাগিয়ে রাখতে হয়। দলের প্রতীক পদ্মফুল সেই ভাবটিকেই প্রকাশ করে। ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কার্যকর্তা হিসাবে এটা আমাদের সকলেরই গর্বের বিষয় যে আমরা সবাই এমন একটি সংগঠন তন্ত্রের সহযোগী বা সদস্য যেখানে সেবাকেই জীবন মন্ত্র বলে সকলে জানেন।

সেই জনসংঘের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, যে চার পাঁচ প্রজন্ম কঠোর তপস্যা করেছেন সেই পরম্পরার ধারাতেই এই সব শুভ

সংস্কার জন্ম নিয়েছে। তাঁদের তপস্যার গুণেই আজ দলের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে আমাদের কাজ, আমাদের সংস্কার, আমাদের ব্যবহার, সমর্পিত জীবন একে অপরের জন্য প্রেরণার স্রোত। আমাদের কাছে আমাদের সংগঠন শুধু নির্বাচন জেতার মেশিন নয়, আমাদের সংগঠনের অর্থ হল সেবার সুখ, সকলের সমৃদ্ধি। আমাদের সংগঠন সমাজের উপকারের জন্য কাজ করার সংগঠন, সমাজের জন্য সংঘর্ষ করতে থাকা সংগঠন। সমাজের জন্য, দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সংগঠন। ''রাষ্ট্র সর্বোপরি'' এই ভাব সতত আমাদের জাগরুক রাখে। ১৩০ কোটি দেশবাসী আমাদের সবার ওপর যে ভরসা রেখেছেন আমাদের সেই ভরসাকে সামলে রাখতে হবে। দেশবাসীর আশা আকাঙ্খাকে, তাঁদের স্বপ্নকে আমাদের নিজেদের স্বপ্ন মনে করে আমাদের কাজ করতে হবে, আত্মত্যাগ করতে হবে।

করোনায় সঙ্কটকালে সমাজে অপরের জন্য কিছু করার, সেবা ভাবের অপরা শক্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি। কার্যকর্তার

ভূমিকাতে অথবা সরকারে, বাস্তবে আমরা সবাই গরিবের সেবা করার মাধ্যম হিসাবে নিজেদের হাজির করতে পেরেছি। তাই লক ডাউনের সিদ্ধান্তের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি মানুষের জীবন আমরা বাঁচাতে পেরেছি। দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও কার্যকর্তারা করোনা মোকাবিলায় যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সংগঠনকে আরো মজবুত করেছে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার সঙ্কল্পে দৃঢ়তা এনেছে। যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা আজ দেশের বৃহদংশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী সেবা বা পরিষেবা ব্যবস্থাপনার সুফল সাধারণ জীবনকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গে পালা পরিবর্তনের ডাক এসেছে। সেই প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক কিছু অবতারণা।

রাজনীতির অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় সেবাযজ্ঞের আদর্শে প্রাণিত কোন দলের শাসনের অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনে ঘটেনি। এখানকার কার্যকর্তারাও সকলে বিজেপি দলের সংস্কারে ঋদ্ধ, সে দাবী করা যায় না। আনুগত্যের অভাব ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাবে দলের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে — এরকম পীড়াদায়ক দৃশ্যও চোখে দেখতে হয়।

গভীরভাবে দেখলে সেবার উৎস প্রেম, যে প্রেমে অবিরত 'ত্যাগ' নিজের 'ক্ষুদ্র আমি' কে। 'ক্ষুদ্র আমি' কে 'বৃহৎ আমি' অর্থাৎ 'দলের আমি'-তে উৎসর্গ করা, পরিপূর্ণ আদর্শের কাছে 'অহং'-এর আত্ম নিবেদন। কীভাবে হবে তা? ''দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।'' সূত্রধার বিবেকানন্দ ''জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সাহায্য দাও, সেবা দাও, যতটুকু তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না।''

দলের সেবক ও সেবকের সেবকদের মধ্যে কেউ মন্দ নয়। মন্দ হলে কেউ এইরকম দলে আসত না। অতএব, কাউকে মন্দ দেখার আগে ''আমি মন্দ দেখি কেন?'' ভাবা উচিত। কাজের মধ্যে কখনো কখনো আমরা আত্মত্যাগের সাহস হারিয়ে ফেলি। এই সাহস হারানো বা ভয় সংগঠনের বহির্গত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্যও যেমন সম্ভব, তেমনি সংগঠনের অন্তর্গত ব্যক্তি বা জড়বস্তুর জন্যও সম্ভব। যার মনে দুর্বলতা নেই, স্বার্থপরতা নেই তার কিসের ভয়? স্বামীজী, আশ্বাসবাণী এবং একই সঙ্গে সাবধানবাণী, শুনিয়েছেন, ''এইটি জেনে রেখো, যখনি তুমি সাহস হারাও তখনি তুমি নিজের অনিষ্ট করছ তা নয়, কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সফলতালাভের একমাত্র উপায়।...

''সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ চালাকি নয়। প্রেম, সত্যানুসন্ধান, মহাবীর্যের সহায়তায় সেবাকার্য আন্তরিক। কারুর উৎসাহভঙ্গ নয়, যতদূর ভাল বোধ হয় সাহায্য। ভাল বোধ না হয়, ধীরে ধীরে বোঝাও। দশজন মিলে কাজ আমাদের জাতীয় চরিত্রে নেই। যত্ন, চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য কর।''

সেবাকাজের যন্ত্র হিসাবে দল গড়ে উঠলে তবেই তো দল দ্বারা অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সেবার মাধ্যম গণ্য করে প্রকৃত বৈভবশালী রাষ্ট্রনির্মাণ সম্ভবপর হতে পারে।

**লেখক: কার্যকরী সম্পাদক, কমলবার্তা**
**রাজ্য সংযোজক পার্টি প্রকাশন বিভাগ**